প্রথম খণ্ড

(১২৯৩-৯৬ সালের ডায়েরী)

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার
কতকসময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত।

তদীয় কৃপাভাজন

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে
লিখিত।

কলিকাতা, বড়বাজার, ২০ নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমহানন্দ নন্দী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬।

[মুল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

নিবেদন।

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ভগবান্ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু এদেশে সুপরিচিত। তিনি ১২৪৮ সালে শুভ ৺ঝুলন-পূর্ণিমাতে শ্রীধামশান্তিপুরের বিশুদ্ধ অদ্বৈত-বংশে পরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ-আনন্দকিশোর গোস্বামী প্রভুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনে তাঁহার যেসমস্ত স্বাভাবিক সদ্‌গুণ ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও শান্তিপুরবাসীরা এক সময়ে বিস্মিত হইয়াছিলেন, সে সকল সাধারণের শ্রুতিগোচর করা আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়।

যৌবনকালে, সরল বিশ্বাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, পরদুঃখে কাতর হইয়া, তাৎকালিক দুর্নীতি-দুরাচার-দূরীকরণার্থে এবং সময়োচিত ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, বিষম অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করিয়াও, যে ভাবে তিনি অদম্য উৎসাহে দেশের পুনরুত্থানের জন্য কার্য্য করিয়াছিলেন, ঠাকুরের জীবনের সেই সময়ের ঘটনাসকল অনুসন্ধান করিয়া প্রচার করাও আমার এ পুস্তকের অভিপ্রায় নয়।

শুধু বিমল বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে এবং অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বমাত্র-ধ্যানে পরিতুষ্ট না হইয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনে সেই পরম বস্তু লাভ করিবার জন্য যে ভাবে তিনি বিভিন্নধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসনাপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা ও কঠোর সাধন ভজন করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও নিজ লক্ষ্য বস্তু ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ রূপে লাভ করিতে না পারিয়া, যে অবস্থায়, দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতে ও বন-জঙ্গলে, অনাহারে অনিদ্রায়, সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিবরণ তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি ও লিখিয়া রাখিয়াছি।

অবশেষে, তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থায়, আশ্চর্য্য প্রকারে গয়া-পাহাড়ে, অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মানসসরোবর-নিবাসী শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী, তাঁহাকে শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করতঃ, মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়হইতে তিনি, তাঁহার চিরাভীপ্সিত

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

[illegible] সচ্চিদা[illegible]রূপ ভ[illegible]বান্‌কে সাক্ষাৎ রূপে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিয়া, যে অব[illegible] অবশিষ্ট দিন [illegible]পন করিলেন, প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর কাল তাঁহার মধুর সঙ্গ লা[illegible] তাহা [illegible] করিয়া, সময়ে সময়ে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছি। হায়, কিছুকাল [illegible] সেই চিত্তবিমোহন পরমমনোরম ব্যবহারের ছবিটিমাত্র আমাদের সম্মুখে রাখি[illegible] ১৩[illegible] সালের [illegible] জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীনীলাচলে নীলাম্বুধিকূলে আশ্রিত ভক্তগণে[illegible] প্রাণারাম, আমাদের সেই স্নিগ্ধ-সুভাস্বর তত্ত্বদ্যুতি-প্রভাকর অকস্মাৎ অস্তমিত হইলেন ঘোর কৃষ্ণা দ্বাদশীর প্রথম অন্ধকারে হতভাগ্য ভক্তগণের মস্তকোপরি অমনি আচম্বি[illegible] অশনি পতিত হইল। সেই ভীষণ দুর্দ্দিনের হৃদয়বিদারক দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াই, আমা[illegible] ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠা চিরকালের মত শেষ করিয়া রাখিয়াছি।

ছেলেবেলায়, প্রায় দশ বৎসর বয়সহইতে, আমার ডায়েরী লিখার অভ্যাস ছিল। সুতরা[illegible] ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার চিরসমাধিগ্রহণের দিন পর্য্যন্ত আমার ডায়ের[illegible] লিখা রহিয়াছে। ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা একটি লোক থাকা আবশ্যক হইত বলিয়া সে কার্য্যভার আমারই উপরে অর্পিত ছিল। আমি আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত প্রায় নিয়[illegible] তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া থাকিতাম। ঠাকুরের নিকটে সাধন পাইয়া প্রায় তের চৌ[illegible] বৎসর কাল অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গ করি। সে সময়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচারব্যবহার ক্রিয়াকলাপ যেদিন যেমন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, আমার সাধ্যমত যথাযথ ও বিস্তারিতরূপে ডায়েরীর সেই সেই তারিখে সে সব লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার ডায়েরীতে বিশেষ ভাবে আমারই জীবনের নানাপ্রকার দুরবস্থা ও আকস্মিক দুর্দ্দশায় ঠাকুরের অনুশাসন, উপদেশ, দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অপার্থিব জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর নিদর্শন—যাহা তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন—সরল ভাবে ও অকপটে, যেমন যেমন পাইতাম, লিখিয়া রাখিতাম। তবে, নিয়ত একত্র থাকার দরুণ ঠাকুরের সেই সেই সময়ের নিত্যসঙ্গী আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদের তাৎকালিক কোন কোন ঘটনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ থাকা হেতু, এবং সে সকলের সহিত ঠাকুরের আদেশ উপদেশ ও ব্যবহারের সংস্রব বিশেষ ভাবে-থাকাবশতঃ, ঐ সমস্তও আমার ডায়েরীর অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যদি সকলে সাধু, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কলঙ্ক জীবন লইয়াই ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা ও মহিমার পূর্ণ নিদর্শন কিরূপে পাইব? তাঁহার পতিতপাবনতাই বা কিরূপে সম্যক্ পরিস্ফুটিত হইবে? এক দিকে উৎপীড়নের আধিক্য প্রকাশ না হইলে অপর দিকে ক্ষমার বিশেষত্ব বুঝা যায় না। এক দিকে যেমন অত্যাচার ও অবাধ্যতা অপর

দিকে তেমনই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, এক দিকে হীনতা ও অধোগতি অপর দিকে দয়া ও সহানুভূতি। এজন্য ঠাকুরের অসাধারণ কৃপা ও অদ্ভুত জীবনের বিন্দুমাত্র পরিচয় স্মৃতিতে রাখিবার অভিপ্রায়ে তৎসাময়িক নিত্যসঙ্গী গুরুভ্রাতাদের সাধারণ ব্যবহার, এবং বিশেষ ভাবে আমার নিজ জীবনের গলদ, যে দিনকার যেমন, এই ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি।

আমার ডায়েরী লিখা অভ্যাস গুরুভ্রাতারা অনেকেই জানেন। সুতরাং শত শত গুরুভ্রাতা ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে এপর্য্যন্ত, ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এই তের চৌদ্দ বৎসর থাকিয়া তাঁহার যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার জীবনচরিত লেখা বা সেই বিষয়ে চেষ্টা করাও নিতান্তই অসম্ভব মনে হয়। আমার সরল বিশ্বাস, তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী হইতে পারে না। ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার জীবনের সেইসকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুভূতির কথা ধরিয়া আমি ইহা বলিতেছি না। অতি নিম্নস্তরের যোগৈশ্বর্য্যলব্ধ শক্তিপুঞ্জের যেসকল ক্রিয়া ও ফলানুভূতি তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহে সর্ব্বদা হইতে দেখিয়াছি এবং দেবতা ও সিদ্ধমহাপুরুষগণসম্বন্ধীয় সাধারণের বিশ্বাসের অতীত যেসকল অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সমস্ত মনে করিয়াও আমি এই কথা বলিতেছি না। আমার ইহা পরিষ্কার ধারণা যে ঠাকুরের জীবনে এমন কতকগুলি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য ঘটনা নানাস্থানে নানা অবস্থায় সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী শিষ্যগণের নিকটেও প্রকাশ করিতে অবসর পান নাই; আবার কখনও কোনও ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে অপরের নিকটেও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, এ সকল জানিয়া শুনিয়া. তাঁহার একখানি স্থূল জীবনী প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য, সকলেই বুঝিবেন। এসকল কারণে আমার এপ্রকার পরিষ্কার ধারণা ঠাকুরের কথা যতই লিখি না কেন, তাহাদ্বারা তাঁহার সম্যক্ পরিচয়প্রদান অসম্ভব। এজন্য ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর এতকাল আমি এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই করি নাই; কেন না তাঁহার প্রেরণাভিন্ন তদীয়জীবনীসঙ্কলনে আমার সাহস হয় না। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিলে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

গত ১৩২০ সালে কলেরা রোগে যখন আমি একেবারে মরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তখন আমার জীবনসম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইয়াছিলেন। আমার ডায়েরীগুলি প্রকাশ হইল না ভাবিয়া, ঐ সময়ে অনেকে অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় আমার আরোগ্য-

লাভের পর, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদের সস্নেহ অনুরোধ ও নির্ব্বন্ধ আবার আমার উপরেই পতিত হইল। আমি, তাহা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, আমার ঐ বিস্তৃত চৌদ্দ বৎসরের ডায়েরী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু একবারে তাহা হওয়া অসম্ভব। এজন্য ১২৯৮ সালের ডায়েরীখানা নিতান্ত জীর্ণ কাগজে পেন্সিলে লেখা বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে দেখিয়া, ক্রমবিরুদ্ধ হইলেও, সর্ব্বপ্রথমে সেখানাই প্রকাশ করিয়াছিলাম।

এবার আমার দীক্ষার সময়হইতে ক্রম অনুসারে ১২৯৩ হইতে ১২৯৬, সালের ডায়েরী প্রথম খণ্ড, এবং ১২৯৭ সালের ডায়েরী দ্বিতীয় খণ্ড নামে মুদ্রিত হইল।

ঠাকুরের কথা স্মরণ রাখিয়া, অতি সাবধানতার সহিত এবং স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত করিয়া, ইহা প্রকাশ করিলাম। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে ঠাকুর অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পূর্ব্বে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচারি, প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে তাকে বল্‌তে নাই। যদি বল্‌তে হয়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাঁকে প্রমাণসহিত দেখাতে হবে। না হ'লে শ্রীমন্ত সওদাগরের দশা ঘট্‌বে; এটি মনে রেখো।" তাই সব কথা আমার লিখার যো নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মত।

আমি, যে অবস্থায় থাকিয়া, যে ঘটনায় পড়িয়া, ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিলাম, এবং তাহার পর তাঁহার অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভের প্রতিকূলে যে সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ আপদ্ বিপদ্ আমার সেই সময়ে ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত শুধু তাঁহারই কৃপা মনে করি। এজন্য নিজ জীবনের তাৎকালিক ঘটনার অতি সংক্ষেপ দু' তিনটি বিবরণ এখানে একটু না দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার এই নির্লজ্জতা সকলে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা।

আমার প্রায় ছয় বৎসর বয়সে একদিন বাড়ীর ধারে ময়দানে সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে অপরাহ্নে খেলা করিতেছিলাম, কে আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া বলিল "ওরে, তোদের বাড়ী গোঁসাই এসেছেন, শীঘ্র যা।" আমি ঐ কথা শুনামাত্র এক দৌড়ে বাড়ীতে আসিয়া দেখি, ঠাকুরঘরের ধারে, শেফালিকা গাছের নীচে, আমাদের আত্মীয়, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে তাঁর মোটা লাঠী, পায়ে জুতা, গায়ে একটি জামা ও ময়ূরপাঙ্খী রঙ্গের জামিয়ার; শরীরটি প্রকাণ্ড। উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়িয়া আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি স্নেহদৃষ্টিতে ঈষৎ হাসিমুখে আমাকে খুব পরিচিতের মত বলিলেন—"কি খেলা করছিলে? বেশ! বেশ!! যাও, খুব খেলা কর গিয়ে" এই বলিয়া তিনি নবকান্ত বাবুর সহিত ময়দানের দিকে

চলিলেন ; যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি এক-এক বার আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকৃতি ও সস্নেহ চাহনীটি আজ পর্য্যন্তও আমি ভুলিতে পারি নাই। কেহ গোঁসাই শব্দটি বলিলে আমি এই গোঁসাইকেই বুঝিতাম।

আমাদের পাড়ায় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ কৃত্তিবাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেন। শুনিতে বড় ভাল লাগিত। প্রতিদিন আমি গ্রামের অপর প্রান্তে আহারের পর যাইয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেখানে থাকিতাম, তাঁহার মুখে রামের কথা শুনিতাম। রামকে আমার বড় ভাল লাগিত। রাম যেন আমাদের পরিবারেরই কেহ, আমাদের ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন—মনে করিয়া রামের জন্য কাঁদিতাম। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে বনে-জঙ্গলে গেলে সেখানে রাম আছেন কি না, চারিদিকে দেখিতাম। রামের বর্ণ দূর্ব্বার মত ; তাই আগ্রহের সহিত দূর্ব্বার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। দূর্ব্বায় পা পড়িলে, রামের গায়ে লাগিল ভাবিয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িতাম, রামকে নমস্কার করিতাম। তীরধনু সর্ব্বদা হাতে রাখিতাম। একখানা ছেঁড়া রামায়ণ পাইয়া সারাদিন উহা সঙ্গে রাখিতাম, রাত্রিতে উহা মাথার নীচে রাখিয়া শুইতাম। এ সময়ে আমি শিশুশিক্ষাও পড়ি নাই। পরে, পাঠশালায় ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া হইলে, মেজ দাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) আমাকে লেখাপড়ার জন্য ঢাকা লইয়া গেলেন। এ সময়ে আমার বয়স দশ বৎসর। মেজ দাদা যত্ন করিয়া আমাকে ডায়েরী লিখিতে শিক্ষা দিলেন। সারাদিনে কয়টি মিথ্যাকথা বলিতাম, কার সঙ্গে ঝগড়া করিতাম, কি কি দোষ করিতাম, প্রত্যহ ঠিক ঠিক এই ডায়েরীতে লেখা হইত। এইসময়হইতে ডায়েরী লেখা আমার অভ্যাস।

আমার আত্মীয় স্বজন অনেকেই ব্রাহ্ম। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরেরাও সকলেই ব্রাহ্ম-মতালম্বী ছিলেন। ক্রমে মেজ দাদা প্রতিরবিবারে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মদের উপসনাপ্রণালীতে অল্প দিনের মধ্যেই আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। প্রতিদিন দুবেলা নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিয়া যে দিন না কাঁদিতাম, উপাসনা হইল না ভাবিয়া সারাদিন উদ্বেগে কাটাইতাম। কপটতা ও অসত্য ব্যবহার মহা অপরাধ জানিয়া, প্রকাশ্য ভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব স্থির করিলাম। আত্মীয় স্বজনের ভিতরে ইহা লইয়া মহা "হৈ চৈ" পড়িয়া গেল। এই সময়ে ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজে গোস্বামী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অসাম্প্রদায়িক ভাবে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা ও উপাসনাতে এবং প্রত্যহ সংকীর্ত্তনে তাঁহার মহাভাবে

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণও আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজে লোকে লোকারণ্য! প্রতিরবিবারেই মহা উৎসব হইতে লাগিল। জীবন্তধর্ম্মের জাগ্রত ভাবে, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে, সকলেই অভিভূত হইতে লাগিলেন। জীবনে এমনটি আর দেখি নাই।

১২৯৩ সালে, আশ্বিন মাসে, শারদীয় উৎসবে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিব প্রত্যাশায় অস্থির হইয়া ঐ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এইসময়হইতে আমার যে ডায়েরী রহিয়াছে তাহাই এইবার মুদ্রিত হইল। ইতি—

জটীয়া বাবার সমাধি,
পুরী।

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

মাঘ, ১২৯৩।

ফাল্গুন, ১২৯৩।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪।

আষাঢ়, ১২৯৪।

শ্রাবণ, ১২৯৪।

বিষয় পৃষ্ঠা

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫।

শ্রাবণ, ১২৯৫।

ভাদ্র, ১২৯৫।

আশ্বিন, ১২৯৫।

অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

মাঘ, ১২৯৬।

ফাল্গুন, ১২৯৬।

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ

(প্রথম খণ্ড)

অবতরণিকা।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়, মানস-সরোবরনিবাসী পরমহংসজীর নিকটে পুরাকালের শ্রীনরনারায়ণপ্রবর্ত্তিত দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরম আদরের দুর্লভ যোগধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়া, নির্জ্জন পাহাড়ে-পর্ব্বতে কিছুকাল তীব্র সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিলেন। লোকালয়ে প্রত্যাগত হইবার সঙ্কল্প তাঁহার একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব, অকস্মাৎ একদিন আবির্ভূত হইয়া, বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজন সাধনার্থে, তাঁহাকে দেশে ফিরিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে গোঁসাই প্রভু বলিলেন—

"এখনও প্রচারাদি কার্য্যের ভার আমারই উপরে দিয়া আমাকে সংসারে রাখিতে চাহেন? এ সকল কার্য্য আপনি নিজে করিলে তো আরও ভাল হয়।" তাহাতে পরমহংসজী কহিলেন—"ইহা আমার কার্য্য নহে। এই কার্য্য তোমার দ্বারাই হইবে, তুমি আচার্য্য-সন্তান, স্বয়ং আচার্য্য। তোমার উপদেশ লোকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, আমার বাক্য সেরূপ গ্রহণ করিবে না। জগৎকে, দেশকে শিক্ষা দিবার অধিকার তোমারই, আমার নহে। তুমি পূর্ব্বে যেরূপ পরিবারমধ্যে বাস করিতেছিলে, এখনও সেইরূপই থাক। তাহাতে তোমার সাধন-ভজনের কোনই ব্যাঘাত হইবে না।"

গোস্বামী মহাশয় গুরু-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নির্জ্জনে প্রাণায়ামসংযোগে যোগ-সাধন, অবিচারে গুরু-বাক্যের অনুসরণ, শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক পাত্রবিশেষে নিভৃতে দীক্ষাদান, এবং বিভিন্নপথাবলম্বী ধর্ম্মার্থিগণকেও সরল-ভাবে নিষ্ঠার সহিত আপন আপন ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মগণের

ঘরে ঘরে ঘোরতর আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক মত প্রচার না করিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রচার করিলে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকের আপত্তি ও দুঃখের কারণ হইবে জানিয়া, তিনি গত ১০ই চৈত্র (১২৯২ সালে) কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তখনই আবার ঢাকা "পূর্ব্ব-বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের" সভ্যগণ তাঁহাকে, আচার্য্যপদে মনোনীত করিয়া, অবিলম্বে ঢাকায় আসিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানাইলেন। কিছুকাল হইল গোস্বামী মহাশয়, ঢাকাতে আগমন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে উপাসনাদি কার্য্য করিতেছেন।

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে ব্রাহ্মসমাজে নিত্য উৎসবের স্রোত চলিয়াছে। প্রত্যহই অপরাহ্নে প্রচারকনিবাস লোকে লোকারণ্য। নানা শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে আলাপাদি করেন, তাহা কিছুই বুঝি না; আর যাহা বুঝি তাহাও ভাল লাগে না। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় নীতিমান্, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ সাধুপুরুষ রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-ঘটিত সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রু-ধারায় ভাসিয়া যান, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—ইহা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে, পথে ঘাটে মাঠে, চাষা, প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মুখে এই সব ভাবেরই গান শুনিয়া, হাতে 'ঠেঙ্গা' লইয়া তাহাদের তাড়া করিয়াছি। হায়, হায়, নীতির আদর্শস্থান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ভাব! দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেছি।

কা ব্রাহ্মসমাজে গোঁসা ।

আজকাল পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্রই গোস্বামী মহাশয়ের কথা। হিন্দু-সমাজে, ব্রাহ্ম-সমাজে, দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে, যেখানে সেখানে কেবল গোঁসাইজীরই গুণ-কীর্ত্তন। ভদ্র-গৃহস্থদের পরিবারে, আফিসের বাবুদের ভিতরে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এখন শুধু গোস্বামী মহাশয়ের অসামান্য সাম্যভাব, অদ্ভুত ভাবাবেশ, ও অপূর্ব্ব অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুশীলনেরই আলোচনা। হিন্দু-সমাজের সমাজপতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্ম্ম-নিরত আচারনিষ্ঠ টোলের পণ্ডিতগণ—যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও 'ব্রাহ্ম' শব্দটি পর্য্যন্ত শুনিলে অবজ্ঞার সহিত, 'রাধামাধব', 'মহাভারত' উচ্চারণ করিতেন,—এখন দেখিতেছি তাঁহারাও অনেকে, ঘরের পয়সা খরচ

ফরিয়া, বিক্রমপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি দূরবর্ত্তি স্থান হইতে প্রতিরবিবারে গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিতে ব্রাহ্ম ' মন্দিরে ' আসিতেছেন। উপাসনার সময়ে অনেক মুসলমান এবং খৃষ্টানকেও সমাজে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা বলেন, "যারা বলে ব্রাহ্মসমাজে কিছু নাই, তারা একবার গোঁসাইকে দেখুক না? এমন একটি লোক হিন্দুসমাজে বা অন্য কোন সমাজে বের করুক দেখি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বস্তু, ব্রাহ্মসমাজে কি জিনিস তৈয়ার হয়, একবার এসে লোকে গোঁসাইকে দেখে বুঝে' নিক।" হিন্দুরা বলেন,—"গোঁসাই আর ব্রাহ্ম নাই। বস্তু পে'য়ে, জেনে শুনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন; মাথা মুড়িয়ে, গৈরিক নিয়ে হিন্দু হয়েছেন। তিনি এখন সাকার উপাসনা করেন; রাধা-কৃষ্ণ, কালী-দুর্গা নাম শুন্‌লে কেঁদে ফেলেন; হরি-সংকীর্ত্তনে, গৌর-কীর্ত্তনে গোঁসাইয়ের দশা হয়। এ কি আর ব্রাহ্মের লক্ষণ? ব্রাহ্মেরা কি হরি ব'লে নাচে? —না, তাদের মধ্যে কখনও এরূপ মহাভাবের আবির্ভাব হয়?" যাহা হউক, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীরাই দেখিতেছি গোঁসাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁহার সঙ্গলাভে লালায়িত। ব্রাহ্ম-সমাজে প্রত্যহই লোকের ভিড়। রবিবারে সমাজে স্থান পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া বসিবার স্থান অধিকার করে। ভিতর বাহির লোকে পরিপূর্ণ। বেদীর কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও নড়া চড়া নাই। অসাম্প্রদায়িক ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্বোধন, প্রার্থনা, উপাসনা ও উপদেশ সকলকেই বিমোহিত করিয়া ফেলিতেছে। গোঁসাই বেদীতে বসিয়া কার্য্যারম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ভিতরে এক অদ্ভুত ভাবের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক মহাকাণ্ড আরম্ভ হয়, অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। ভূমিতে লুটাইয়া কেহ কেহ কাতর প্রাণে রোদন করিতে থাকেন। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ!

গোঁসাইয়ের ব্রাহ্মসমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ।

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ছাত্রসমাজের কয়েকটি সমবয়স্ককে লইয়া, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকটে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথা তুলিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে রাধা-কৃষ্ণ, গৌর নিতাই, হর-পার্ব্বতী, নন্দ-যশোদা প্রভৃতির ছবি কেন রহিয়াছে, এবং তিনি বাউল বৈষ্ণবাদি কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগকে, ধর্ম্মের নামে, শারীরিক বিকৃত ভাবের উদ্দীপক প্রেম-সঙ্গীতাদি করিতে কেন প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেন—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। কয়েক দিন

ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিল। পরে উঁহারা বলিলেন—"প্রচারকনিবাস এখন গোস্বামী মহাশয়েরই বাস-ভবন; সুতরাং নিজের ঘরে কে কি করেন না করেন, আমাদের তাহা দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। একখানা পঞ্জিকা ঘরে রাখ্‌লেও সেই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ, কালী-দুর্গার ছবি থাকে। তা'তে আর দোষ কি? বাউল বৈষ্ণবেরা যে ভিক্ষা কর্‌তে এসে কত কি গান করে; তাতে কি তাদের মুখ চে'পে ধরার কা'রো অধিকার আছে? এ সবও সেই রকম জান্‌বে। এপর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজ সহিয়া লইতে পারেন। বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে তখন প্রতিবাদ করা যা'বে।"

কর্ত্তৃপক্ষের এ মীমাংসা শুনিয়া মনে বড়ই দুঃখ হইল। উঁহাদের মধ্যেই কাহারও কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলাম, "অশ্লীল টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান সংগ্রহ করিয়া, প্রেম-সঙ্গীত নাম দিয়া, দেশে বিদেশে, ঘরে ঘরে প্রচার করা যে সকল ব্রাহ্মেরা দোষ মনে করেন না; যাহার মূলই অসত্য এরূপ কতকগুলি জল্পনা-কল্পনা বা মিথ্যা ঘটনার ফাঁকা ছবি, উপাখ্যান ও উপন্যাস আকারে প্রচার করিয়া, যাঁহারা মানুষকে 'অসত্য হইতে টানিয়া সত্যের আলোকে লইয়া' যাইতে চান, তাঁ'রা আর গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্যে প্রতিবাদ করিলে দাঁড়াইবেন কোথায়?" আমার কথা শুনিয়া অনেকেই একটু উত্তেজিত হইলেন। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"জাতিভেদ" তুমি অপরাধ মনে কর, অথচ তা'র চিহ্ন ঐ উপবীত ধারণ কর্‌ছ কেন? হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় তুমিও কি দিচ্ছ না?"

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা।

উঁহারা আমাকে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন বুঝিয়া, লজ্জিত ভাবে, দুঃখিত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; সর্ব্বদা আমার ভিতরে ঐ কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। কিছুকাল যাবৎ আমার ভিতরের দুর্ব্বলতা ও কপটাচরণের জন্য নিজেই আমি অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম। এখন নবকান্ত বাবুর ঐ কথায় আমার অন্তরের আগুণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। আমি আমার বন্ধুদের কাছে প্রচার করিলাম—আগামী অগ্রহায়ণ মাসের সাংবৎসরিক উৎসবের সময়েই আমি উপবীতত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার একথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্ম বন্ধুরা আমাকে খুব উৎসাহই দিতে লাগিলেন। কিন্তু চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিষম 'হৈ—চৈ' পড়িয়া গেল। আমার বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন হইতে লাগিল, আত্মীয়-স্বজনেরা যতই আমাকে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়

দেখাইতে লাগিলেন, উৎসাহ ও নির্ভীকতা আমার ততই বাড়িয়া উঠিল। গত ৪।৫ মাস হইতে, উপাসনার সময়ে, নিত্য দু'টি বেলা প্রাণের জ্বালায় কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি—"প্রভু, উপবীত ধারণ করিয়া এ অসত্যের আবরণে কতকাল আর নিজকে ঢাকিয়া রাখিব? কপটাচার হইতে আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে লাভ করিবার যথার্থ পথ তুমিই আমাকে দেখাইয়া দাও। দয়া করিয়া, আমাকে সরলভাবে নিষ্কপটে সত্যপথে চলিবার শক্তি দাও।"

অপূর্ব্ব স্বপ্ন—গোঁসাইয়ের আহ্বান।

অন্যান্য দিনের মত, উপাসনার শেষে আজও এইভাবে প্রর্থনা করিয়া শয়ন করিলাম। শেষ রাত্রে (৩৷০ টার সময়ে) একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া, সহসা জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটি এই।—দেখিলাম, ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারে আমি উপস্থিত হইয়াছি। বাগানে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া, গোস্বামী মহাশয় সস্নেহে ঈষৎ হাস্যমুখে আমাকে, হাত নাড়িয়া, ডাকিয়া বলিলেন—

২০শে ভাদ্র ১২৯৩ সাল।

"ওহে, শীঘ্র এদিকে চ'লে এস। যে বস্তু তুমি চাও, আমি তোমাকে তাই দিব।"

আমি তখন গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি ও মমতামাখা আহ্বানে আনন্দে বিহ্বল হইয়া, ভগবান্‌কে লাভ করার মানসে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে যাইয়া লুটাইয়া পড়িলাম; আর অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া উঠিয়াও গোস্বামী মহাশয়ের সেই সৌম্য-শান্ত, স্নিগ্ধ-সকরুণ পবিত্রমূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে যেন কিছুক্ষণের জন্য দেখিতে লাগিলাম। কাণেও যেন তাঁর সেই শব্দ বারংবার শুনিতে লাগিলাম। স্বপ্ন মনের সংস্কারেরই একটা বিকৃত পরিণাম বা কল্পনারই একটা অলীক ফল—বহুকালের এই নিশ্চিত ধারণা আমার স্মৃতিতেও আর আসিল না। জাগরিতাবস্থাতেও কিছুতেই আমি কান্নার বেগ থামাইতে পারিলাম না। পুনঃ পুনঃ কেবলই মনে হইতে লাগিল—গোস্বামী মহাশয় আমার জন্য বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি কিছুকাল ধরিয়া বিছনায় পড়িয়া কাঁদিলাম। প্রার্থনা করিলাম—"প্রভু; আমি তোমার সম্বন্ধে অন্ধ। তোমাকে লাভ করিবার যথার্থ পথে, দয়া করিয়া, তুমিই আমাকে লইয়া যাও।" প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়া পড়িল। আমি অমনি শেষ রাত্রিতে ছুটিয়া—ব্রাহ্মসমাজের দরজা বন্ধ থাকা সত্বেও—দেওয়াল 'টপকাইয়া', বাগানে গিয়া পড়িলাম; এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানটি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি ব্রাহ্মমন্দিরের পূর্ব্বদিকে, দেওয়ালের ধারে সেই শিউলি

গাছের নীচে—স্বপ্নে যেমনটি দেখিয়াছি, অবিকল সেই ভাবে—মণ্ডিতমস্তক, গৈরিক বসন-পরিহিত, পবিত্রমূর্ত্তি গোস্বামী মহাশয়, দণ্ড-হাতে, খড়ম পায়ে, প্রফুল্ল দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেই তিনি আমাকে শেফালিকা ফুল দেখাইয়া বলিলেন,—

"দেখ, কি সুন্দর! দূর্ব্বার উপরে যেন খই ফুটে রয়েছে।"

এতকাল আমি গোস্বামী মহাশয়কে, মস্তক অবনত করিয়া পায়ে পড়িয়া, কখনও নমস্কার করি নাই; উহা ঘোর কুসংস্কার ও অসভ্যতার কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি; শুধু হস্তোত্তোলন বা শিরঃ-কম্পন করিয়াই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু আজ আর, কেন জানি না, সে বিষয়ে আমার মনোযোগ রহিল না; ব্যাকুল ভাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, 'আমাকে আপনি দয়া করুন'।

গোঁসাই বলিলেন,—

আরও পূর্ব্বে তোমার আসা উচিত ছিল, এখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।

আমি। আমার এখনই সাধন নিতে ইচ্ছা হয়।

গোঁসাই। সে তো খুব সুখের কথা। এই ই তো সময়, এই সময়েই তো এ সব করতে হয়। এখন থেকে নিয়মমত এ সব সাধন-পথে চল্‌লে, অনন্তকাল এর একটা সুফল ভোগ করবে। 'পরে করব'—এ আশায় থাকা ঠিক নয়; পরে কত বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে। সম্প্রতি শীঘ্রই আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। পশ্চিম থেকে ঘুরে আসি; আর-তোমাদেরও তো স্কুল ছুটি—বাড়ী যাবে। বাড়ী থেকে এস, পরে সাধন হবে। সাধন নিলে এখন অন্ততঃ পনের দিন আমার কাছে তোমার থাকা আবশ্যক হবে। তাতে অসুবিধা আছে।

আমি। বাড়ী গিয়ে কি নিয়মে চল্‌বো?

গোঁসাই। নিয়ম আর কি? যেমন চল্‌ছ, তেমনই চল্‌বে। বেশ পবিত্র ভাবে থাক্‌বে। মনে কোন প্রকার খারাপ চিন্তা আস্‌তে দিবে না—ওতে বড় অনিষ্ট হয়। মনটি সর্ব্বদাই পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখ্‌বে। চিত্তটি প্রফুল্ল না থাক্‌লে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হয় না। খুব কাতর হ'য়ে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করতে হয়; আর প্রার্থনার ভাবটি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হয়। লেখা-পড়া করার সময়ে,

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১২৯৩ সাল।

কথাবার্ত্তা বলার সময়ে, পথে ঘাটে চল্‌তে ফির্‌তে, সর্ব্বদাই, ৫।৭ মিনিট অন্তর অন্তর একটু একটু অবসর নিয়ে, দু'এক মিনিট ভগবানকে স্মরণ করতে হয়। 'তিনি সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, আমাকে কত ভালবাসেন, প্রতিক্ষণে আমাকে কত প্রকারে দয়া কর্‌ছেন—এ সব মনে করে' পুনঃ পুনঃ তাঁকে নমস্কার করতে হয়।' এই ভাবে প্রতিকার্য্যে তাঁকে স্মরণ করে চল্‌লে অল্প সময়েই তাঁর কৃপালাভ করা যায়। এ সময়ে লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য; লেখা-পড়া অগ্রাহ্য কর্‌লে পরিণামে সকল দিকেই অনিষ্ট হয়। এখন এই সব কথা মনে রেখে চল্‌তে চেষ্টা কর; উপকার পাবে।

সাধনপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কয়েকদিন পরেই পূজা উপলক্ষে আমাদের স্কুল বন্ধ হইল। ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার মধ্যাহ্নে আহারান্তে, প্রসিদ্ধ 'মীরের বেগে' মাঝিদের নৌকা ভাড়া করিয়া, মেজদাদা ছোটদাদা প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ী রওনা হইলাম। তালতলার খাল ধরিয়া কিছুদূর যাইয়া মাঝিরা রাস্তা ভুল করিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে বাড়ী পৌছিলাম। এবারে বর্ষায় পদ্মা নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের প্রায় সকলেরই বাড়ী জলে 'ডুবু-ডুবু'। আমাদের বাড়ীর উপরেও ৭।৮ ইঞ্চি জল উঠিয়াছে। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য ইতিপূর্ব্বেই উঠানের উপর বাঁশ পাতিয়া সাঁকো করিয়া রাখা হইয়াছে। পাড়ার প্রায় সকল বাড়ীতেই ডিঙ্গী নৌকা থাকায় পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে বিশেষ কোনও অসুবিধা নাই। প্রত্যহ অপরাহ্লে ১২।১৪টি সমবয়স্ককে লইয়া নবকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাই। সেখানে সঙ্কীর্ত্তন উপাসনাদি করিয়া রাত্রি প্রায় নয়টায় বাড়ীতে আসি। আমার প্ররোচনায় দুটি বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, উপবীত না থাকিলেও, তাঁহাদের লইয়া আমাদের সমাজে কোন গোলমাল নাই। পাড়ার বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগকে উপবীত লওয়ার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কোন ফল পান নাই। এখন তাঁহারা সে চেষ্টায় নিরাশ হইয়া বলিতেছেন, "ওহে আমাদের দুর্নীতির চিহ্ন গলার দড়ি—তা যেন ত্যাগই করেছ; তোমাদের ব্রাহ্ম সভ্যতার সুনীতির চিহ্ন জামা সার্ট সর্ব্বদা পরাটা ছাড়লে কেন? ওগুলো গায়ে রাখলেও যে বাঁচি।" আমি আজ পর্য্যন্ত উপবীত ত্যাগ করিতে পারিলাম না বলিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুরা বড়ই দুঃখিত; সর্ব্বদাই আমাকে সে জন্য তাঁহারা অনুযোগ করেন, সময়ে সময়ে কাপুরুষও বলেন। এবারে ছুটির পর ঢাকায় যাইয়া প্রকাশ্য ভাবেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিব, সকলে অনুমান

করিতেছেন। মাও ভয়ে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তুলসীগাছের সম্মুখে নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া মা কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীকে মনের দুঃখ জানান। মা'র বিশ্বাস—তুলসীর কৃপা হইলে আমি আর ব্রাহ্ম হইব না। ছুটি শেষ হইলে, ঢাকা রওনা হওয়ার সময়ে মা আমাকে বলিলেন, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পৈতাটা ফেলিস্ না। ঠাকুর তোর মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বেন। গলায় পৈতাটি রেখে তুই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর্—এই প্রার্থনা করে প্রতিদিন আমি শিবের মাথায় বেলপাতা দিই।" এই বলিয়া মা তাঁহার হাতের তিনটি অঙ্গুলী নিজ জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া, পায়ের ধুলা তাহাতে মাখাইয়া, আমার মাথায় ঘষিয়া দিলেন। মা'কে প্রণাম করিয়া আমি ঢাকায় রওনা হইলাম।

ঢাকায় আসিয়া শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় এ পর্য্যন্ত ঢাকায় ফিরেন নাই; তবে, শীঘ্রই আসিবেন। আমি দিন রাত তাঁহার আগমনাকাঙ্ক্ষায় অস্থির হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলাম। উপবীতত্যাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করার ঝোঁক আমার কমিয়া গেল। গোঁসাই আমাকে কি সাধন দিবেন, অহর্নিশি শুধু তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম।

অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগেই গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাত্র-সমাজে মহা 'ধুমধাম' পড়িয়া গেল, ব্রাহ্মসমাজে আনন্দের আর সীমা নাই। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। গোঁসাইয়ের আগমনে আবার দলে দলে লোক ব্রাহ্মমন্দিরে আসিতেছেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে নিত্য উৎসবের স্রোত। প্রত্যহ সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে ভাবের বিচিত্র ব্যাপারে ও উচ্ছ্বাসে সকলেরই চিত্ত গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শুনিতেছি, এবারে গোস্বামী মহাশয়, কাকিনিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া, উপাসনা, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনোৎসবে জীবন্ত ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত করিয়া আসিয়াছেন।

সাধনপ্রাপ্তির বাধা—ছোটদাদা।

অগ্রহায়ণ, ২য় সপ্তাহ, ১২৯৩ সন।

আগামী শনিবার ছাত্র-সমাজে গোস্বামী মহাশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম। বক্তৃতা করিতে গোস্বামী মহাশয়ের আর তেমন উৎসাহ নাই, দেখিলাম। যাহা হউক, শরীর সুস্থ থাকিলে চেষ্টা করিবেন, বলিলেন। আমার বন্ধু কয়টি একথার পর চলিয়া গেলেন। কিন্তু, আমি তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তখন ওখানে কেবল শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ ও অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমাকে

বলিলেন—"তোমার কি গোপনে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে?" ঐ কথায় গোঁসাই আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "**কি বল্‌বে, বল না? এঁদের কাছে বল্‌তে কোন শঙ্কা নাই; স্বচ্ছন্দে বল।**"

আমি বলিলাম—স্কুলবন্ধের পূর্ব্বে আমি একবার বলেছিলাম।

গোঁসাই। হাঁ, তাই? সাধন নিতে চাও? আচ্ছা, সাধনের নিয়ম প্রণালী সব জান তো?

আমি। যতটুকু প্রকাশ আছে ততটুকুই মাত্র জানি।

গোঁসাই। এই সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক তাঁকে সেই অবস্থার সব কাজ কর্‌তে হয়। সংসারীদের সংসারকার্য্যে অবহেলা কর্‌লে অন্যায় হয়। সেইপ্রকার ছাত্রদেরও নিয়মমত মনোযোগ ক'রে পড়াশুনা কর্‌তে হবে; না হ'লে অনিষ্ট হয়। এটি গিয়ে বেশ করে বুঝ; পরে, কাল এসে আমাকে ব'লো। আরও যা কিছু বল্‌বার আছে, কাল বল্‌ব।

গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি প্রচারক-নিবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বুড়ীগঙ্গার পারে গিয়া, একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এ কি হ'লো? সাধন পাওয়ার পূর্ব্বেই যে গোঁসাই একেবারে আমার মাথায় লাঠি মারিলেন! ছমাস ধরিয়া প্রতিদিন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছি—একবার যোগ-সাধন পাইলে লেখা পড়ার বিষম উৎপাতহইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব; কোনও নিভৃত পাহাড়-পর্ব্বতে যাইয়া, আপন মনে, মুনি ঋষিদের মত দিনরাত উপাসনায় থাকিয়া এ জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু গোঁসাই আজ এ কি করিলেন? আমার এতকালের আন্তরিক সঙ্কল্প একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন! রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত এই সব ভাবিতে ভাবিতে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। পরে, আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, একান্ত মনে গোঁসাইয়ের চরণোদ্দেশেই নমস্কার করিয়া জানাইলাম—"গোঁসাই, আমায় দয়া কর। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিব না। 'নিয়মিত' 'মনোযোগ'—এ সব কথায় আমি রাজী হইতে পারিব না। লেখা-পড়া করিব, ইহাই মাত্র বলিতে পারিব। আমাকে এই আশায় তুমি নিরাশ করিও না। প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া দয়া কর—এই তোমার চরণে প্রার্থনা।" গোঁসাই মনের কথা বুঝেন—আমি ইহা একেবারেই বিশ্বাস করি না; কিন্তু অন্তরের আবেগে এইপ্রকার প্রার্থনা আপনাহইতেই আসিয়া পড়িল; চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

পরদিন সময় বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া বসিতেই, তিনি আমাকে বলিলেন—**কি ? হয়েছে ?**

আমি বলিলাম—'আজ্ঞা, হাঁ। লেখা-পড়া করব'। গোঁসাই একটু হাসিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা! আরও একটি কথা আমার বল্‌বার আছে। এখন আর আমার কোনও আপত্তি নাই। শুধু, তোমার অভিভাবকের অনুমতি হ'লেই হ'লো। অভিভাবকের অমতে সাধন দেওয়ার নিয়ম নাই। এক-শ বছরের বৃদ্ধেরও যদি কেহ অভিভাবক থাকেন, তাঁর অনুমতি নিতে হয়। তোমাকে আর কিছুই বল্‌বার নাই। অভিভাবকের অনুমতি পেলেই হবে।

একথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। ভাবিলাম—'গোঁসাই এ যে আমাকে আরও বিষম সঙ্কটে ফেলিলেন'। গোঁসাইকে বলিলাম, 'অভিভাবকের অনুমতি আমি কি প্রকারে লইব ? আমার দাদারা তিনজনেই তো আমার অভিভাবক'।

গোঁসাই বলিলেন—

তা হ'ক্; এখানে তোমার যে দাদা আছেন তাঁর একখানা পত্র পেলেই, নিশ্চিন্ত হয়ে, সন্তুষ্ট মনে আমি তোমাকে সাধন দিতে পারি। অনেকে মনে করেন, ছেলেপিলেদের এই সাধন দিয়ে আমি নষ্ট কর্‌ছি। অনুমতি না নিয়ে সাধন দিলে তাঁদের অভিশাপ আমাকে নিতে হয়।

গোঁসাইয়ের একটি শিষ্য উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি সাধন পাবে ?"

গোঁসাই বলিলেন—

কাল দেখ্‌লাম ব্যাকুলতা সুন্দর আছে, এবার অবস্থা বেশ হ'য়েছে।

আমাকে বলিলেন—

তুমি অস্থির হয়ো না; সাধন তোমার হবেই। কিছু সময় ধৈর্য্য ধর।

দাদাদের অনুমতি কখনও আমি পাইব না, ইহা নিশ্চয় জানি; কিন্তু গোঁসাইয়ের এই কথা দু'টি শুনিয়া আমার একটু আশা হইল। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়া, ছোট দাদা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার অভিপ্রায় সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া, গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা-গ্রহণের অনুমতি-পত্র চাহিলাম। গোঁসাইয়ের নিকটে সাধন লইব শুনিয়াই তিনি খুব চটিয়া গেলেন, এবং কখনও অনুমতি দিবেন না পরিষ্কার বলিলেন।

ছোট দাদার কথা শুনিয়া ও ভাবগতিক দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে ভিতরের যাতনা আমার এত অসহ্য হইল যে আর আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। 'মেসের' সমস্ত ছেলেরা তখন "কি হ'ল, কি হ'ল" বলিয়া, পড়াশুনা ফেলিয়া, সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছোট দাদাও আসিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া বাসার বাহিরে রাস্তায় লইয়া গেলেন। তিনি খুব বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্—আমাদের মতের বিরুদ্ধে কখনও কোনও কাজ কর্‌বি না; যতকাল লেখাপড়া কর্‌তে বল্‌ব, খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কর্‌বি; আমাদের পরিবারের যাতে অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কাজ কখনও কর্‌বি না।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা; অনুমতি-পত্র দিন, যা যা বল্‌লেন তাই কর্‌ব।" ছোট দাদা একটু থামিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কাল আরও কতকগুলি 'লিষ্ট' (ফর্দ্দ) ক'রে দিব; সেই মত চল্‌বি প্রতিজ্ঞা কর্‌লে অনুমতি দিব।" যে রূপেই হ'ক অনুমতি লইতে হইবে ভাবিয়া, আমি ছোট দাদার কথায় সম্মত হইলাম।

সকালে ছোটদাদার নিকটে অনুমতিপত্রের কথা তুলিতেই তিনি, খুব রাগিয়া, আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"সে সব কিছু হবে না। যোগ কর্‌লে ভয়ানক রোগ জন্মে। মাথাতো একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যায়। ভাল ভাল লোক ওর ভিতরে গিয়ে চিরকালের মত একেবারে অকর্ম্মা 'ভেড়া' হ'য়ে গেছে। আমি তো অনুমতি দিবই না; দাদারাও কেহ অনুমতি না দেন, সে জন্য তাঁদের চিঠি লিখ্‌ব।" এই সব বলিয়া আমাকে তিনি খুব গালাগালি করিলেন। ছোট দাদার গালি খাইয়া ক্রোধে ও ক্লেশে আমার বুক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কি আর করিব? উপায় আর না দেখিয়া গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। গোঁসাইকে এই সমস্ত বিবরণ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম।

১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১২৯৩ সাল।

গোঁসাই বলিলেন—

তিনি নিজে অনুমতি নাই দিলেন। দাদাদের একটু লিখ্‌তে আর আপত্তি কি?

অকপট বিশ্বাসে অব্যর্থ শক্তি।

এই সময়ে প্রচারক-নিবাসে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। আর কোন কথাই হইল না। আজ রবিবার, সারাদিনই প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লোকের

ভিড়। অপরাহ্ণে স্কুল-কলেজের ছাত্র, আফিসের বাবু, এবং বাউল, বৈষ্ণব, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতির সমাগমে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের আসনঘরে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের "যার যার যেরূপ উদয় হয় মনে, সময়ে সেরূপের দেখা মিলে কই?" এই গানটি অপূর্ব্ব জমাট ভাব ধারণ করিল। বাহিরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিয়মিত সময়ে বেদির কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে অনুমানে সঙ্গীত থামাইয়া দেওয়া হইল; গোস্বামী মহাশয় চোখ-মুখ মুছিয়া, সমাজগৃহে যাইয়া, উপাসনা করিতে বসিলেন। ঘরে বাহিরে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, প্রথমহইতে বেদির কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেই ভাবেই রহিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় একবার কিছুক্ষণের জন্য কেহ যোগ দিলে শেষপর্য্যন্ত তাহার আর না থাকিয়া উপায় নাই। আজিকার 'উদ্বোধন' কালের উপদেশগুলি—আমার মনে হইল যেন আমাকেই বলিতেছেন। সরল বিশ্বাসে, যথার্থ কাতর হইয়া, কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলে, ভগবান নিশ্চয়ই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। —"একবার ইউরোপে কোন দেশে দীর্ঘকালব্যাপিনী দারুণ অনাবৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্র বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ হইল। সেই সময়ে একটি সহরে, সকলে সমবেত হইয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবেন—এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগরবাসী সকলে গির্জ্জায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে একটি বালক, ছাতা হাতে, উপাসনার স্থলে আসিল। বালকের হাতে ছাতা দেখিয়া সকলে তাহাকে বলিলেন, "কি হে, বালক, তুমি ত বড় বোকা দেখ্‌ছি। এই সময়ে ছাতা কেন?" বালক বলিল—"আজ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা হইবে। ভগবান্ বৃষ্টি দিবেন, তখন কি কর্‌ব? ছাতা না থাকলে যে ভিজে ভিজে বাড়ী যেতে হবে।" সকলে বালকের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। প্রার্থনার পরে যথার্থই বৃষ্টি হইল। তখন বালক সকলকে বলিল, "ভগবানের উপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাক্‌তো, ছাতা ফেলে আস্‌তে না। এখন দেখ, তোমরা প'ড়ে রইলে, আমি চলে যাচ্ছি।" এই ঘটনা অবলম্বনে গোস্বামী মহাশয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া, 'সরল বিশ্বাসে কাতরতার সহিত প্রার্থনা' বিষয়ে উপদেশ দিলেন; অতঃপর, উপাসনার শেষ ভাগে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন—

তোমাদের পায়ে পড়ে বল্‌ছি, একবার মাকে ডাক। শিশু যেমন মাকে ডাকে, একবার তেমনই ভাবে, কাতর হ'য়ে, ডাক। মায়ের কত দয়া! আমার মত পাপীকেও যখন মা কৃপা কর্‌ছেন, তখন কেহই আর বঞ্চিত হবে না। বিশ্বাস

ক'রে মাকে ডাক্‌লে নিশ্চয় মাকে পাবে। আমি শোনা কথা বল্‌ছি না, কল্পনার কথা বল্‌ছি না, যথার্থ কথা বল্‌ছি, নিজ জীবনের দেখা কথা বল্‌ছি, নিজে প্রত্যক্ষ ক'রে বল্‌ছি। সরল ভাবে মাকে ডাক্‌লেই মাকে পাওয়া যায়। একবার মাকে ডেকে দেখ; একটিবার তেমন ভাবে মাকে ডেকে দেখ, নিশ্চয় দয়া কর্‌বেন। আমার মস্তকে পদধূলি দিয়ে সকলে আশীর্ব্বাদ করুন। জয় মা! জয় মা! জয় মা! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য।

সাধনপ্রাপ্তির বাধা—মেজ দাদা।

১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১২৯৩।

আজ স্কুল হইতে আসার পরে ছোট দাদা বলিলেন—"মেজ দাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) ঢাকায় আসিয়াছেন; তিনি একরামপুরে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছেন; কল্য বৈকালে তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়াছেন।" মেজ দাদার কথা শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। নিশ্চয়ই সাধনসম্বন্ধে কথা তুলিয়া আমাকে গুরুতর শাসন করিবেন, বুঝিলাম। সারারাত ও পরদিন দুঃসহ উদ্বেগে কাটাইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'তাঐ' মহাশয়ের বাসায় গেলাম। মেজ দাদার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গেলেন। অত্যন্ত তীব্রভাষায় কর্কশস্বরে গালি দিতে দিতে যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। চটিজুতা হাতে লইয়া আমাকে প্রহার করিতে দু' চার পা অগ্রসর হইলেন; ভাগ্যক্রমে তখন বৌদিদির বাধা পাইয়া থামিয়া গেলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন—"'যোগ' শব্দটি ফের যদি কখনও তোর মুখে শুন্‌তে পাই, জুতিয়ে পিঠের ছাল চামড়া তুলে দিব। আমাদের তো যত প্রকারে অপমান কর্‌বার কর্‌ছিস; এখন মৃত পিতাকেও নরকস্থ কর্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে! তুই মর্‌লে আমাদের সকল উৎপাতের শান্তি হয়"—ইত্যাদি। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ গালি খাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আমি সেই বাসাহইতে বাহির হইয়া আসিলাম। স্ত্রীলোকের সম্মুখে এই অপমান! ক্রোধে, অভিমানে ও ক্লেশে আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল। আরও একবার যোগসাধন-লাভের চেষ্টা করিয়া দেখিব; বিফল হইলে পশ্চাতে যাহা হয় করিব—স্থির করিলাম। আজ ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—'যদি তাঁহার কৃপায় এই সাধন জীবনে লাভ হয়,

তবে আমার যোগশক্তি দারুণ বিরুদ্ধমতি মেজ দাদার ও পরে ছোট দাদার উপরে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োগ করিয়া, ইহাঁদিগকে গোঁসাইয়ের চরণেই আনিয়া বলি দিব। দীক্ষালাভের পর প্রথমে আমার এই সঙ্কল্পেই সাধন ভজন তপস্যা আরম্ভ হইবে'।

হতাশায় আশ্বাস।

অভিভাবকদের সম্মতি লইয়া দীক্ষা-গ্রহণ আমার কখনও হইবে না বুঝিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের উপর আমার ভয়ানক অভিমান আসিল। স্থির করিলাম, আর একবার দীক্ষার জন্য বলিয়া দেখি; এবারেও যদি গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায় 'পাক দেন' বা ওজর করেন, দস্তুর মত দশ কথা শুনাইয়া আসিব। কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মে সহস্র সহস্র লোককে তিনি যে দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কি কখনও কাহারও অভিভাবকের মতামতের অপেক্ষা করিয়াছেন? তার পরে, যদি কোন এক পরিবারের কর্ত্তা নাস্তিকই হয়, তাহা হইলে কি সে পরিবারস্থ কাহারও আর ভগবানের নাম লওয়ার অধিকার থাকিবে না? অভিভাবকের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন কি সর্ব্বসাধারণের জন্য, না, এ ব্যবস্থা শুধু আমারই পক্ষে?

স্কুল ছুটির পর, সোজা একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দাদাদের অনুমতি পাইলাম না জানাইতেই, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার বড় দাদা কোথায় আছেন?

আমি বলিলাম—বড় দাদা (শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফয়জাবাদে য়্যাসিস্‌টাণ্ট সার্জ্জন।

গোঁসাই। আচ্ছা, তুমি অনুমতির জন্য তাঁকে লিখে দাও। তিনি তোমাকে অনুমতি দিবেন। ব্যস্ত হ'য়ো না, সব ঠিক হয়ে আস্‌বে।

"যদি বড় দাদাও অনুমতি না দেন তবে কি হইবে?" একথা বলিতে আরম্ভ করামাত্রই শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তিপ্রভৃতি গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য, আমার সে কথায় বাধা দিয়া, হাতে ধরিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন—"ও কি? গোঁসাইয়ের কথার প্রতিবাদ কর্‌ছিলে! ওতে যে অপরাধ হয়। উনি যা বল্‌লেন তাই কর, বড় দাদাকে লিখে দেও। উনি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি অনুমতি দিবেন।" আমি একথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম; হাসিও পাইল। ভাবিলাম—'হা ভগবান! এমন কুসংস্কারী লোকও

আবার ব্রাহ্মসমাজে আসে'! যাহা হউক, কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম; এবং অনুমতির জন্য সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া বড় দাদাকে লিখিয়া জানাইলাম।

সাধনলাভে বড় দাদার সম্মতি।

অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ।

বড় দাদা, আমার পত্র পাইয়াই, কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যোগসাধন গ্রহণ করিব শুনিয়া তিনি সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক আমাকে, উৎসাহ দিয়া, অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তবে পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন—"ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য তুমি যে পথ অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হইয়াছ তাহাতে আমার কোন আপত্তিই নাই, বরং সন্তোষের সহিত উৎসাহই দিতেছি। কিন্তু মা আমাদের বর্ত্তমান আছেন; সুতরাং এ বিষয়ে শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মা'রও অনুমতি লওয়া উচিত।" পত্রখানি পড়িয়া, তৎক্ষণাৎ আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। দাদার পত্রের মর্ম্ম বলাতে তিনি উহা সকলের সমক্ষেই পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। শুনিয়া সকলেই দাদার খুব প্রশংসা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন—

এই পত্রখানা তোমার দলিল, বেশ যত্ন ক'রে রেখে দিও। এবার তোমার প্রায় সমস্তই শেষ হ'য়ে এল। আর একটি কাজ বাকী আছে। সেটি হলেই সব হয়। তোমার দাদা তোমার মা ঠাক্‌রুণের অনুমতি নিতে লিখেছেন। এখন তুমি একদিন বাড়ী যেয়ে মা'র অনুমতি নিয়ে এস। তা হ'লেই হয়।

আমি বলিলাম, যোগের কথা শুন্‌লে মা আমাকে কখনও অনুমতি দিবেন না। একেই তিনি মনে করেন, আমি 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' ক'রে সংসার ছেড়ে চলে যাব"।

গোঁসাই বলিলেন—

তোমার মা'কে যোগ টোগ ব'ল না; 'সাধন নিব'—এই শুধু ব'ল। তা হ'লেই তিনি অনুমতি দিবেন।

গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এখন কি উপায়ে বাড়ী যাই? বাড়ী যাইতে চাহিলেই তো দাদারা জিজ্ঞাসা করিবেন "কেন?"। তাহা হইলেই

তো সব কথা গোপন না রাখিয়া বলিতে হইবে'। বাড়ী যাওয়া যে এ সময়ে আমার পক্ষে কত শক্ত, একবার তাহা গোঁসাইকে জানাইতে ইচ্ছা হইল। এ সময়ে অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়াতে সে সুযোগ ঘটিল না। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ব্রাহ্মসমাজে সাংবৎসরিক উৎসব।

আজ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীলোক পুরুষে পরিপূর্ণ। মন্দিরে ও চতুর্দ্দিকের প্রাঙ্গণে লোক আর ধরে না। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসনহইতে উঠিয়া আসিয়া উপাসনা করিতে বেদিতে বসিলেন। শারদীয় পূজার আগমনে, পূজা আসিতেছে মনে করিয়া, দেশশুদ্ধ লোকের যে কেমন একটা আনন্দ উৎসব ও উল্লাসের উদয় হয় তাহা বর্ণনা করিয়া, তিনি উপাসনার পূর্ব্বেই সকলের ভিতরে একটা আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার করিয়া দিলেন। উপাসনা করিতে বসিয়া দু'চার কথা বলিয়াই, ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

এই মা! এই যে আমার মা এসেছেন! মা আমার আজ তাঁর কাঙ্গাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিয়ে সাধ্‌ছেন। মা, আজ আমি একা পাব না; সকলকে তুমি হাতে ধরে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব।

এই সব বলিয়া, ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন, গদগদ ভাবে, করজোড়ে, কাঁদ কাঁদ স্বরে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথার, প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অব্যক্ত একটা ভাবে সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মন্দিরের বাহিরে, ভিতরে, চতুর্দ্দিকে ভাবোচ্ছ্বাসের 'হুঁ হুঁ' শব্দ পড়িয়া গেল। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায়-প্রমুখ দু'চার জন গণ্য মান্য পদস্থ ব্রাহ্ম, গোলমাল থামাইতে, "থামুন, থামুন, চুপ করুন, চুপ করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কে আর কার কথা শুনে? বেগতিক দেখিয়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় হারমোনিয়মে সুর চড়াইয়া গান সুরু করিয়া দিলেন। এদিকে গোস্বামী মহাশয় "জয় মা, জয় মা" বলিয়া বেদিহইতে লাফাইয়া পড়িলেন। উচ্চ

সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, গোস্বামী মহাশয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বালক-বৃদ্ধ-যুবকেরা স্থানে স্থানে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। হুঙ্কার গর্জ্জন ও বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে ব্রাহ্মমন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই আজ এই মহোৎসবে মাতিয়া গেলেন। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল, জানি না। অবশেষে গোস্বামী মহাশয় "হরিবোল, হরিবোল। স্থির হও, স্থির হও।" বলিয়া হস্তদ্বারা সকলের মস্তক স্পর্শ করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র, যাঁহারা নৃত্য করিতে-ছিলেন বসিয়া পড়িলেন, যাঁহারা চীৎকার করিতেছিলেন শান্ত হইলেন, এবং যাঁহারা সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন তাঁহাদেরও বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মমন্দির পুনরায় শান্ত, স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। আবার গোস্বামী মহাশয় বেদিতে উঠিয়া বসিলেন। অদ্যকার এই ভাষাতীত, নীরব উপাসনার ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে স্মরণার্থ এ ব্যাপারের অতি সামান্য একটু আভাস মাত্র এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। এরূপ ব্যাপার ব্রাহ্মমন্দিরে আমি আর ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

গোঁসাইয়ের উপদেশ—প্রার্থনার প্রকারভেদ।

আজ গোস্বামী মহাশয় বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—

ধর্ম্মকে জীবনে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে, উহা কখনও টেঁকে না, বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বরকে আমরা এই চারপ্রকার অবস্থায় ডাকি। জল, বায়ু, আহার উত্তাপাদি দ্বারা যেমন এ দেহের রক্ষা হয়, পুষ্টি হয়; কোনটির অভাব হইলেই যেমন দেহ স্বভাবহইতেই তাহা চায়, না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে না; সেইপ্রকার আত্মার কল্যাণের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য পরমেশ্বরের উপাসনাও প্রয়োজন হয়। আত্মা স্বভাববশতঃই পরমেশ্বরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে; না হ'লে স্থির হ'তে পারে না। পরমেশ্বরের কাছে কোন আশা নাই, প্রার্থনা নাই; মুক্তিও চাই না, ভক্তিও বুঝি না। তিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁকে না ডেকে পারি না, তাই তাঁকে ডাকি; এই প্রকার স্বভাবহ'তে যে তাঁকে ডাকা, ইহা বড়ই দুর্লভ এবং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অভাববোধেও আমরা ভগবান্‌কে ডাকি। কোনও একটা বিষয়ে তেমন অভাববোধ হ'লে, তাহা পূরণ কর্‌বার জন্য যখন কাহাকেও পাই না, নিজের অভাব ক্লেশ দূর করিতে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি চেষ্টা-সামর্থ্য যখন একেবারে পরাস্ত হ'য়ে যায়, তখন চারিদিক্ অন্ধকার দেখে তাঁরই শরণাপন্ন হই, তাঁকেই ডাকি। এই ভাবে ভগবান্‌কে ডাকাও ভাল; ইহাতেও জীবনের যথেষ্ট কল্যাণ হয়। কিন্তু অভাবে পড়ে তাঁকে ডাক্‌লাম, অভাব পূরণ হ'ল, আর তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রইল না; রোগের যন্ত্রণায় পড়ে ডাক্‌লাম, রোগ আরোগ্য হ'ল, আর তাঁকে ভুলে গেলাম—এই প্রকার হ'লে, এই ভাবে ডাকায়, জীবনের কোন উপকারই হয় না। পরে কৃতজ্ঞতা থেকে গেলেই মঙ্গল, না হ'লে সমস্তই বৃথা।

জিজ্ঞাসুভাবে সংশয়নিবৃত্তির জন্যও আমরা ভগবান্‌কে ডেকে থাকি। 'শুন্‌তে পাই ধর্ম্ম ব'লে একটা বড়ই আশ্চর্য্য জিনিষ আছে; ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌লে, ভগবান্‌কে ডাক্‌লে কোন ক্লেশই থাকে না, কোনরূপ অশান্তি নাকি অন্তরকে স্পর্শ করে না। আচ্ছা, একবার ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রে, জপ-তপ ক'রে, ভগবান্‌কে ডেকে দেখাই যাক না কেন, সত্যই তাই কি না। হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম নাকি ভাল। আচ্ছা, দিনকতক সমাজে গিয়ে দেখিই না কেন? লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কত স্বার্থত্যাগ কর্‌ছে, কত অপমান নির্য্যাতন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে! এর ভিতরে একটা কিছু আরামের বস্তু থাক্‌তেও পারে। আচ্ছা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্ না কেন এতে কিছু আছে কি না"—এই ভাবের লোকই আজ কাল অধিক। এদের প্রার্থনা উপাসনাপ্রভৃতি সমস্তই সন্দেহে পরিপূর্ণ। ভগবান্‌কে পরীক্ষা-করিতে যেন ইহাঁরা আসেন। শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য সংশয়াপন্ন মনে এসব লোক ভগবান্‌কে ডেকে কোন ফলই পান না।

অনুকরণের ভাবেও আমরা ভগবান্‌কে ডেকে থাকি। 'যাঁরা ধার্ম্মিক, লোকে তাঁদের কেমন একটা সম্মান করে; ধার্ম্মিক লোককে সকলেই কেমন বিশ্বাস করে! একটু ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌লে, ভগবানের নাম নিলে, লোকসমাজে

যদি একটা প্রতিষ্ঠা হয়, ক্ষতি কি ? মানুষ সম্মানলাভের জন্য কতই তো করে ! আমি যদি একটু ধর্ম্মের অনুকরণই ক'রে, কীর্ত্তনাদিতে দু'চারবার 'হরিবোল' ব'লে, চীৎকার করলে ও লম্ফ ঝম্ফ দিলে, বা উপাসনাতে একটু চোখের জল ফেলিলেই সেই সম্মান পাই, লাভ বই লোকসান তো কিছুই নাই। একবার দেখাই যাক্ না, ক'রেই দেখি না ?' এইপ্রকার কপটভাবে ধর্ম্মের অনুকরণ করা অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে কল্যাণ তো কিছুই হয় না, বরং আত্মার অনিষ্ট হয়।

সাধনলাভে মায়ের অনুমতি।

উৎসবান্তে, একদিন সন্ধ্যার পর ছোট দাদা বলিলেন যে, 'কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ বাড়ীতে লইয়া যাইতে মেজ দাদা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আগামী কল্যই সে সমস্ত লইয়া তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে'। আমার প্রতি ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৃপা ! পরদিনই সকালে বাড়ী রওনা হইলাম। এ দিকে বাৎসরিক উৎসবও শেষ হইল। এই উৎসবেই আমি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব, সর্ব্বত্র ইহা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, ডাক্তার পি কে রায় এবং নবকান্তবাবু-প্রভৃতি অনেকে আমাকে উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্ম হইলে যদি দাদারা লেখা পড়ার খরচ বন্ধ করেন, আমরা তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব।" মাতা ঠাকুরাণীও মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন—এবার আমি একটা কিছু করিব। অকস্মাৎ অসময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম দেখিয়া মা একটু বিস্মিত হইলেন। গলায় নজর করিয়া পৈতা দেখিতে পাইয়া ঠাণ্ডা হইলেন। অবসরমত, পরদিন মাতা ঠাকুরাণীর আহ্নিকান্তে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম—'মা, আমি দীক্ষা নিব, আমাকে অনুমতি দাও।' শুনিয়াই মা কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন—'তুই কি পৈতা ফেলে ব্রাহ্ম হ'বি ?' আমি বলিলাম—"না, মা; আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নিব। তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রে অনুমতি না দিলে তিনি আমাকে সাধন দিবেন না।" এই বলিয়া, আবার লুটাইয়া পড়িয়া মা'র পা দু'টি জড়াইয়া ধরিলাম। মা তখন আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমি তো নিজে আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই করতে পারলাম না। তোরা যদি করিস্, নিষেধ করব কেন ? তুই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর্, সাধন-ভজন কর্, আমার তাতে খুব অনুমতি আছে, আমার তাতে খুব আনন্দ। তুই পৈতাটি ফেলিস্ না, আর,

আমি যতকাল জীবিত আছি, নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাস্ না—এইটি করিস্। সংসারে থেকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর্। ভগবান্ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। আমিও তোকে এই আশীর্ব্বাদ করি।"

মাতা ঠাকুরাণীর চরণ-ধূলি লইয়া আমি ঢাকা রওনা হইলাম। যথাকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিয়া সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি খুব সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—

বেশ হয়েছে। তুমি বৃহস্পতিবার ভোরে স্নান ক'রে এস, তা হ'লেই হবে।

এই কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের মুখহইতে বাহির হওয়া মাত্র, 'পাছে আবার কোনও পাকচক্রে ফেলেন' এই ভাবিয়া, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আমার দীক্ষা।

মনের উদ্বেগে সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না। শেষরাত্রে ৩।৪টার সময়ে উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিয়া, ব্রাহ্মমন্দিরে প্রচারকনিবাসের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিতে লাগিলাম—গোস্বামী মহাশয় করতাল বাজাইয়া ভোর-কীর্ত্তন করিতেছেন। "জয় জ্যোতির্ম্ময়, জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন"—এই গানটি গাইতে গাইতে, এক একবার ভাবাবেশে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ দ্বারে বসিয়া রহিলাম। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী মহাশয় বাহিরে আসিলেন; এবং আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হাসি-মুখে বলিলেন—

২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাপঞ্চমী, ১২৯৩।

এত ভোরে এসেছ? তা বেশ হয়েছে। এখন সমাজে গিয়ে ব'সো। একটু বেলা হোক্; পরে, শুভক্ষণ বুঝে তোমাকে ডেকে নিব।

আমি সমাজ-ঘরে আসিয়া বসিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গোস্বামী মহাশয় আমাকে ডাকিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি আসনহইতে উঠিয়া বলিলেন—"চল, উপরে যাই, সেইখানে কাজ হবে।" আমি গোস্বামী মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক, শ্রীধর ঘোষ, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দোতলার পূবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঐ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দুখানা আসন পাতা রহিয়াছে।

গোস্বামী মহাশয় দেওয়াল ঘেঁষিয়া পশ্চিমমুখো হইয়া বসিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রায় ৩া ফুট অন্তরে অন্য আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা এই সময়ে ধুনুচিতে করিয়া আগুণ আনিয়া দিল। গোস্বামী মহাশয় ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল-চন্দনাদি অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া, করজোড়ে বারংবার নমস্কার করিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। অবিরল ধারে তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। এখন কিছুক্ষণের মত গোস্বামী মহাশয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকিবেন অনুমানে, ব্যাকুল অন্তরে, কাতর ভাবে, আমি মনে মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।—"হে জ্ঞানস্বরূপ, জাগ্রত পুরুষ, হে সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, দীন-জনের একমাত্র গতি পরমেশ্বর, হে পতিতপাবন দয়াময় প্রভু, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি আর না করি, তুমি এখানে আছ, আমার অন্তরের সমস্ত অবস্থাই দেখিতেছ। বহুকালহইতে তোমার চরণলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, দিন দিন তুমি আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছ, নানা-প্রকার বিঘ্ন বিপৎ সৃষ্টি করিয়া, তুমিই দয়া করিয়া তাহাহইতে আবার আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। প্রভু, যেমন আশা দিয়াছ, ফলও তেমনই দিও। তোমাকে লাভ করিবার উপায় আমি কিছুই জানি না। প্রভো, তুমি সর্ব্বঘটে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। আজ গোঁসাইয়ের ভিতরে তুমি থাকিয়া আমাকে দীক্ষা দাও। তোমার শ্রীচরণ লাভ করিবার পথ তুমিই আমাকে বলিয়া দাও। এখন আমি আমাকে তোমার শান্তিপ্রদ অভয় চরণে সমর্পণ করিলাম। হে সর্ব্বশক্তিমান্, সত্য-স্বরূপ, পুরাণ পুরুষ, এ সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের মুখে তুমিই আমাকে সাধন দাও। তাঁর ঐ মুখে তুমিই আমাকে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নাম বলিয়া দাও। এখন গোঁসাইয়ের মুখের প্রত্যেকটি শব্দ তোমারই অভ্রান্ত বাণী বলিয়া আমি গ্রহণ করিব। তোমার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা বিষয়ে তুমিই আমার একমাত্র সাক্ষী রহিলে। স্বয়ং তুমিই আমাকে আজ দীক্ষা না দিলে গোঁসাইয়ের মুখ অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া পড়ুক। আর কি বলিব, তুমিই আমাকে দয়া কর।"

প্রার্থনান্তে, নমস্কার করিয়া, চাহিয়া দেখি—গোস্বামী মহাশয় পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, তাঁর কলেবর কণ্টকিত হইতেছে। করজোড়ে গদগদ স্বরে—'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা'—ইত্যাদি স্তোত্র পড়িতেছেন। পরে, কয়েকবার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,

নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্—
এই স্তবটি পাঠ করিলেন। অতঃপর, "জয়গুরু, জয়গুরু, জয়গুরু," কয়েকবার বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন; কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া, ভাব-সংবরণ পূর্ব্বক, মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন—

পরমহংসজী * দয়া ক'রে তোমাকে এই মন্ত্র দিচ্ছেন—তুমি গ্রহণ কর!—এই বলিয়া আমাকে অপ্রাকৃত দুর্লভ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং নামের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে, শাস্ত্রসম্মত গুরুমুখী প্রাণায়াম দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, এইরূপ করতো। আমিও ঐপ্রকার করিতে লাগিলাম। গোঁসাই তখন উচ্চৈঃস্বরে 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলিতে বলিতে, ভাবাবেশে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। সংজ্ঞালাভের পর বলিলেন—প্রতিদিন দু'বেলা এইরূপ করতে চেষ্টা ক'রো।

আমাকে আর সাধনের কোন উপদেশই দিলেন না। আমিও মনে মনে নাম জপ করিতে করিতে ঘরহইতে বাহির হইয়া আসিলাম। শুনিলাম—এ পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট কেবলমাত্র ফণিভূষণ ঘোষ (শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) ও গোস্বামী মহায়ের কনিষ্ঠা কন্যা 'কুতুবুড়ী' (শ্রীমতী প্রেমসখী)—এই দুই জন দীক্ষালাভ করিয়াছেন। আমার দীক্ষার সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ মহাশয় "আমি যেন বীর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হই" এই সংকল্পে অতি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা প্রদানকালে দীক্ষার্থীর ভিতরে অব্যক্ত এক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন, সর্ব্বত্রই এই কথা প্রচারিত আছে; কিন্তু আমার মধ্যে কোনও শক্তি সঞ্চার করিলেন এইরূপ কিন্তু আমি কিছুই বুঝিলাম না। আমার নিজের মত, সংস্কার ও ভাবের অনুযায়ী মন্ত্র লাভ করিয়া আমার একটা খুব আনন্দ হইল।

সাধনে বৈঠক।

১২৯৩ সালের ৩০শে পৌষ পর্য্যন্ত।

দীক্ষাগ্রহণের পরে ঘন ঘন গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যাইতে লাগিলাম। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও আফিস-আদালতের বাবুরা অনেকেই প্রত্যহ অপরাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রচারকনিবাসে পূবের 'কোঠা'র উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গোস্বামী মহাশয়ের আসন। মধ্যাহ্নে ও

* গোঁসাই'এর গুরুদেব, কৈলাসসমীপস্থ মানসসরোবরবাসী শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী।

বিকালে যখনই যাই, গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আসনে সম্মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া, কখনও বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায়, নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন, দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত আশানন্দ বাউল ও শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস মহোদয়ের অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারবাবু প্রতিদিনই বিকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসেন। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে উঁহাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন আছে। গোঁসাই ধ্যানস্থ থাকিলেও উঁহারা কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিয়া দেন; কখনও বা রাধাপ্রেমের গান বা গৌরকীর্ত্তন জুড়িয়া দেন। ক্রমে গোস্বামী মহাশয়েরও ধ্যানভঙ্গ হয়। বাউল বৈষ্ণবদের এই সব গানে গোস্বামী মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্বাস দেখিলে, আমাদের তাহা ভাল লাগে না; সুতরাং একটু ফাঁক পাইলেই আমরাও অমনই উচ্চ কণ্ঠে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেই। বাউল বৈষ্ণবেরাও ঐ সময়ে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে। সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এই ভাবেই যায়। সন্ধ্যার পরে গোস্বামী মহাশয় কয়েক মিনিটের জন্য শৌচে যান। পরে আসনে আসিয়া ধূপ ধূনা জ্বালিয়া নিজে করতাল বাজাইয়া সন্ধ্যাকীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনের পরেই দরজা বন্ধ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের অনুগতশিষ্যগণ-ব্যতীত তখন প্রচারক-নিবাসে অপর কোনও লোক থাকিতে পারেন না। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাকে বৈঠকে* যোগ দিতে বলিয়াছেন; তদনুসারে আমিও 'বৈঠকে' বসি। প্রাণায়াম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই গোঁসাই আমাকে তাঁহার সম্মুখে দু'হাত অন্তরে বসিতে বলেন। প্রায় সাড়ে সাতটা আটটার সময়ে প্রাণায়াম আরম্ভ হয়; এবং অবিচ্ছেদে এক ঘণ্টা প্রাণায়ামের পর একটি সঙ্গীত হয়। ইহার পরে আবার প্রাণায়াম চলে। এই প্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়। শুধু প্রাণায়ামে মনোযোগ পড়িলেই গোঁসাই আমাকে নামে চিত্ত স্থির রাখিতে বলেন। বাহিরে প্রাণায়াম, অন্তরে নাম—ইহা কিছুতেই আমার হইতেছে না। 'বৈঠকে' গোঁসাইশিষ্যদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছ্বাস, এবং গোস্বামী মহাশয় যে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও গদগদ স্বরে—**জয় বারদীর ব্রহ্মচারীজী! জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসজী! জয় মাতাজী! জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব!**—বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন তাহা দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। 'বৈঠকে'র সময়ে ঐ সব মহাত্মাদের নাকি আবির্ভাব হয়; গোঁসাই-শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হন। আমি কিন্তু কিছুই দেখি না; তবে গোস্বামী মহাশয়ের মুখের প্রত্যেকটি শব্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে;

---

* সতীর্থগণের সঙ্গবদ্ধ হইয়া সাধন-ভজন।

ভিতরে কেমন যে একটা অবস্থা হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। যথার্থই মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয় কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে প্রবল কৌতূহল জন্মিল। এই সময়ে কয়েকদিন উপর্য্যুপরি আমাকে 'বৈঠকে' উপস্থিত হইতে দেখিয়া, গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—ছাত্রাবস্থায় মনোযোগ ক'রে পড়াশুনা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সপ্তাহে একদিন তুমি বৈঠকে যোগ দিও, তা হ'লেই হবে। গোস্বামী মহাশয়ের কথামত সপ্তাহে একদিন মাত্র বৈঠকে যোগ দিতে লাগিলাম।

ইহা কি যোগশক্তি ?

ছোট দাদার একটি বন্ধুর মাতৃবিয়োগ হইল। তাঁহার নিকট ঘটনাটি গোপন রাখিয়া তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছান আবশ্যক হইল। আমি তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মাতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। বাড়ীর সকলের মরা-কান্নার রোলে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিলাম—আমার মাও যদি অকস্মাৎ মরেন, কি করিব ? মা আমার মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন, এইপ্রকার একটা উদ্বেগে আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, এবং মাকে দেখিতে অমনি বাড়ী রওনা হইলাম। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি---বিষম ব্যাপার। পাড়ার প্রায় সমস্ত লোক আমাদের বাড়ীতে আছেন এক একস্থানে দু'চার জন বসিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া কাঁদিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা বলিলেন—'মা তো চল্‌লেন। এসেছিস্, ভাল হ'য়েছে। একবার গিয়ে মা'কে এ সময়ে দেখে নে'। রাস্তার ক্লেশে শরীর আমার অবসন্ন, তার উপরে মাকে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—এ সময়ে গোঁসাই যদি মাকে আমার রক্ষা করেন তবেই ভরসা, না হ'লে আর আশা নাই। আমি গোঁসাইকে স্মরণ করিয়া আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। গোঁসাইয়ের নিকটে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীরও ভেদ-বমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'মা'র আর আশা নাই, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর এখনও জীবনের আশা আছে'। কলেরা রোগের কতকগুলি ঔষধের ফর্দ্দ তিনি করিয়া দিলেন; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তাহা জুটিল না। গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ার এই সুযোগ বুঝিয়া, ঔষধ আনার উপলক্ষে মাকে ফেলিয়া আমি অবিলম্বেই ঢাকায় রওয়না হইলাম।

ঢাকায় পৌঁছিয়া, সোজা একেবারে ব্রাহ্মসমাজে গোঁসাইয়ের নিকটে গেলাম। গোঁসাই আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন--কি? তুমি এ সময়ে এখানে? বাড়ী যাও নাই? ওঃ, বাড়ী থেকে এলে বুঝি?

আমি বলিলাম—এইমাত্র বাড়ী থেকে আস্‌ছি।

গোঁসাই। কেমন, অবস্থা কিরকম?

আমি বলিলাম—মা'র ও একটি ভাইঝির কলেরা হ'য়েছে।

গোঁসাই। তুমি ঔষধ নিতে এসেছ?

আমি। হাঁ।

গোঁসাই। তা হ'লে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। মেয়েটি কি ছোট?

আমি বলিলাম—সাত আট বৎসরের হবে।

গোঁসাই শুনিয়া 'আহা আহা' করিয়া দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক চোখ বুজিলেন; এবং ক্লেশ-সূচক 'উঃ! উঃ!' শব্দ করিয়া দু তিন মিনিট স্থির হইয়া রহিলেন। আমি এই অবসরে মাতা ঠাকুরাণীর আরোগ্যলাভের জন্য মনে মনে গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিলাম। গোঁসাই, চোখ মুছিয়া, সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

মা'র জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। ওষুধ নিয়ে যাও; ওতে গ্রামবাসীদেরও উপকার হবে।

আমি তাড়াতাড়ি ঔষধ লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। সমস্ত পথটি কেবল গোঁসাইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। এ সময়ে আমি বাড়ী ছাড়িয়া রহিয়াছি দেখিয়া গোঁসাই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন কেন? আর, আমি যে বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহাই বা তিনি জানিলেন কি প্রকারে? 'কেমন? অবস্থা কি রকম?'—কিছু না জানিলে, এরূপ প্রশ্নই বা করিবেন কেন? মেয়েটির কথা শুনিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে তো মনে হয় মেয়েটি আর নাই। 'ঔষধে পাড়ার লোকের উপকার হইবে' বলিলেন অথচ মেয়েটির কথা বলিলেন না। ইহাতে এই ঔষধ যে মেয়েটির আর প্রয়োজনে লাগিবে না, তাহাই তো প্রকারান্তরে জানাইলেন। মা'র জন্য ব্যস্ত হইতে বারণ করিলেন। তবে কি মা আমার ভাল হইবেন? দেখা যা'ক এসব কথা কতদূর ঠিক হয়। আমি দ্রুত-গতিতে বাড়ী পৌঁছিবামাত্রই শুনিলাম—সকালেই মেয়েটি মারা গিয়াছে আর মা'র অবস্থা এখন ভালর দিকে ফিরিয়াছে।

ঐ দেখ নন্দী ভৃঙ্গী। মনে করেছিলাম, ওরা কেউ নয়। পাগ্‌লার সঙ্গে ওরা যে এদিকে আস্‌ছে। চমকিত ভাবে দু'চার পা পশ্চাতে সরিয়া, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, করজোড়ে কম্পিত কলেবরে, নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—জয় মা! জয় মা! সকলে দেখ, আমার মা এসেছেন। ধন্য মা, ধন্য মা! আহা, কত যোগী, কত ঋষি মা'র চারদিকে নাচ্‌ছেন! ঐ দেখ, শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠাদি; আরও কত!—নাম জানি না। আহা, বাড়ীর সাম্‌নে সবটা যে ভরে গেল! এঁরা কত আনন্দ কর্‌ছেন! আমার মাকে নিয়ে আনন্দ কর্‌ছেন। আহা, ওখানে সকলেই ত আছেন;—আমার পরিচিত কত লোকও যে আছেন। বাঃ, আবার তামাসা দেখ—মা'ও যে আমার সকলের সঙ্গে নাচ্‌ছেন! ঐ দেখ, মা আমাকে ডাক্‌ছেন।—এই বলিয়া, খুব বড় বড় লম্ফ দিতে লাগিলেন। পরে মাটিতে পড়িয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দর্ দর্ ধারে অবিশ্রান্ত চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্ববৎ খল্ খল্ শব্দে উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত লোক অবাক্, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এগারটাপর্য্যন্ত গোঁসাইয়ের সমাধিভঙ্গ হইল না দেখিয়া, ধীরে ধীরে সকলে ক্রমে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিবার কয়েক ঘণ্টা চিত্তটি বেশ সরস ও প্রফুল্ল রহিল; পরে ধীরে ধীরে মনের ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত হইল। মনে হইল—'গোঁসাই এসব কি করিতেছেন? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রধান আচার্য্য হইয়া অনায়াসে ব্রাহ্ম-মন্দিরে দাঁড়াইয়া পৌত্তলিকতা প্রচার করিতেছেন! নন্দী ভৃঙ্গী, বাল্মীকি নারদাদির দর্শন ও সময়ে সময়ে তাঁহাদের স্তব স্তুতি—এসব কি? শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিকটে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের সমাজে বসিয়া, তাঁহাদেরই সমক্ষে, এ সকল আবল্ তাবল্ বলা কি স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্য্য? এরূপ ব্যাপারে ব্রাহ্মেরাও কিছু বলিতেছেন না কেন?' আমি অত্যন্ত উত্তেজিত, অধীর হইয়া, নবকান্ত বাবু, রজনী বাবু-প্রভৃতির কাছে যাইয়া তখনই এসব কথা তুলিলাম। তাঁহারা বলিলেন—'মাঘোৎসব হয়ে যা'ক্, এসব নিয়ে এবার বিষম আন্দোলন হবে। এখন একটা গোলমাল না করাই ভাল'।

ভোজনকালে ভাববৈচিত্র্য।—অপূর্ব্ব উপাসনা।

১২ই মাঘ, রবিবার, ১২৯৩।

আহারান্তে বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। প্রচারকনিবাসে গিয়া আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের যোগ-পন্থা-বলম্বী বহুলোক, ফকিরচাঁদের কয়েকটি, এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেকে বসিয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আহার করিতে বসিয়াছিলেন। ডাল, ভাত, তরকারী ইত্যাদি আহারের সামগ্রী সকলেরই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেহই আহার করিতেছেন না;—সকলেই ভাবে মগ্ন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় একাকী গান করিতেছেন, আর নিজেই খোল বাজাইতেছেন। তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। সমানে দু'হাতে তালি খোলের উপরে পড়িতেছে, দৃষ্টি গোঁসাইয়েরই দিকে স্থির, উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন, আর মত্ত হইয়া লাফাইতেছেন; খোলে আজ এক অমৃতশব্দ বাহির হইতেছে, গানের তো কথাই নাই। বোধ হইতে লাগিল, যেন বহুখোল এক তালে বাজিতেছে, আর বহুলোক এক স্বরে গান করিতেছে। এপ্রকার চমৎকার ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছিলেন, দু'চার গ্রাস খাইতে না খাইতে, তাঁহারাও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। কাহারও ভাতের গ্রাস হাতেই রহিয়াছে; কেহ আবার পাতের উপরে পড়িয়া আছেন; মুখের ভাত মুখে রাখিয়া কেহ কেহ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন; আবার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইতেই কেহ কেহ সেই সব ডাল, ভাত, তরকারী স্বচ্ছন্দে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। কাহারও অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহিতেছে; কেহ বা কম্পিত কলেবরে পুনঃ পুনঃ চমকিয়া উঠিতেছেন। কোন কোন ব্যক্তির ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে; আবার কাহারও কাহারও মুখহইতে এক-একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। শিক্ষিত ব্রাহ্মদেরও এপ্রকার অসম্ভব ভাব দেখিয়া ভূতের কাণ্ড মনে হইতে লাগিল। উচ্ছিষ্ট থালা ও পাতার উপরে কেহ কেহ গড়াইতেছেন দেখিয়া, তাড়াতাড়ি থালা পাতা সমস্ত সরাইয়া ফেলিলাম। মহাভাবের তরঙ্গ আরও বাড়িয়া পড়িল। খোলের ধ্বনি ও গানের শব্দ আরও যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। পার্শ্ববর্ত্তী কোঠার ভিতরে মেয়েরাও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কান্না, চীৎকার, 'আহা' 'উহু' এবং প্রবল ফোঁসফোঁসানিতে এক অদ্ভুত ধ্বনির সৃষ্টি হইল। মুহুর্মুহুঃ প্রাণায়ামের শব্দে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আজ আর ভিতর বাহির নাই—সব একাকার। প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বসমক্ষে প্রাণায়ামের 'দম্' চলিতে লাগিল। বারেন্দা ও আঙ্গিনার লোকগুলিরও নানাপ্রকার অবস্থা। কাহারও বাহ্যজ্ঞান আছে

বলিয়া মনে হয় না। কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ বিকট চীৎকার করিতে-ছেন। আবার কতকগুলি লোক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন। গোস্বামী মহাশয় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ-প্রভৃতিও সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কুঞ্জ বাবুর ভিতরে অসামান্য শক্তি প্রবেশ করিল। তিনি, ভাবোন্মত্ত হইয়া উচ্চ লম্ফ দিতে দিতে, খোল বাজাইয়া গানই করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে খোলের বা গানের শব্দ কিছুই আর বুঝিতে পারিলাম না। একপ্রকার একটা অদ্ভুত, দিগ্‌দিগন্তর-ব্যাপী ধ্বনির প্রবল তুফান বহিতে লাগিল; এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহারই ঝাপ্‌টায় আমারও শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ভিতরে বাহিরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমিও আর কোন দিকে নজর করিবার অবসর পাইলাম না। এ ভাবে কত সময় চলিয়া গেল জানি না। কতক্ষণ পরে দেখি—বেলা শেষ হইয়াছে, গানও থামিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসনে বসিয়া আছেন; মাতালের মত শরীর ছাড়িয়া দিয়া, এক একবার দক্ষিণে বামে এবং সম্মুখে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন; সময়ে সময়ে চোখ মিলিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন। সমস্ত নিস্তব্ধ! গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—অতলস্পর্শ মহাসাগরে এক গণ্ডূষমাত্র জলে আজ গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ! এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা, এই মহাসাগরে যাঁরা একবার গিয়ে পড়েছেন, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কত নৃত্য কর্‌ছেন, কত আনন্দ কর্‌ছেন!—ইত্যাদি।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে ব্রাহ্মমন্দির ও উহার চতুর্দ্দিকের বারেন্দা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় যথাসময়ে প্রচারকনিবাস হইতে, ভাবে বিভোর হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে, ব্রাহ্মমন্দিরে বেদির উপরে যাইয়া বসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুমধুর স্বরে গান করিলেন। ‘উদ্বোধন’ আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বাবু আবার গান ধরিলেন। প্রার্থনার সময়ে গোস্বামী মহাশয় ভগবান্‌কে অতি কাতরভাবে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে সমস্তগুলি লোক যেন অসাড় হইয়া রহিল। মনে হইল যেন ভগবানের আবির্ভাবজনিত জীবন্ত ভাবে সমগ্র ব্রাহ্মমন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল! গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

মা, এসেছ? আহা, তোমার সঙ্গে কত লোক!—ঐ যে কত মুনি, কত ঋষি,

কত সাধু মহাত্মারা র'য়েছেন! মা, তোমার চারিদিকে কত আনন্দে এঁরা নৃত্য কর্‌ছেন! ওখানে আমার পরিচিতও তো কত লোক দেখ্‌ছি! মা, আমাকে ডাক্‌ছ কেন? আমি কি ওখানে যেতে পারি? তুমি দয়া ক'রে আমায় হাতে ধরে নিবে? আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই। আর, আমি যাবই বা কোথায়? ওখানে? না, তা কি হয়? কেন মা, আমায় ফাঁকি দিচ্ছ? আমার কি সাধ্য ওখানে যেতে পারি, ঐ স্থানে বস্‌তে পারি? মা, আমাকে ওখানে বস্‌তে দিবে, বার বারই বল্‌ছ কেন? আমি যে নিতান্ত পাপী। ঐ সব মুনি ঋষিদের সাম্‌নে আমি কি ক'রে ব'স্‌ব, মা?—এই প্রকার কতক্ষণ বলিয়া গোস্বামী মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গানের পরে গান হইতে লাগিল, গোস্বামী মহাশয়ের আর চৈতন্য হইল না। ক্রমে সমাজের কার্য্য বন্ধ হইল, একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় বেদির উপরে একই ভাবে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। কতরাত্রি পর্য্যন্ত এ ভাবে থাকিলেন, জানি না।

১২ই মাঘ, সোমবার।

এবার মাঘোৎসবে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছি। সমাজাঙ্গনে অগণ্য লোকসঙ্ঘের আর সমাবেশ হইতেছে না। সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীরাই গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে মনে করি, দশটি লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতেও আমরা গোঁসাইকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজের গর্ব্ব করি। কিন্তু আজকাল গোস্বামী মহাশয় যে কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সাকার কি নিরাকার কোন্ মতের যে পক্ষপাতী, ঠিক পরিষ্কার রূপে তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। প্রকাশ্য সভাতে তিনি একবার দাঁড়াইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিলে, এ সম্বন্ধে সকলেরই মনের খট্‌কা চুকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে, আমরা 'সাকার ও নিরাকার-উপাসনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গোস্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন বক্তৃতা করিতে রাজী হইলেন না। 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারিবেন না বলিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের কোন কথাই তিনি বলিতে রাজী নহেন। অবশেষে 'ব্রহ্মোপাসনা' সম্বন্ধে তাঁহার মত বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমরাও অবিলম্বে সহরের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দিলাম। অদ্যই সন্ধ্যার সময়ে বক্তৃতা হইবে।

অব্যক্ত বক্তৃতা।

অপরাহ্ণে সমাজে যাইয়া দেখি—মন্দিরে ও বারেন্দায় আর স্থান নাই। চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে অনেকে, বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, সমাজহইতে চলিয়া যাইতেছেন। রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জ্জার সুবিখ্যাত পাদরী বার্ণার্ড সাহেবও আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে গোস্বামী মহাশয় বক্তৃতাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলকে করজোড়ে অভিবাদন করিয়া এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন—

পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, সনক-সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন; শাস্ত্র-পুরাণ-বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদাদি, যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণন করিতে গিয়া, পার না পাইয়া 'অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছেন,—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অজ্ঞান আমি—আমার মুখে আজ আপনারা সেই মহান্ ব্রহ্মের কথা শুনিতে আসিয়াছেন। ইত্যাদি বলিতে বলিতে বালকের মত 'হাউ-হাউ' কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, কথা বলিতে গিয়া কান্নার বেগ চাপিতে পারিলেন না, পরে বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। এবারেও মহর্ষিগণের ধ্যানগম্য, পরাৎপর পরব্রহ্মের বিষয়ে দু'চার কথা বলিতেই কান্না আসিয়া পড়িল। এক একবার চেষ্টা করিয়া, বলিতে গিয়া, থামিয়া থামিয়া যাইতে লাগিলেন; পরে ভাবের অদম্য আবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে, উপবিষ্ট অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে সকলকে কহিতে লাগিলেন—আজ আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া ক'রে আমার মস্তকে পদাঘাত ক'রে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক অভিমানী—তাঁ'র কথা ব'ল্‌ব! আমি কি জানি? আমি ছাই! আমি ছাই! এই প্রকার বলিয়া, সেই অনাদি, অনন্ত একমাত্র অদ্বিতীয়, পুরাণ পুরুষের স্তবের কয়েক শ্লোক পড়িয়াই ভাবাবেশে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। অস্ফুট ভাষায় ভাবমগ্নাবস্থায় শুধু 'ত্বং হি' 'ত্বং হি' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন।

জনতাপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজ একেবারে নিস্তব্ধ। গোস্বামী মহাশয়ের ঐ 'ত্বং হি, ত্বং হি' বলার সঙ্গে সঙ্গে কি-যেন একটা হইয়া গেল। সকলেই গোস্বামী মহাশয়ের দিকে উল্লসিত প্রাণে

তাকাইয়া কতক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ ভাবে ৫।৭ মিনিট অতীত হইল। পরে চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের চৈতন্য হইল না। ধীরে ধীরে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। দলে দলে লোক সমাজ-পরিবেষ্টনীর স্থানে স্থানে একত্র হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া যে উপকার হইত, আজ গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপকার লাভ করিলাম। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ!

আসননমস্কারে কুসংস্কার।

২০শে মাঘ, মঙ্গলবার।

গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ ঘুরিয়া ঢাকায় ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম; শুনিলাম তিনি তখন শৌচে গিয়াছেন। আমি ঐ ঘরে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ও আসিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের শূন্য আসনটির সম্মুখে গিয়া কপাল ঠুকিয়া নমস্কার করিলেন। মনোরঞ্জন বাবুকে উৎসাহী ব্রাহ্ম বলিয়াই আমরা সকলে জানি। তাঁহাকে আজ এভাবে শূন্য আসনকে নমস্কার করিতে দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল। আমি, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি না আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম? ওখানে নমস্কার করিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হ'লে কি গোঁসাইকে নমস্কার করিতে নাই?'

আমি।—ওখানে গোঁসাই কোথায়? তিনি ত পায়খানায়।

মনোরঞ্জন বাবু।—"তা' হউক্। ওখানে আমি গোঁসাইকেই স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়াছি। এতে কোন দোষ হয়, আমি মনে করি না।"

আমি।—'এ কথা আপনি ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া বলিতে সাহস করেন? তা' হ'লে হিন্দুদের আর 'অন্ধ-বিশ্বাসী, কুসংস্কারী' বলেন কেন?' এ সকল কথা লইয়া মনোরঞ্জন বাবুর সহিত আমার তর্ক বাধিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয় শৌচ হইতে আসিয়া, পাশের ঘরে জলযোগ করিতে-ছিলেন। তিনি আমাদের এই সব কথা-কাটাকাটি শুনিয়া, স্বীয় শাশুড়ী (শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী) 'বুড়োঠাকরুণ'কে বলিলেন—'শূন্য আসনের সামনে আর কেহই নমস্কার না করেন, আপনি এদের জানায়ে দিবেন। এই নিয়ে আবার আলোচনা, অশান্তি হবে।' আমার আর ওখানে থাকিতে ভাল লাগিল না। নবকান্ত বাবুর বাসায় চলিয়া

আসিলাম। কয়েকটি ব্রাহ্মকে ওখানে পাইয়া, তাঁহাদের নিকটে ঝগড়ার বিবরণ জানাইলাম; এবং, আরও দশটা কথা তুলিয়া, প্রচারকনিবাসে যে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে তাহাও জানাইলাম। 'গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যোগধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিলেই ভাল ভাল লোকগুলিও বিগড়াইয়া যায়, তাঁদের এইরকম দুর্দ্দশা ঘটে'—এইরূপ বলিয়া তাঁহারা আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন—গোঁসাইয়ের পদত্যাগসঙ্কল্প।

মাঘ মাসের শেষপর্য্যন্ত।

এবার দেখিতেছি—সভা-সমিতি করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ, সাধন-ভজন-সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। "গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে তাঁহার দ্বারা আর প্রচারকের কার্য্য চলে না। নির্জ্জনপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যান ধারণা সমাধি ব্রাহ্মসমাজের কোন উপকারেই আসিতেছে না। উঁহাদ্বারা সমাজের আর উন্নতির আশা নাই। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যাহাই করুন না কেন, প্রকাশ্য ভাবেও যখন তিনি গুরুবাদ স্বীকার করিতেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত সমাজের নেতা হইয়াও যখন তিনি নিতান্ত অজ্ঞানের ন্যায় 'শাস্ত্র অভ্রান্ত' এই কুসংস্কারাপন্ন মতও প্রচার করিতেছেন, তখন তাঁহার দ্বারা এই সমাজের শ্রীবৃদ্ধির আশা কোথায়? অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিলে আর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক' নাম কেন? হিন্দু দেব দেবী, হিন্দুদের আচার-পদ্ধতি, এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া, এখন বরং তিনি সময়ে সময়ে ঐসকলের প্রশ্রয়ই দিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্টই হইতেছে।" এইরূপ অনেক কথা ব্রাহ্মদের ঘরে ঘরে, প্রকাশ্য সভাস্থলে, এবং বহুলপ্রচারিত ব্রাহ্ম-সংবাদপত্রসমূহে আলোচনা হইতেছে। প্রচারকের কার্য্য গোস্বামী মহাশয় না করেন, অধিকাংশ ব্রাহ্মরই এখন এইপ্রকার ইচ্ছা জন্মিয়াছে।

শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় নাকি প্রচারকপদ-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে, উদাসীনের মত, অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিয়া কাটাইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অনতিবিলম্বেই তিনি গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে চলিয়া যাইবেন।

বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা।

আজ রাত্রিতে সাধন-বৈঠকে যোগ দিব মনে করিয়া স্কুল ছুটির পরেই প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের আসনের ধারে একযোড়া খড়ম রহিয়াছে দেখিলাম। গোস্বামী মহাশয় তখন আসনে ছিলেন না। খড়ম যোড়া খুব বড় ও পুরাতন দেখিয়া, হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ খড়ম কার?' গোঁসাইয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন—'ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে দিয়াছেন।' আমি বলিলাম—'ব্রহ্মচারী আবার কে?' তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মচারীর কথা শুন নাই? সমাধির অবস্থায় গোঁসাই জান্‌তে পান যে বারদীতে একজন মহাপুরুষ গোপনে র'য়েছেন। গোঁসাই তার পর তাঁকে দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলেন। তাঁর বয়স এখন ১৫৬ বৎসর। ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, তিনি গোঁসাইয়ের পিতামহের খুড়া হন। পূর্ব্বপুরুষের চিহ্ন ব'লে তিনি এই খড়ম-যোড়া আর ঐ কম্বলখানা গোঁসাইকে দিয়েছেন।" ব্রহ্মচারীর বিষয় জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। সাধনবৈঠকে বসিয়া রাত্রে শিষ্যদের সঙ্গে প্রাণায়াম করিবার সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রায়ই গদগদভাবে 'জয় ব্রহ্মচারী! জয় রামকৃষ্ণপরমহংস! জয় মাতাজী! জয় পরমহংসজী! জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব'—এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। মহাপুরুষদের আবির্ভাবে তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরে আশ্চর্য্য ভাবোচ্ছ্বাস ও অলৌকিক অবস্থাদির বিকাস হইতে দেখি। এই ব্রহ্মচারীই কি সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে একজন? একজন ভজনশীল গুরুভ্রাতাকে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—'কিছুদিন হইল, সমাধির অবস্থায় গুরুদেব, বারদীতে একটি মহাপুরুষ আছেন জানিতে পান। সেই সময়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ও গোস্বামী মহাশয়ের বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদেরই কোন কোন গুরুভ্রাতাকে বলেন—'গোঁসাই একবার এসে আমাকে দর্শন দিবেন না? তিনি না এলে আমাকেই যেতে হবে। ভাল লোক বলিয়া শুনিয়াছি; কোনও বিশেষ সম্বন্ধও থাকিতে পারে। তা না হ'লে তাঁর দিকে প্রাণ এত টানে কেন?' গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের মুখে এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ের বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে আমি একান্ত উৎসুক রহিলাম।

ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল।

বারদী হইতে আসিয়া গোস্বামী মহাশয় এই গুপ্ত মহাপুরুষ ব্রহ্মচারীকে সর্ব্বসাধারণের

নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন। ঢাকা, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর-প্রভৃতি স্থান হইতে দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এখন ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে বারদী যাইতেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মচারীর নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যেসকল ঘটনা শুনিতেছি, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যদি কখনও তাঁহার দর্শন পাই, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার মুখেই তদীয় জীবনের অদ্ভুত বিবরণ সমস্ত শুনিয়া 'ডায়েরীতে' লিখিয়া রাখিব আকাঙ্ক্ষা রহিল।

দ্বারভাঙ্গায় গোঁসাইয়ের প্রাণসংশয় পীড়া।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

স্কুল ছুটি হইতেই বাড়ী আসিয়াছি। অনেকদিন গোস্বামী মহাশয়ের কোন খবর পাই নাই। গুরুভ্রাতাদের নিকটে যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। ঢাকা রওনা হইলাম। শঙ্করটোলায় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাসার বিপরীত দিকে আমার একটি বন্ধুর বাসায় আসিয়া উঠিলাম। ভোরবেলায় জানালা খুলিয়া বসিয়া আছি, প্রসন্নবাবুর বাসায় বহুলোকের গোলমাল শুনিতে পাইলাম। রাম মজুমদার মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন— 'আপনি গোঁসাইয়ের কোনও খবর রাখেন? তাঁর যে বিষম অসুখ'। কথাটা শুনামাত্র আমি ছুটিয়া ডাক্তারবাবুর বাসায় গেলাম। পৌঁছিয়া দেখি—অনেক গুরুভাইভগিনী সে বাসার নানাস্থানে দলে দলে গোঁসাইয়ের কথা বলিতেছেন, কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ব্যস্ত হইয়া রাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'দ্বারভাঙ্গাতে গোস্বামী মহাশয়ের ডবল নিউমোনিয়ায় দুইটি ফুসফুসই পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবস্থা খারাপ; গোঁসাইয়ের পরিবার, যোগজীবন, কুঞ্জ ঘোষ, প্রসন্নবাবু, ইঁহারা গত কল্যই দ্বারভাঙ্গায় গিয়াছেন। কাল সকালে আমরা এখান হইতে আরজেন্ট ('জরুরী') টেলিগ্রাম করিয়াও এখনপর্য্যন্ত সংবাদই পাইলাম না। কি হইয়াছে জানি না।' গোঁসাইয়ের অবস্থা শুনিয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল; 'হু হু' করিয়া কান্না আসিয়া পড়িল। বাসায় আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সাতটাহইতে বেলা প্রায় একটাপর্য্যন্ত অবিরাম কাঁদিয়া, ভগবানের চরণে ও গোঁসাইয়ের গুরু পরমহংসজীর নিকটে তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিলাম। প্রাণটা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সংসার অন্ধকার মনে হইল। গোঁসাইয়ের আরোগ্য সংবাদের জন্য দিনরাত ছট্‌ফট করিয়া কাটাইতে লাগিলাম।

আকাশপথে ব্রহ্মচারীর দ্বারভাঙ্গায় গমন।

দ্বারভাঙ্গায় এবার যেভাবে গোস্বামী মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন, সে এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত। শুক্রবার সকালে টেলিগ্রাম আসিল—"গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা খারাপ, ডবল নিউমোনিয়া হইয়া দুটি ফুস্‌ফুস্‌ই পচিয়া যাইতেছে; জীবনের আশা নাই।" 'তার' পাইয়া সেই দিনই গোঁসাইয়ের সমস্ত পরিবারসহ কয়েকজন গুরুভ্রাতা দ্বারভাঙ্গায় রওনা হইয়া গেলেন। এদিকে আমাদের গুরুভাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় এই-কুসংবাদ-শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বারদী চলিয়া গেলেন, এবং ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— "আমার গুরুদেবকে আপনি দয়া করিয়া রক্ষা করুন। আমার জীবনের অর্দ্ধাংশ লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিউন।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তিনি গেলেনই বা; আমি তো রয়েছি।" সরল গুরুগতপ্রাণ বক্সী মহাশয় বলিলেন, 'আমরা আপনাকে চাই না, তাঁকেই চাই।' তাঁর অকপট গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইলেন, পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সময় শেষ করে এসেছিস্। এখন আর কি হবে? আমি ত তাঁকে ঘরে দেখ্‌তে পেলাম না। হয় হয়ে গিয়েছে, অথবা তাঁর গুরু তাঁকে দেহ ছাড়িয়া থাকিবার শক্তি দিয়াছেন। আচ্ছা, তুই যা; মঙ্গলবারের মধ্যে যদি 'তার' আসে তবে বুঝ্‌বি ভয় নাই। চিন্তা করিস্ না। আমি সেখানে যাচ্ছি।" ইহার পর ব্রহ্মচারী মহাশয় আসনহইতে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"যত দিন ভিতরহইতে দরজা না খুলি, কেহ এ দরজায় ঘা দিও না বা ইহা খুলিতে চেষ্টা করিও না।" ব্রহ্মচারী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া ভিতরহইতে দরজা বন্ধ করিলেন।

সে দিন ঢাকাহইতেও পূর্ব্বোক্ত সকলে দ্বারভাঙ্গা যাইতেছিলেন। গোয়ালন্দের জাহাজে উঠিয়া সকলে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন, কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। অকস্মাৎ যোগজীবন, আকাশের দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছেন। আমাকে তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন—'আমিও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছি। তোরা আর ভাবিস্ না, কোনও ভয় নাই'।" বুড়োঠাকুরুণও দ্বারভাঙ্গায় দেখিতে পাইয়াছিলেন যে পাশের ঘরে ব্রহ্মচারী গোঁসাইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়া আছেন। মঙ্গলবারপর্য্যন্ত ঢাকার গুরুভ্রাতারা টেলিগ্রাম আফিসে ছুটাছুটি করিতেছিলেন; খবর আসিল গোস্বামী মহাশয় ভাল হইতেছেন।

গোঁসাইয়ের দ্বারভাঙ্গাপ্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি।

গত ফাল্গুনমাসহইতে আষাঢ়মাসপর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার এই সময়ের কোন বিবরণই আমার ডায়েরীতে রহিল না। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় তাঁহাদের ডায়েরীতে গোঁসাইয়ের এই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলি বিশদরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ সময়ে গোস্বামী মহাশয় কোথায় কি ভাবে ছিলেন, উঁহাদের ডায়েরীদৃষ্টে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এই স্থলে লিখিয়া যাইতেছি।

১০ই ফাল্গুন গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমে যাওয়ার অভিপ্রায়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় এক দিবস অপেক্ষা করিয়া পরদিন শ্যামনগরে উপস্থিত হইলেন। তথাহইতে নৌকাযোগে চুঁচুড়াতে পৌঁছিয়া, বুধবার শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন; মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আহা! সকলে বলে 'গোঁসাই পাগল হয়েছেন, পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করেন'; কিন্তু কই? আমি তো এঁকে ধূপ ধূনার সুগন্ধ-ধূমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় দেখ্‌ছি।"

এই সময়ে মহর্ষির নিকট একখানা চিঠি আসিয়া পড়িল। কোনও একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন, "আপনি নির্জ্জনে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম্ম সাধন করিলেন—কি লাভ করিলেন? এবং এই সম্বন্ধে আপনি কি উপদেশ দেন?" ইত্যাদি। মহর্ষি, পত্রখানার উত্তর দিতে, তাঁ'র অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন—"লিখে দাও এখন হতে * * * গোঁসাই যাহা বলেন, তাহা আমরই কথা।"

মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোস্বামী মহাশয় বর্দ্ধমানে গেলেন। তথায়, ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে সমাজের সেক্রেটারির বাসায় অবস্থান করিয়া, নিত্যই সংকীর্ত্তনে মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ, কলিকাতা এবং বহুদূরবর্ত্তি স্থানহইতেও আসিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। উদয়াস্ত গোঁসাইকে লইয়া সকলে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় একটি পলাশ বৃক্ষ দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। পরে উহার প্রতি পুষ্পে পুষ্পে ভগবতীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! আর

একদিন মহারাজার গোলাপবাগে যাইয়া গোলাপফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে তিনি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত-প্রভৃতিকে দীক্ষা প্রদান করিলেন; তৎপরে, শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া, দ্বারভাঙ্গার দিকে রওনা হইলেন।

চৈত্রমাসের মধ্যভাগে গোস্বামী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিলেন। কয়েক দিন পরেই তাঁর বুকের নিম্নভাগে এক প্রকার বেদনা আরম্ভ হইল। হোমিওপাথি চিকিৎসাতে 'নক্স বমিকা' সেবন করিয়া কয়েক দিন একটু ভাল রহিলেন। কিন্তু পরে আর তাহাতে কোন উপকারই হইল না। তখন সমস্তিপুরহইতে বিখ্যাত ডাক্তার নগেন্দ্র বাবুকে আনা হইল। এদিকে বাঁকিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তথাকার সুপ্রসিদ্ধ দুটি ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। চার জন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ডাক্তার প্রিয়বাবুও ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের চিকিৎসাতে গোঁসাইয়ের বেদনার কোন উপশমই হইল না; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তিও রহিত হইল। শয্যায় শয়ান অবস্থায় থাকিয়াই তিনি বাহ্য-প্রস্রাবাদি করিতে লাগিলেন। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়ার শোচনীয় পরিণামে, গোঁসাইয়ের জীবন বিষয়ে সকলে একেবারে নিরাশ হইলেন। পরে একদিন গোস্বামী মহাশয়ের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইলে, অকস্মাৎ তাঁহার গুরু মানস-সরোবরনিবাসী শ্রীযুক্ত পরমহংসজী কয়েকটি মহাপুরুষের সহিত সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়া, অলৌকিকশক্তিপ্রয়োগে গোস্বামী মহাশয়কে আরোগ্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয় সুস্থ হইয়া ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবসে, পরিবারবর্গ ও শিষ্যগণের সহিত, দেওঘরে রওনা হইলেন। রাস্তায় মোকামাঘাটে গাড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই সময়ে জ্ঞান বাবু টিকেট করিতে বুকিং আফিসে গেলেন—আসিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লিচু গাড়িতে রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"লিচু কোথা হইতে আসিল?" গোঁসাই বলিলেন—"দ্বারভাঙ্গায় থাক্‌তে লিচু খেতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, তাই পরমহংসজী দিয়ে গেলেন।" সকলেই খুব আশ্চর্য্য হইলেন। কে যে কখন লিচু দিয়া গেলেন উঁহারা কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ দিকে এখনও লিচু পাকে নাই। এইপ্রকার সুপক্ক লিচু কোথাহইতে সংগ্রহ হইল?

দেওঘরে পৌঁছিয়া গোঁসাই স্কুলগৃহে বাসা লইলেন। নানাস্থান বেড়াইয়া এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া, পরদিন সকালে আদর্শ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেই দিবস ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ধর্ম্মালাপে এতই আনন্দোচ্ছ্বাস হইল যে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা স্নান আহারের দিকে একবারও লক্ষ্য পড়িল না। দেওঘরহইতে গোঁসাই কলিকাতা আসিলেন। কলিকাতাহইতে জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে সকলকে লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় শিষ্যবর্গ সহিত শান্তিপুরের অনতিদূরে বাবলায় গিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পাট দর্শন করেন। স্থানটি অতি নির্জ্জন ও রমণীয়, তপস্যার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত। এই স্থানে গোস্বামী মহাশয় সকলকে বলিলেন—"দেবতার স্থানে যেয়ে বিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি স্থির ক'রে একাগ্রভাবে নাম করতে থাকলে, আসল দেবতার দর্শন লাভ হইতে পারে।" অদ্বৈত প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া গোঁসাই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় চুয়াডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কুমারখালি চলিয়া গেলেন। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই সকলে এক সঙ্গে ঢাকা পৌঁছিলেন। পরে, দু'চার দিন বিশ্রাম করিয়া, সকলকে লইয়া গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে বারদী যাত্রা করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, 'তোমাকে ত আমি, দ্বারভাঙ্গায় যাইয়া, ঘরে দেখিতে পাইলাম না।' গোঁসাই বলিলেন—'আমার গুরুদেব আমাকে দেহহইতে বাহির করিয়া নিয়া রাখিয়াছিলেন।' বারদীতে কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক এখন তিনি ঢাকায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকনিবাসে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাধিমুক্তির অদ্ভুত বিবরণ।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা আসিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৫॥টার সময়ে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে সমাজে গেলাম। গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীকে আজই প্রথম পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। প্রচারকনিবাসে আজ লোক ধরে না। গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। একটি কথাও বলিবার অবসর পাইলাম না। গোঁসাইয়ের চেহারা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শরীর অত্যন্ত কাতর। মাথায় চুল নাই—নেড়া। বর্ণ একেবারে কাল, দেহ অতিশয় দুর্ব্বল এবং শীর্ণ। হাত পা—এমন কি, মাথাটি পর্য্যন্ত—শুকাইয়া গিয়াছে। খুব চেনা লোকেরও গোঁসাইকে এখন দেখিলে ভ্রম হয়। তিনি স্থির অনিমেষ নয়নে শুদ্ধাসনে একভাবে বসিয়া আছেন। সাধন-ছাড়া আর কর্ম্ম নাই। কেহ কোনও প্রশ্ন করলেই

চমকিয়া উঠিতেছেন; অতি সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়াই আবার নিজের ভাবে মগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের আরোগ্যের বিষয় শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল। তাঁহার শিষ্যদের মুখে যেসকল অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ২।৪ দিন প্রচারক-নিবাসে যাতায়াত করিয়া পণ্ডিত মহাশয় শ্রীধর-প্রভৃতির মুখে গোঁসাইয়ের রোগারোগ্যের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিলাম; গোস্বামী মহাশয় নিজেও সময়ে সময়ে ওবিষয়ে যেপ্রকার পরিচয় দিলেন, তাহাতে ইহাঁদের কথার কোন অমিল পাইলাম না। যথাশ্রুত আশ্চর্য্য ঘটনাটি লিখিয়া রাখিতেছি।

গোস্বামী মহাশয়ের রোগ খুব সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়াইলে তাঁহার নিত্য-সঙ্গী শিষ্যগণ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া যথাসাধ্য গোঁসাইয়ের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। বহুচেষ্টাসত্ত্বেও, গোঁসাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ একেবারেই খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। সকলে তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিছানার দিকে তাকাইয়া এক একবার চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। উঁহারা দেখিতে পাইলেন চারিজন স্থূক্ষ্মদেহধারী—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক, কেহ পকশ্মশ্রু ও জটাধারী, কেহ শ্যামবর্ণ, কেহ বা তেজঃপূর্ণ গৌরকায় স্থূল ও দীর্ঘাকৃতি—প্রাচীন মহাপুরুষ গোঁসাইয়ের চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার অমনই লয় পাইয়া যাইতেছেন। উঁহারা কে, কেনই বা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইতেছেন—তাঁহাদের ভিতরে সেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশু বিপদাশঙ্কায় অতীব ভীত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কেহ কেহ উঁহাদের মধ্যে সুপরিচিত বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিয়া শুভাদৃষ্ট মনে করিয়া হৃষ্ট ও আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে, গোস্বামী মহাশয়ের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল; নাড়ীর আর স্পন্দন নাই। ডাক্তার বাবুরা আসিয়া, একবার দেখিয়া, বাহিরে যাইয়া বলিয়া গেলেন—"আর বিলম্ব নাই, এবার হ'য়ে এল"। তখন রাধাকৃষ্ণ বাবু, একতারা লইয়া, আকুল হইয়া একান্ত কাতর প্রাণে ভগবানের নাম গাইতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শরীর স্থির, অসাড় ছিল। জানি না কি প্রকারে, কি শক্তিসঞ্চারে তিনি দু'একবার মাথা নাড়া দিয়াই, অকস্মাৎ চকিতের মত লাফাইয়া উঠিলেন, এবং উচ্চ "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ কি! এ কি হইল, এ কি দেখিতেছি,

এ যে ভগবানের অসাধারণ কৃপা সাক্ষাৎ ভাবে অবতীর্ণ! গুরুগতপ্রাণ গোঁসাই-শিষ্যেরা, ভাবে দিশাহারা হইয়া, "জয় দয়াল ঠাকুর" "বোল হরিবোল" বলিয়া, ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের মহারবে চতুর্দ্দিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয়ের বিপৎ গণিয়া বহুলোক ছুটাছুটি করিয়া কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন অদ্ভুত ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়কে নৃত্য করিতে দেখিয়া এবং হুঙ্কারগর্জ্জনসংযোগে উচ্চ "হরিবোল" বলিতে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার বাবুরা সংকীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন, গোস্বামী মহাশয়কে উচ্চলম্ফপ্রদানপূর্ব্বক "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে কীর্ত্তন থামিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ও, মাটিতে পড়িয়া ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। তখন ডাক্তার বাবুরা বলিলেন—"মহাশয় আমাদের ডাক্তারীশাস্ত্র মিথ্যা। আমরা যে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—আজ আপনার জীবনলাভে তাহাই পরিষ্কার প্রমাণ হইল।"

গোস্বামী মহাশয় অতঃপর একবার সপরিবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানেও নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

২৩শে আষাঢ়।

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ।

২৬শে আষাঢ়, শনিবার।

আজ কাল সর্ব্বত্র গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া যে ভাবে আলোচনা হইতেছে তাহা আর আমাদের সহ্য হয় না। কোন প্রকারে গোস্বামী মহাশয়ের মুখ দিয়া প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার ও হিন্দুসমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দু'চারটি কথা পাইলে আমরা গোঁসাইকে আমাদেরই মত ব্রাহ্মমতাবলম্বী বলিয়া দশজনের মুখ বন্ধ করিতে পারি। কিন্তু তিনি ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথাই কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলেন না, এ এক বিষম মুস্কিলই হইয়াছে। আজ গোস্বামী মহাশয়কে "ধর্ম্ম ও নীতি" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হইল। শরীর অতিশয় কাতর হইলেও, তিনি ইহাতে রাজী হইলেন। অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময়ে তিনি ব্রাহ্ম-মন্দিরে আসিয়া সামান্য একখানা বেঞ্চের উপরে বসিয়া এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন। আমি নোট করিতে লাগিলাম, যথা—

আজকার বলিবার বিষয়—'ধর্ম্ম ও নীতি'। ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝিব? যেমন আগুনের ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, ধর্ম্মও

সেইরূপ মানবের স্বভাব। যাহা সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, শিশু বৃদ্ধ-প্রভৃতি সকলপ্রকার-অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যেই সাধারণভাবে আছে, তাহাই মানবের স্বাভাবিক গুণ। এই গুণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা। এই তিন গুণের উৎকর্ষসাধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই মানবের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সত্য বস্তু। যে সত্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষেরও মতবিরোধ নাই, যাহা সকলের পক্ষেই সত্য, তাহাই মানব-প্রকৃতির ভোগ্য স্বভাবের সত্য।

জগৎকে কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ আছে, আমি একজন আছি। এই তিনটি জ্ঞান সমস্ত মানবের স্বাভাবিক। ইহা কোথাও শিখিতে হয় না। সত্য কথা বলা উচিত, অন্যের প্রতি অত্যাচার করা অসঙ্গত, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ও স্বভাবের সত্য। যেখানে মনুষ্য আছে সেখানেই এ সকল সত্য; সত্যবোধ স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে আছে। মনের এ সকল সরল সত্যকে যে যে পরিমাণে বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান তার নিকটে সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইবে। সরল সত্যের অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মলাভ করা যায়। মানবের যথার্থ প্রকৃতি বা সরল সত্যই মানবের ধর্ম্ম। সন্তুষ্ট-চিত্ত না হইলে ধর্ম্ম কখনও লাভ হয় না। সরল ভাবে সত্য পালন করিলেই চিত্তে সন্তোষ লাভ হয়। অসত্য কার্য্য, অসত্য চিন্তা করিলে চিত্তে অসন্তোষ জন্মায়; সন্তুষ্টচিত্ত হইতে হইলে সর্ব্বদা সরল ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতে হয়।

সরল সত্যের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন তিনি প্রাণের স্বাভাবিক বৃত্তির অনুরোধেই করিবেন; কিছুরই অপেক্ষা রাখিবেন না; দশের দিকে, সমাজের দিকে, কারও উপকার বা অনিষ্টের দিকে—এমন কি, নিজেরও মঙ্গল অমঙ্গলের দিকে—দৃষ্টিশূন্য হইবেন; আপন কর্ত্তব্য আপন মনে করিয়া যাইবেন। তাঁর কার্য্য লোকদেখান হইবে না। কারও দিকে না তাকাইয়া, চন্দ্র সূর্য্যের মত, আপন

কাজ নীরবে করিয়া যাইবেন। এইরূপে কেহ চলিলে, চতুর্দ্দিকে লোকে তাঁর জীবন দেখিয়া জীবন পাইবে, ধন্য হইবে।

নীতি কি? যেসকল সরল সত্যের কথা বলা হইল—অর্থাৎ সত্যকথা বলা, কারও অপকার না করা, অশ্লীল ও অনিষ্টকর ব্যবহার হইতে বিরত থাকা, ইত্যাদি,—তাহাই সাধারণ নীতি। এই সাধারণ নীতি সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাকৃতিক ও মানবজাতির স্বাভাবিক নীতি—ইহা সকলেরই পালনীয়। ইহা-ভিন্ন, আরও অন্য প্রকারের নীতি আছে। তাহা দেশভেদে কালভেদে ও পাত্রভেদে কখনও আবশ্যক হয়, আবার কখনও বা হয়ও না। এই নীতি সকল স্থানে সমান নয়। এক দেশের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবলম্বন করিতে হয়, অন্য দেশের পক্ষে তাহা ঘোরতর পাপ বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। কোথাও লোকে মৎস্যমাংসাহার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, আর কোথাও বা জঘন্য পাপ বলিয়া বিষবৎ ত্যাগ করেন। কোন স্থানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে দূষিত জল বায়ু ও স্থান সংশোধনের জন্য, সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য, নূতন কতকগুলি নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়; কিন্তু ম্যালেরিয়া কমিয়া গেলেই আর সেই নীতি নিয়া কাজ করা প্রয়োজন হয় না; কালভেদে যে নীতির প্রয়োজন, কালেই আবার তাহা অনাবশ্যক বোধ হয়। ইহার সঙ্গে খুব কম লোকেরই সম্বন্ধ থাকে। হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের লোকের পক্ষে এই নীতি; কিন্তু আমেরিকাপ্রভৃতি বহু স্থানে এই নীতি অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং দেশভেদে নীতি এ দেশে আছে, অন্য দেশে নাই; কালভেদে নীতি আজ আছে, কাল নাই; আবার পাত্রভেদে নীতি আমার পক্ষে আছে, তোমার পক্ষে নাই। কিন্তু সহজ ধর্ম্মনীতি যাহা দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয় নাই, তাহা সর্ব্বত্র চিরকালই একভাবে আছে। তাহা আত্মার কল্যাণ সম্বন্ধে আত্মার উন্নতি বিষয়ে সকলের পক্ষেই সমান। কিন্তু অবস্থাভেদে মনুষ্যের সাধারণ নীতি ও কর্ত্তব্যের পার্থক্য থাকিবেই।

একটি আমগাছের পাঁচটি আম খাইয়া উহার আঁঠি দু' পাঁচ হাত অন্তর

অন্তর পুতিলেও তার বৃক্ষগুলি ঠিক একরূপ হয় না। আবার একই গাছের পাঁচটি আম সর্ব্বাংশে কখনও ঠিক একই প্রকার দেখা যায় না। স্বাদে, ওজনে, অবয়বে একটির সঙ্গে অন্যটির একটু প্রভেদ থাকিবেই। বীজের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে জলবায়ু উত্তাপাদি আকর্ষণ করিয়া ভিন্নপ্রকার হয়। সেই প্রকার একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাঁচটি সহোদর ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যের অধীন হয়। মানবশরীরে যে সব মাংসপেশী, যতখানা হাড়, শিরা, নাড়ী, অন্ত্র, অবয়বাদি থাকা আবশ্যক, তাহা প্রত্যেকের একমত থাকিলেও, রুচি, অনুভব ও কার্য্য ঠিক একপ্রকার দেখা যায় না। সেই-প্রকার কর্ত্তব্য ও মূল ধর্ম্ম নীতি যদিও সকলেরই এক তথাপি উহার আচরণ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য সমান নয়।

মানুষের কর্ত্তব্য সকলেরই এক না হইলেও দেশগত, সমাজগত, কালগত নীতি এবং যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয় তাহা, পরিষ্কার অন্যায় বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইব, তাহাই আমার ধর্ম্ম। মূল ধর্ম্ম-নীতি প্রতিপালন না করিলে যে-প্রকার অনিষ্ট হয়, অপরাধ হয়, দেশগত সমাজগত ও কালগত স্বীকৃত কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে চলিলেও ঠিক সেইপ্রকার পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে, সরল প্রাণে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহার তাহাই ধর্ম্ম, তাহার তাহাই অবশ্যপালনীয়।

শরীর অতিশয় কাতর বলিয়া গোঁসাই আর বেশী বলিতে পারিলেন না। গোঁসাইয়ের বক্তৃতা খুব ভালই লাগিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য-মত কিছুই তিনি বলিলেন না; এজন্য একটু দুঃখিতও হইলাম।

ত্রাটক সাধনের প্রণালী।

প্রতিদিন অপরাহ্নে যেমন ব্রাহ্মসমাজে গিয়া থাকি, আজও সেইপ্রকার গেলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে দেখিয়া বলিলেন—" সাধনের একটি নূতন অঙ্গ গোস্বামী মহাশয় আমাদরে ব'লে দিয়েছেন। তোমাকেও ব'লেছেন কি? না ব'লে থাক্‌লে, এখনই গিয়ে তুমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা কর।"

১লা শ্রাবণ।

আমি তৎক্ষণাৎ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। দেখি, সেখানে অন্য কেহ নাই। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন ? সাধন কিরূপ চল্‌ছে ?' আমি প্রাণায়াম করাকেই প্রধান সাধন ভাবিয়া রাখিয়াছি ; তাই বলিলাম—বাড়ীতে সাধন হয় নাই। এখন একরূপ চল্‌ছে।

গোঁসাই বলিলেন—'নাম কর তো ? নাম ক'রে কেমন বুঝ ?' আমি বলিলাম—"নাম ক'রে সময়ে সময়ে আনন্দ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভগবানের উপর নির্ভর করতেই ভাল লাগে।' গোঁসাই বলিলেন—'বেশ। অল্প বয়সে সাধন নিয়েছ, জীবনে খুব উন্নতি ক'রে যে'তে পার্‌বে। আমি দিন শেষ ক'রে সাধন পেয়েছি ; বুড়ো বয়সে এখন আর কি কর্‌ব ? তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ? লেখাপড়া ভাল চল্‌ছে তো ?'

গোঁসাইয়ের কথায় আমি 'হাঁ' মাত্র বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি নাকি কি এক নূতন সাধনের কথা ব'লে দিয়েছেন ? পণ্ডিত মহাশয় তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্‌লেন। আমিও কি তা কর্‌তে পারি ?

গোঁসাই বলিলেন—হাঁ তুমিও।

এই বলিয়াই চোখ্ বুজিলেন। আমি আবার সাহস করিয়া বলিলাম—'নিয়মাদি আমি তো কিছুই জানি না।' গোঁসাই মাথা তুলিয়া আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের কাছথেকেই জেনে নেও গিয়ে।" এই বলিয়া আবার চোখ্ বুজিলেন। আমিও অমনি পণ্ডিত মহাশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশানুরূপ যোগ ক্রিয়ার 'ত্রাটক সাধনের' বিষয়টি বলিয়া দিলেন।

অবসরমত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে এই সাধনের অনুষ্ঠানপ্রণালীগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইলাম। ক্রম-অনুসারে পঞ্চভূতেই এই সাধন করিতে হয়। প্রথম অভ্যাস ক্ষিতিতে ; তাহার প্রণালী বলিয়া দিলেন। সবুজবর্ণ ক্ষিতিজ সম্মুখে রাখিয়া, অনিমেষে উহার স্থানবিশেষে চেষ্টাদ্বারা দৃষ্টি একাগ্র করিতে হয়। গুরুর সঙ্কেত অনুসারে, ভিতরে ও বাহিরে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানে মনঃসমাবেশপূর্ব্বক গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র সাধন করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা অবিকারে, বিনা অশ্রুপাতে, অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল স্থির একাসনে উপবিষ্ট থাকা অভ্যস্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যভূতে সাধন করিতে হয়। সমস্ত ভূতেরই সাধনকালে দর্শনের বিচিত্র অবস্থা গুরুকে জ্ঞাত করিয়া, তাঁহার আদেশমত উপযোগী ক্রম-কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। সঙ্কেত জানিয়া আমিও 'অনিমেষ সাধন' আরম্ভ করিলাম।

গোঁসাইয়ের বক্তৃতা দানে অসম্মতি।

৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

অনেক কাল যাবৎ ব্রাহ্মসমাজে আমার যাতায়াত খুব বেশী; ব্রাহ্ম-পরিবারেও আমার আনাগোনা অতিরিক্ত; উৎসবাদি ব্যাপারেও আমার দৌড়দৌড়ি, লাফালাফি সকলের উপরে;—এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেই আমাকে খুব একজন উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তারা, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যোগধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাঁহার ব্রাহ্মমত-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানাদির খোঁজখবর আমার নিকট হইতেই লইতে চেষ্টা করেন। আমিও অনেক কথা বলিয়া থাকি। আজ, রজনী বাবু-প্রভৃতির কথামত, কয়েকটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আগামী কল্য শনিবার সন্ধ্যার সময় আপনি "অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, সাধারণ ব্রাহ্মেরা এই অনুরোধ আপনাকে জানাইতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—"এর বিরুদ্ধে আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ব না। আমি যা' ব'ল্‌ব গ্রহীতব্য, ব্রাহ্মসমাজ ব'ল্‌বেন তাহা পরিত্যাজ্য। বক্তৃতা কিরূপে হবে?" আমরাও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তাদের নিকটে যাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথা জানাইলাম। এই কথা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় আর বেশী দিন বেদির কার্য্য করিতে পারিবেন না, অনেকেই এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন।

সাধু-অবজ্ঞার সাজা।

৯ই শ্রাবণ।

এবারে দ্বারভাঙ্গাহইতে প্রত্যাগমনের পর নানা শ্রেণীর সাধক ও নানা ভাবের লোকেরা প্রায় সর্ব্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিতেছেন। মণিপুরের ভীষণ অরণ্যে ও পুরান রমণার নিবিড় জঙ্গলে ভাঙ্গা মস্‌জিদের মধ্যে লোকালয়-ত্যাগী যে সব প্রাচীন মুসলমান ফকিরেরা আছেন, তাঁহারাও কেহ কেহ সময়ে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতেছেন। হিন্দু জটাধারী সন্ন্যাসীরাও নির্জ্জনে ও গোপনে আসিয়া গোঁসাইয়ের সঙ্গ করিয়া যাইতেছেন। আজ অপরাহ্ণে সমাজে যাইয়া শুনিলাম, একটি জটিল উদাসী সাধু, বহুক্ষণ হয়, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন। গোঁসাই তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছেন। গোঁসাইয়ের শিষ্যেরা নাকি তাঁহাকে প্রচারক-নিবাসেই গঞ্জিকাসেবনের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন; এবং তিনিও স্বেচ্ছামত, গাঁজায় দম মারিতেছেন।

সন্ন্যাসীটি দেখিতে বেশ তেজস্বী, ভজনানন্দী ও সৌম্যমূর্ত্তি। তাঁহার এ কার্য্যে বাধা দিতে কেহই সাহস করেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ও দেখিয়া শুনিয়া এ গর্হিত কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। সমাজগৃহে বসিয়া ব্রাহ্মেরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

শুনিয়া আমার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। আমি সকলকে বলিলাম—"আপনারা অপেক্ষা করুন। ঐ গাঁজিয়ালটাকে একটিবার গাঁজা খাইতে দেখিলে, এখনই আমি উহাকে সমাজ 'কম্পাউণ্ড' হইতে চলিয়া যাইতে বলিব।" এই বলিয়া, খুব দম্ভের সহিত যেমন চলিলাম, অকস্মাৎ শূন্যস্থানে সিঁড়ি-অনুমানে পা ফেলিয়া, 'দড়াম্' করিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। পায়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রায় একঘণ্টাকাল একই স্থানে থাকিয়া, যন্ত্রণায় 'আহা উহু' করিয়া কাটাইলাম। একটু অন্ধকার হইলে, আমার একটি বন্ধু কোলে করিয়া আমাকে বাসায় পঁহুছাইয়া দিল। দু' তিন দিন চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া রহিলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে শুনিলাম—ঐ সন্ন্যাসী একজন উচ্চ দরের মহাত্মা, পরিচয় অজ্ঞাত। লোকালয়ের বহু সৌভাগ্যেই নাকি ঐপ্রকার সিদ্ধ পুরুষদের সেখানে আগমন হইয়া থাকে!

গোপনে প্রাণায়াম এবং উচ্ছিষ্টের আপত্তিতে উপদেশ।

১৮ই শ্রাবণ।

গুরুভ্রাতাদের অনেকেই মনে করেন, সাধনের ভিতরের অনেক বিষয় আমি ব্রাহ্মসমাজের লোকদের কাছে বলিয়া দিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমার অতিরিক্ত তর্ক ও প্রকাশ্য আলোচনাসভাতে সাধন সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি করাই তাঁহাদের এইপ্রকার সংশয়ের হেতু। আজ গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"প্রাণায়াম লোকের নিকট ক'র না। লোকে ওসব নিয়ে তোমাকে ঠাট্টা উপহাস করবে, ক্ষেপাবে। আর এসব যত গোপনে হয় ততই উপকার।"

গোঁসাইকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের নাকি উচ্ছিষ্ট খেতে নাই? ভুক্তাবশিষ্টই তো উচ্ছিষ্ট? তবে, অন্যের সঙ্গে একপাত্রে ব'সেতো খেতে পার্‌বো?

গোঁসাই বলিলেন—না, তাও নিষেধ আছে।

আমি। আমাদের পাড়ায় আমার একটি বন্ধু আছে—ভুবন *। সে ব্রাহ্ম হ'য়েছে। শিশুকালথেকে তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয়। আমার কোনও অসুখ হ'লে বহুদূরে

* ভুবন—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (Mr. B. M. Chatterji, Bar-at-Law.) ব্যারিষ্টার।

থেকেও সে তা টের পায়—অস্থির হ'য়ে পড়ে। তারও তেমন কিছু আপৎ বিপৎ ঘট্‌লে আমি প্রাণে তা অনুভব করি। শিশুকালথেকে এক থালাতে আমরা আহার ক'রে আস্‌ছি। এখন কি আমি আর তার সঙ্গেও এক পাত্রে আহার করতে পার্‌ব না?" গোঁসাই একটু হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, হাঁ, শুধু তার সঙ্গে পার্‌বে। তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। তোমাদের পরস্পরে যে সদ্ভাব, তা'তে উচ্ছিষ্টে কোনও দোষ তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে না।"

কুম্ভক।

৩০শে শ্রাবণ, রবিবার।

কয়েক দিন যাবৎ গোস্বামী মহাশয় পীড়িত। কারও সঙ্গেই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদির কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে বলিলেন—"সাধনের আর একটি নূতন অঙ্গ অবলম্বন করিতে আদেশ হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় উহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি একপ্রকার অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহাকে কুম্ভক বলে। প্রত্যহ সাধনের সময়ে প্রথমে ও শেষে তিনবার করিয়া এই কুম্ভক করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে নাক টিপিয়া বাহিরের বায়ু টানিয়া লইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক যে প্রণালীতে কুম্ভক করেন দেখিয়াছি, এই কুম্ভক সে-প্রকার কিছুই নয়। আমাদের গুরুপ্রদত্ত প্রণালী মত প্রাণায়ামদ্বারা কৌশলপূর্ব্বক শুধু প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া উহা একেবারে মূলেতে নিয়া স্থাপন করিতে হইবে। পরে ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ও সাধারণ বায়ুর অন্তর্গতি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়া, নামে চিত্তসংযোগ পূর্ব্বক, দৃঢ়তার সহিত উহা সাধ্যমত ধারণ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত স্মৃতি—এমন কি, দেহের সংস্কারপর্য্যন্ত—ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তখন নামের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হইতে থাকে। কতকটা তাহার আভাস পাইলাম। শুনিলাম, এই প্রাণায়াম সংযোগে কুম্ভকের বিষয়মাত্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় সংক্ষেপে উক্ত আছে। সাধারণ্যে ইহার প্রচার নাই। ইহা "গুরুমুখী"। এজন্য আমিও ইহা সঙ্কেতেই উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল।

আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল (শোভাযাত্রা)। কত দেশের কত লোক আজ এই মিছিল দেখিতে ঢাকাতে আসিয়াছে। সহর আজ লোকের ভিড়ে তোলপাড়। স্কুল, কলেজ এবং আদালতাদি প্রতি বৎসরেই এই মিছিলের জন্য ছুটি হয়। নবাবপুর একদিন ও ইস্‌লামপুর একদিন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া এই মিছিল বাহির করে। লুটপাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নানাপ্রকার উৎপাত উপদ্রবের শান্তি বিধানার্থ প্রতি বৎসরই গভর্ণমেন্ট এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে পুলিশের সুব্যবস্থা করেন।

এ বৎসরেও প্রতি বৎসরের ন্যায় অপরাহ্নে তিনটার সময়ে এই মিছিল বাহির হইল। প্রশস্ত পথ ধরিয়া আণ্টাঘরের ময়দান, বাঙ্গালাবাজার, পাটুয়াটুলি, প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অদ্যকার মিছিল চলিতে লাগিল। উল্লসিত নবাবপুরবাসীদের সমবেত চেষ্টা ও দক্ষতায় মিছিলটি আজ এত দীর্ঘ হইল যে প্রায় ৩ মাইল রাস্তা মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া একদিক শেষ না হইতেই উহা খালপাড় ধরিয়া আরম্ভ স্থলে আসিয়া উপনীত হইল। ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

সর্ব্বাগ্রে একদল মল্ল খেলোয়াড় দুই তিন দল দেশী বাজনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডন কুস্তি ও লাঠি খেলার বিবিধ প্রকার কৌশল দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইল। তৎসঙ্গে গোপেরা নন্দোৎসব করিতে করিতে চলিল। নানা রঙ্গের উচ্চ নিশান ও বিবিধ প্রকার মূল্যবান আসাসোটা লইয়া বহুলোক উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। পরে বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায়—বহুমূল্য, সুবর্ণখচিত, বিবিধকারুকার্য্য-রচিত বিচিত্র বর্ণের মখ্‌মলের চাদর (ঝুল) দ্বারা সজ্জিত হইয়া—ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। উহারা ললাটোপরি উজ্জ্বল ও বৃহৎ সুবর্ণ ও রৌপ্যের ঢাল লইয়া, যখন সগর্ব্বে মস্তক হেলাইয়া দোলাইয়া, ইংরাজী বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে চলিতে লাগিল, তখন দর্শকমণ্ডলীর চিত্তও কৌতুকোল্লাসে নাচিয়া উঠিল। হস্তিসজ্জা শেষ হইলে, তৎপশ্চাতে বহুসংখ্যক অশ্বও, ঐরূপ শোভন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া চলিল। ইহার পর ঢাকার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ 'চৌকী' সমূহ একে একে বাহির হইতে লাগিল। উহাতে রাং ও অভ্র দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ ও রৌপ্যপ্রতিম ঝল্‌মলায়মান, নানা আয়তনের মন্দির, মঠ, নৌকা ও অট্টালিকার মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক পৌরাণিক ও অন্যবিধ ঘটনার দৃশ্যসমূহ পরিদৃষ্ট হইল। কোথাও কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের অত্যাচারে

ভীমের আস্ফালন, যুধিষ্ঠিরের অমানুষিক ধৈর্য্য, এবং অসহায়া বিপন্না শরণাগতা দ্রৌপদীর ভগবৎকৃপাবলে বস্ত্রলাভ; কোথাও পিতৃ-সত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে পুনরায় রাজ্যে আনিতে ভরতের আকুল রোদন ও প্রার্থনা; কোনটিতে জনমেজয়ের সর্পসত্র, তাহাতে জ্বলন্ত হুতাশনে ঋষিদের সর্পাহুতি; কোনটিতে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের পুরাণশ্রবণ—এই প্রকার বহু পৌরাণিক দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে 'চৌকি' সকল একটির পরে একটি শৃঙ্খলামত যাইতে লাগিল। এই সকল 'চৌকির' অগ্র পশ্চাতে হরিসংকীর্ত্তন বাউল বৈষ্ণবের সঙ্গীত, মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিও চলিতে লাগিল। অতঃপর নানা প্রকারের স্থানীয় ব্যঙ্গ-চিত্রাদি প্রদর্শিত হইল। ইহাতে 'মিছিলের' এক দল প্রতিপক্ষ অপর দলের গৃহচ্ছিদ্র ও দুরাচার বা দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় সকল চিত্রসাহায্যে জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ বা প্রচার করিতে সঙ্কোচ করে না। এইসমস্ত শেষ হইয়া গেলে পর, আবার খুব বড় বড় 'চৌকি' বাহির হইতে আরম্ভ হয়। কি কৌশলে, কিরূপ আশ্চর্য্য হিসাবে উহারা এই সকল বড় 'চৌকি' তৈয়ার করে, ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ২০।২৫ ফুট চতুষ্কোণ কাঠের 'মাচাং' প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপরে প্রায় ৪০।৫০ ফুট উচ্চ, তেতালা চৌতালা মন্দিরের মত কোঠার কাঠাম বাঁধিয়া রাখা হয়। মিছিল বাহির হওয়ার দু'তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থানহইতে লোকেরা শত শত ভিন্ন ভিন্ন বাঁশের 'টাট্টি' আনিয়া উপস্থিত করে। সকল 'টাট্টির' বাহিরের দিক অতিসুন্দর বিচিত্র কাগজের দ্বারা আবৃত থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐগুলি যখন 'মাচাংএ' একটির পর একটি সংযুক্ত হয়, তখন সেগুলি ঠিক 'থাপে থাপে' লাগিয়া যায়—কোন স্থানের মাচাং বা টাট্টি দুই তিন ইঞ্চিও ছোট বড় বা বেসমান হয় না। এই ভাবে 'চৌকিতে' ক্রমে ৫০।৬০ বা ততোধিক 'টাট্টি' সংযুক্ত হইলে, শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বহু কারুকার্য্য-খচিত, অতি অপূর্ব্ব ও নিখুঁত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির, মঠ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি প্রস্তুত ও প্রাচীন কোনও কীর্ত্তি প্রদর্শিত হইল দেখা যায়। এই প্রকারের 'চৌকি' পাঁচ ছয়খানার অধিক হয় না। 'মিছিল' শেষ হইয়া গেলে, প্রায় প্রতি বৎসরেই এই সব 'চৌকি' ফটো তোলার জন্য, কোন কোন প্রশস্ত রাজপথে কিংবা আণ্টাঘরের ময়দানে কি খালের ধারে কয়েকদিন রক্ষা করা হয়। সন্ধ্যার পর সুন্দর 'রোষনাই' হয়।

রাত্রে, লোকের গোলমাল কমিলে পর, জন্মাষ্টমী মিছিলের বড় চৌকী দেখিতে

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বাহির হইলাম। গজ-কচ্ছপ লইয়া গরুড় শূন্যমার্গে উড়িয়া গিয়া একটি বৃক্ষের ডালে বসিতে চেষ্টা করিতেছে, এই দৃশ্যটি এত সুন্দর কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে, গোস্বামী মহাশয় প্রায় বিশ মিনিটকাল উহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কনষ্ট্যান্টিনপলের দুর্গও অতি অদ্ভুত হইয়াছে। এই সব দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"ঢাকার জন্মাস্টমীর মিছিলের মত মিছিল, এমন অদ্ভুত কারুকার্য্য, বর্ত্তমানে আর কুত্রাপি নাই। শান্তিপুরের রাস, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল খুব দেখবার জিনিষ, দেশের একটা গৌরব।"

বড় চৌকী দেখার পর গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সমাজে গেলাম। আজ একটু অধিক রাত্রিতে সাধনে যোগ দিয়া, রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে বাসায় আসিলাম।

আশ্চর্য্য ফকির।

বিকালবেলা প্রচারক-নিবাসে যাইয়া দেখি, লোকে ঘর পরিপূর্ণ; একটি ফকির গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া আছেন। ফকির সাহেবের বেশ-ভূষা কিছুই নাই, 'নেংটি' মাত্র পরিধান, কাল একখানা জীর্ণ কম্বল গায়ে জড়ান। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে 'ঠারে ঠোরে' কি সব আলাপ করিতেছেন। উঁহাদের সে ফকিরি ভাষা ও ভাবের কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না। সমাজের আঙ্গিনায় ও এদিকে সেদিকে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ফকিরটি খুব উন্নত অবস্থার লোক"। মনে হইল, 'এ মন্দ নয়! অর্থশূন্য কতকগুলি শব্দের 'এলো মেলো' যোজনা করিলেই তাহা ভাবের কথা হইল, আর, মুসলমান হইয়া গুরুতত্ত্বের কথা পাড়িলেই তিনি একজন মহাত্মা হইলেন! সে যাহা হউক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমি ফকির সাহেবের কোন বিশেষত্ব পাই কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ঘরে সামান্য একটি 'মিট্‌মিটে' আলো জ্বলিতেছিল। ফকির সাহেব কয়েকবার আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়াই আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলাম। ঠিক যেন দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকারে চক্ষের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়, ইহা কখনও ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। লোকের ভিড় দেখিয়া, ফকিরসাহেব গোস্বামী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন। আমি তাঁহার পিছু লইলাম। ফকির সাহেব রাস্তায় হাঁটিয়া চলেন না; অতি-দ্রুত লম্বা লম্বা পদবিক্ষেপ-পূর্ব্বক বক্রগতিতে লাফাইতে লাফাইতে

প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া ছুটিলেন। পাটুয়াটুলির কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতিকষ্টে চলিয়া, ফিরিয়া আসিলাম। তিনি কোন্ দিক দিয়া যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন, ঠিক করিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন।
ব্রাহ্মগণের আন্দোলন।

গোস্বামী মহাশয় আজকাল যে ভাবে বেদির কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে সকলেই খুব সন্তুষ্ট; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ গোঁসাইয়ের এরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবের উপদেশ ও বক্তৃতাতে বিরক্ত। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, গোঁসাই তাঁহাদেরই ভাব ও ইচ্ছামত উপদেশ ও বক্তৃতাদি দেন। বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিবার সময়ে অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশয় শাস্ত্রাদির কথা বলেন; পুরাণের এক একটি আখ্যায়িকা লইয়া তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। পুরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গোস্বামী মহাশয়ই প্রথম আরম্ভ করিলেন; শুনিতেছি, ইতিপূর্ব্বে এভাবের ব্যাখ্যা নাকি আর কখনও হয় নাই। এইপ্রকার রূপক ব্যাখ্যা শুনিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন অনেকেই মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রপুরাণাদিপ্রচলনের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের ইহা একটি পাকা চাল।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিত্যই সন্ধ্যার সময়ে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। শনি ও রবিবারে প্রচারক-নিবাসের সম্মুখস্থ আঙ্গিনাতেই অধিকক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হয়; কখনও বা সমাজের সম্মুখের উঠানেও হইয়া থাকে। এই কীর্ত্তনে বিস্তর লোকের সমাবেশ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যদের ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যান। সঙ্কীর্ত্তনের রব ও খোলের ধ্বনি শুনিলেই গোঁসাই যেন কিরকম হইয়া পড়েন। উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে জ্ঞানশূন্য হন, কখনও একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। গোঁসাইয়ের এইরূপ মত্ততায় বহুলোকের ভাব জাগাইয়া দেয়। সাধারণতঃ গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্যদের মধ্যেই মাতামাতির ভাবটা বেশী দেখা যায়। আমরাও অনেকে ভাব করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু খাঁটি ভাব হয় না; 'মেহনৎ' মাত্রই সার; এজন্য মনে বড়ই দুঃখ হয়।

আজ প্রচারক-নিবাসের আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তনে মহাহুলস্থূল ব্যাপার। আনন্দকোলাহলে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন পরিপূর্ণ। অনেকেই আজ ভাবাবেশে 'ডগ মগ'। চারিদিকে

অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন শুনিতেছেন। শ্রীধর বাবু মাতিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরবাবুর নৃত্য দেখিয়া মনে হইল যেন একটি পুতুল নাচিতেছে। বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়াও, এমন শৃঙ্খলার সহিত নৃত্য করা বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবে ভিন্ন হয় না। শ্রীধর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে খুব উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা হোআকবর" "আল্লা হোআকবর" বলিতে বলিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আমাদের কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম শ্রীধরের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া, 'ভাইরে' 'ভাইরে' বলিয়া শ্রীধরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের চক্ষের পলক নাই। অকস্মাৎ, উচ্চলম্ফ সহকারে, শূন্য আকাশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐ দেখ্ কালী, ঐ দেখ্ কালী"। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মটি শ্রীধরকে জড়াইয়া বড়ই আনন্দ করিতেছিলেন; কিন্তু ঐ কালী শব্দটি যেমনই শুনিলেন, অমনি শ্রীধরকে ধাক্কা দিয়া আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিলেন—"দূর শালা! বল্ পরব্রহ্ম, বল্ পরব্রহ্ম"। তিনি "বল্ পরব্রহ্ম, বল্ পরব্রহ্ম" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীধর "জয় কালী! জয় কালী!" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সঙ্কীর্ত্তনান্তে কতিপয় ব্রাহ্ম এই বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"গোঁসাই হরিনাম ব্রাহ্মসমাজে চালাইয়াছেন, তাঁর শিষ্যেরা এখন কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামও চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এ অতি ভয়ানক! প্রতিবাদ হওয়া উচিত। উনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম। ভাবের সময়ে কালী নাম শুনাতে উঁহার বিবেকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে; তাই হঠাৎ "শালা" বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে কখনও উঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।"

গোস্বামী মহাশয়ের দৈনন্দিন আচরণ ও সাধনের "বৈঠক"।

প্রত্যহ প্রাতে প্রায় সাতটার সময়ে গোস্বামী মহাশয় চা খাইয়া থাকেন। চা খাওয়ার পরে আসনে বসিয়া অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ প্রাঙ্গণস্থ শেফালিকা গাছের দিকে চাহিয়া থাকেন। একটু বেলা হইলে পাঠ আরম্ভ হয়। প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ চলে।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে 'আনন্দ মাষ্টারের বাগানে' যান। সেখানে পূর্ব্বপ্রান্তে একটি পুরান আমগাছের তলে সাধনে তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন।

বিকালে আবার সমাজে আসেন। চারিটার পর প্রত্যহই প্রচারক-নিবাসে বহুলোকের সমাগম হয়। কেদার বাবু (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুগত ভক্ত) ও আশানন্দ বাউল প্রত্যহই আসেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অপর অনেকে এই সময়ে উপস্থিত হন। বিকাল বেলা বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর নিত্যই সঙ্গীত হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময়ে প্রায় এক ঘণ্টা সংকীর্ত্তন হয়। তৎপরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। তখন কেবলমাত্র সাধনের লোকেরাই ঘরের ভিতরে থাকিতে পারেন। রাত্রি প্রায় ৯॥টা ১০টা পর্য্যন্ত সাধন চলে। সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে মাত্রা ও ক্রম এক রাখিয়া একঘণ্টা কাল প্রাণায়াম করেন। পরে একটি বা দুইটি গান হয়। এই গানের পরে আবার একঘণ্টা পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম চলে। মহিলারাও পার্শ্বের ঘরে সকলে একসঙ্গে বসিয়া প্রাণায়াম করেন। 'বৈঠকে' সাধনের কালে পৃথক পৃথক আসনের কোনও নিয়ম বা বন্দোবস্ত নাই। সাধন করিতে করিতে এই সময়ে অনেকের ভিতরে পারলৌকিক আত্মারা আসিয়া পড়েন। কাহারও ভাবাবেশে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়; কেহ কেহ বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন; আবার, কোন কোন সাধকের ভীষণ অট্টহাসি আরম্ভ হয়। এই সময়ে বিবিধ প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসে বিবিধ প্রকার অবস্থা অনেকের ভিতরে ঘটিতে থাকে। গোস্বামী মহাশয় ক্রমে এসব উদ্দাম উচ্ছ্বাসের বেগ সংবরণ করেন। তিনি এই সাধন-বৈঠকে কখনও কখনও ভাবাবেশে অনেক কথা বলেন; দেবদেবী, মুনিঋষি ও মহাত্মাদের প্রকাশ দেখিয়া স্তবস্তুতি করেন। যাঁহারা বৈঠকে যোগ দেন—অনেকেই কিছু না কিছু দর্শন পান। এক দৃশ্যই যে সকলে দেখেন, এমন নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী, ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বা রূপ—এক এক জনে এক এক রকম দর্শন করেন। আমার কিন্তু ফোঁস—ফোঁস মাত্রই সার—কিছুই দর্শন হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় সাধনকালে প্রায়ই উপস্থিত হন। গোস্বামী মহাশয় আরও যেসকল মহাত্মাদের নাম করেন তাঁহাদের কাহাকেও আমি জানি না। সূক্ষ্ম শরীরে সমাগত মহাপুরুষদের দর্শনলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তবে অলৌকিক একটা কিছু ঘটিয়াছে ইহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী থাকে না। গোস্বামী মহাশয়ের নিজের অবস্থাদির সম্বন্ধে লোকের মুখে যাহা শুনি, তাহা আমি সব বিশ্বাস করিতে পারি না। আবার যেসকল বিষয় দেখিয়া-শুনিয়া চমৎকার মনে হয়, তাহাও লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পাই না। সুতরাং সর্ব্ব সাধারণে যাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্য আভাসে লিখিয়া যাইতেছি।

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বা নিয়ম নাই। কোনও কোনও দিন আহার করিতে বসিয়া, হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন—মুখের ভাত মুখেই থাকে। দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা একই অবস্থায় কাটিয়া যায়। পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতেও তিনি অকস্মাৎ আত্মহারা হইয়া পড়েন; বহুক্ষণ আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ভিতরে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা তিনিই জানেন। পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া পড়েন, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন; দীর্ঘকাল এই অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। সংকীর্ত্তনের সময়ে ভগবানের নাম শুনিলেই লাফাইয়া উঠেন, নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। শরীরটি জড়বৎ অসাড়, অবশ হইয়া যায়। তখন বহুক্ষণ সম্মুখে বসিয়া কেহ ভগবানের নাম করিলে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়।

প্রচারকনিবাসে নানা ভাবের লোকই আসেন। তাঁহারা গোঁসাইকে শুনাইয়া নানা ভাবের আলাপ আলোচনাদিও করেন। গোঁসাই সকলের কথাতেই 'হুঁ' দিয়া যান; এবং আপন ভাবেই বিভোর থাকিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে থাকেন। সর্ব্বদাই মনটি যেন অন্য একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। যেসকল গানে ভগবানের নাম গন্ধও নাই, পক্ষান্তরে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ঘটিত ভাবের উদ্দীপনা হয়, সে সকল গানেও গোঁসাইয়ের ভাব। প্রেম-সঙ্গীত, 'টপ্পা' প্রভৃতিও তিনি খুব আগ্রহের সহিত শুনেন, এবং তাহাতেও 'আহা' 'উহু' করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হন। রাধা-কৃষ্ণ বা গৌর-নিতাই সম্বন্ধে গান হইলেই অমনি গোঁসাইয়ের বংশগত ভাব জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসঙ্গীত অপেক্ষাও ঐ সকল গানে গোঁসাইয়ের রুচি অধিক এবং ভাবের স্ফূর্ত্তি বেশী দেখিতে পাই। কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান গোঁসাই বড়ই ভাল বাসেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে একবার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসেন। তিনি বেশ গাইতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের রুচি বুঝিয়া, অনেক সময়ে তিনি কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান গাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্কলিত সঙ্গীতমুক্তাবলী ও প্রেম-সঙ্গীত হইতেও মাঝে মাঝে তিনি নিম্নলিখিত গানগুলি গাহিয়া থাকেন, যথা—"জলে ঢেউ দিও না গো সখি; আমি কালরূপ নিরখি", "তারে দিয়ে প্রাণ কুলমান চরণ পেলাম না সজনি, আমি হলেম গৌরকলঙ্কিনী!"—ইত্যাদি। গোঁসাই এইসকল গান শুনিয়া ভাবে 'ডগ মগ' হইয়া পড়েন। গোঁসাইয়ের ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেও বিমুগ্ধ হইয়া যান। গানগুলি যে কি ভাবের, আশ্চর্য্য এই যে ব্রাহ্ম মহাশয়েরাও তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার

অবসর পান না। যাহা হউক, অতঃপর সন্ধ্যার সময়ে, ছাত্রসমাজের সমবয়স্ক আমরা সকলে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করি—"গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়"। গোঁসাই ভাল বাসেন বলিয়া, "জীবের থাকৃতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল"—বৈরাগীদের এ গানটিও আমরা প্রায় প্রত্যহই গাইয়া থাকি। সংকীর্ত্তনে গোঁসাইয়ের যেপ্রকার অবস্থা হয় তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। দিন রাত অবিচ্ছেদে গোঁসাই যেন একটা ভাবে 'ঢুলু ঢুলু' রহিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া ইহাই বুঝিতেছি। তবে, ভক্তিভাবের আধিক্যবশতঃ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া গোঁসাই অনেকটা প্রাচীন ভ্রান্তমতে পড়িয়া গিয়াছেন, গোঁসাইকে খুব ভাল বাসিলেও তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা।

গোঁসাই-শিষ্যদের কথা।

যাঁহারা গোঁসাইয়ের নিকটে যোগ-সাধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই। তবে, মিলিয়া মিশিয়া, 'আলাপে সালাপে' যতটুকু বুঝিতেছি তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ গোস্বামী মহাশয় পাত্রবিশেষে এই সাধন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভিতরে আশ্চর্য্য ভাব, অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংকীর্ত্তনের ভাবোচ্ছ্বাস ইঁহাদের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই তাহা এক নূতন রকমের, পূর্ব্বে কোথাও এরূপ ভাব কাহারও ভিতরে দেখি নাই। সাধারণ লোকেরা এইসব অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়, কেহ কেহ আবার ভূত প্রেতের কাণ্ড ভাবিয়াও হতবুদ্ধি হয়। সংকীর্ত্তনে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, মত্ততা বা ভাবাবেশ ইঁহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের, তাহা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থাও অন্যপ্রকার। সর্ব্বদাই ইঁহারা সাধনে তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, প্রফুল্লচিত্ত ও বিনয়ী। গোঁসাই-শিষ্যেরা পরস্পরকে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও নাকি অধিক ভাল বাসেন, শুনিতে পাই। দিবসে যে কোন সময়ে একবার সকলেরই দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই। মান মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, সমবয়স্কের মত, ছেলে বুড়োতে এত মেশামিশি, এমন ভালবাসা, এই গোঁসাই-শিষ্যদের ভিতরে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতে এ সদ্ভাব ইঁহাদের কত কাল স্থায়ী হইবে তাহা বিধাতাই জানেন; এখন কিন্তু ইঁহাদের এই দুর্লভ অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—কখনও ইহার আর ভাবান্তর হইবে না। ক্রমে এখন আমারও এমন

হইয়াছে যে, নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তির সময়েও একটি সাধনের লোকের সঙ্গ পাইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তরের সমস্ত দুঃখ দূর হয়। ইহাদের দর্শনমাত্রই একটা সরস সন্তোষে ভিতরটি ভরপূর হইয়া উঠে। ইহা যে কেন হয়, তাহা বুঝি না।

অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য কোনও কোনও সাধননিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিমধ্যেই জন্মিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও উহা ধারণা বা বিশ্বাস করিবারও অধিকার হয় নাই। অন্নময় প্রাণময় কোষ অতিক্রম পূর্ব্বক মনোময় কোষে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্ম শরীরে যথায় তথায় কাহারও কাহারও বিচরণ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে। শুধু পৃথিবীতে নয়, লোকলোকান্তরেও ইঁহারা সময়ে সময়ে গতায়াত করিয়া থাকেন। দূরস্থ কোনও অজ্ঞাত বা গোপনীয় ব্যাপার জ্ঞাত হওয়ার মানসে, কোনও ব্যক্তি ধ্যানস্থ হওয়া মাত্র চিত্রপটের ন্যায় ঐ ঘটনা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। কোনও প্রয়োজনীয়, দুর্লভ বস্তু পাওয়ার মানসে কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়া আসনে ধ্যানস্থ থাকিতে থাকিতেই, ঐ বস্তু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। কোনও মনুষ্য বা জীব-জন্তুর সাহায্যে নহে, সম্পূর্ণ ধ্যানপ্রভাবে, অপ্রাকৃত রূপে এ সব ঘটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোন একব্যক্তি ইষ্ট মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া, খুব কৌতূহলাক্রান্ত মনে, সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কতগুলি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। গোস্বামী মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে সেচেষ্টাহইতে অমনি বিরত করেন, এবং তাঁহাকে কঠিন শাসন করিয়া বলেন—ভগবচ্ছক্তি ভগবানের ইচ্ছায় প্রয়োগ না হ'লে উহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইতে পারে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সংযত ও সাবধান থাকিতে হয়।

কাহারও চঞ্চলতা, ও অসতর্কতাবশতঃ অলৌকিকশক্তিপ্রয়োগের ফলে, আকস্মিক কিছু কিছু দুর্নিমিত্ত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রাকৃতিক কোনপ্রকার ব্যতিক্রম বা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোনপ্রকার অসম্ভব ঘটনা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিতে বা সাধন-প্রভাবে সম্ভব হয় বলিলে, আজকাল লোকে তাহা গুলিখোরের গল্প ভাবিয়া নিতান্তই উপহাসের কথা বলিয়া মনে করিবে, এই জন্য আমি সেসকল ঘটনা আর আমার ডায়েরীতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম না। শুনিতেছি গোস্বামী মহাশয় নাকি শিষ্যদের এই সব হঠকারিতা ও সাংঘাতিক খেয়ালের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যলাভ ও শক্তিপ্রকাশের দিক্‌টা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন!

বিলুপ্ত মন্ত্র-শক্তি উদ্ধারের উপায়নির্দ্দেশ।

ঢাকার কোনও স্কুলের হেড্ পণ্ডিত বিকালবেলা জগন্নাথ স্কুলের একটি ষোল সতেরো বৎসরের ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিলেন। ছেলেটির মাথা বিষম গরম হইয়াছে—অৰ্দ্ধ ক্ষিপ্তপ্রায়। গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ হইবে, এই বিশ্বাসেই পণ্ডিত মহাশয় উহাকে আনিয়াছেন। ছেলেটি তাহার অবস্থা যাহা বলিল তাহা এই—"কিছুদিন পূর্ব্বে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ঢাকাতে আসিয়া রমণার জঙ্গলের ধারে একটি গাছের নীচে আসন করিয়া ছিলেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুব ভক্তি হইল। সন্ন্যাসী অল্পদিন থাকিবেন জানিয়া, স্কুল বন্ধ করিয়া কয়েকদিন তাঁহার খুব সেবা করিলাম। সন্ন্যাসী যাওয়ার সময়ে আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ওহে, তুমি আমার খুব সেবা ক'রেছ, তোমার উপরে আমি খুব খুসী হয়েছি, তোমাকে আমি একটি বিদ্যা দিচ্ছি। তুমি বিনা প্রয়োজনে যেখানে সেখানে লোকের নিকট এই শক্তি প্রয়োগ ক'রো না'। এই বলিয়া তিনি আমার কাণে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া কোন বৃক্ষ লতাতে ছিটাইয়া দিলে উহা অমনি মরিয়া যাইবে। আবার এই মন্ত্রে জল দিলে উহা পুনর্জ্জীবিত হইবে'। সন্ন্যাসীর কথামত আমি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তি পরখ্ করিয়া দেখিলাম, উহা সত্য। এই মন্ত্র যেখানে সেখানে লোকের নিকট প্রয়োগ করিতে সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহার পর একদিন বাঙ্গালাবাজারে রুদ্র বাবুর 'ডিস্‌পেন্‌সারী'তে কয়েকটি ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত মন্ত্র-শক্তি লইয়া আমার খুব তর্ক বাধিল। তাঁহারা উহা বিশ্বাস করেন না; সুতরাং আমাকে কুসংস্কারী বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। আমি তখন জেদে পড়িয়া, মন্ত্র-শক্তি দেখাইতে একটি টবের ফুলগাছে মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিলাম। গাছটি দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; পরে আবার মন্ত্র পড়িয়া জলছিটা দিতেই বাঁচিয়া উঠিল। বন্ধুরা সকলেই অবাক্। তখন তাঁহারা ঐ মন্ত্র তাঁদের শুনাইতে জেদ করিতে লাগিলেন। আমি অস্বীকার করিলেও, তাঁহারা আমাকে ছাড়িলেন না; বুঝাইলেন যে, ঐ মন্ত্রশক্তি যখন আমার আয়ত্ত হইয়াছে, কখনও আর নষ্ট হইতে পারে না। আমি তাঁহাদের কথায় পড়িয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া শুনাইলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আর মন্ত্রে কোনও ফল হইতেছে না, দেখিতেছি। এমন একটা আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়া আমি হারাইলাম,

এই চিন্তায় ও ক্লেশে আমি পাগলের মত হইয়াছি। আবার ঐ মন্ত্রে যাহাতে আমার সেইমত শক্তি হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন।"

গোস্বামী মহাশয় ছেলেটির সাতিশয় আকুলতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রটি তোমার মনে আছে?"

ছেলেটি বলিল—আগে ছিল, এখন একটু গোলমাল হ'য়েছে।

গোঁসাই। এক অক্ষরও তো মনে আছে? যাক্, তোমার গুরুর রূপ মনে আছে তো?

ছেলেটি। হাঁ, তা আছে। তবে, খুব পরিষ্কার নাই।

একথা শুনিয়া গোঁসাই উহাকে একটি প্রণালী বলিয়া দিয়া কহিলেন—আচ্ছা, এক রাত্রি তুমি নির্জ্জনে ব'সে এই কর গিয়ে। মন্ত্রও স্মরণ হবে, মন্ত্রশক্তিও লাভ হবে।

শুনিলাম, ছেলেটি অতঃপর গোঁসাইয়ের কথামত চলিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছে। এখন তাহার মাথার সে অসুখও সারিয়া গিয়াছে।

শক্তি-হরণ।

আজ একটি শক্তিসম্পন্না বাউলনীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। অসংখ্য লোকের গতায়াত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিয়তই হয় বলিয়া, বাউলনীর উপরে আমার তেমন বিশেষ লক্ষ্য পড়ে নাই। কথায় কথায় গোস্বামী মহাশয় তাহার বিষয়ে বলিলেন—আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। একটি বাউলনী এসে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমি তখন লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ বাউলনী আমার পায়ের বুড়া আঙ্গুলটি চোঁ চোঁ ক'রে চুষ্‌তে লাগ্‌লেন। তখন আমার হুঁস হলো। একটা ভয়ানক শক্তি অকস্মাৎ আমার শরীরে প্রবেশ ক'রে আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লে। আমি উহা একটা উপরি শক্তি বুঝ্‌তে পেরে, গুরুদেবকে স্মরণ কর্‌লাম, তাঁর চরণে ঐ শক্তি অমনি অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হ'লাম। বাউলনী তখন মাটিতে পড়ে ছট ফট কর্‌তে লাগ্‌লেন; আর চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"প্রভু, আমার বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দিন। আর আমি কখনও ওরূপ কর্‌বো না।" আমি বল্‌লাম, 'সে আর হবার উপায় নাই; আমার ভিতরে উহা আসামাত্রই

আমি উহা গুরুদেবকে দিয়ে ফেলেছি। যা দিয়েছি তা তো আর চাইতে পারি না'। বাউলনী সমাজে দু'দিন থেকে ঢের কান্নাকাটি কর্‌লেন; পরে যখন বুঝ্‌লেন আর ও জিনিস পাল্‌টে পাবেন না, তখন আধমরার মত নিস্তেজ হয়ে চলে গেলেন।

প্রশ্ন। কি প্রণালীতে ইহারা শক্তি চুরি করে? আঙ্গুল না চুষিয়াও কি পারে?

গোঁসাই। আঙ্গুল চুষে' সহজে পারে; তা ছাড়া, পদধূলি নিতে নিতে পারে, জড়িয়ে ধরে' পারে। কেহ বা দৃষ্টি ক'রেও পারে। নিজের শক্তি ও ভাব অন্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, সেই শক্তি ধ'রে যখন টান দেয়, অন্যের শক্তি ও সদ্‌ভাব সেই সঙ্গে আকর্ষণ ক'রে নেয়।

প্রশ্ন। এসব উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়?

গোঁসাই। অভিমান ত্যাগ ক'রে নিজেকে খুব ছোট মনে কর্‌তে হয়। তা হ'লেই নেবার আর কিছু পায় না। আর নিজ ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যানে রাখিলে, সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়।

প্রশ্ন। বুঝ্‌তে পার্‌লে, তবেই ত এসকল উপায় অবলম্বন করা যায়। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ ওরূপ করে, তখন কিসে রক্ষা পাওয়া যায়?

গোঁসাই।—যোগৈশ্বর্য্য লাভ হ'লে যোগীরা গুরুদত্ত ত্রিশূল ধারণ করেন। তা'তে নিজের তেজ রক্ষা হয়; অন্যের কোন অসদ্‌ভাবও সাধকের ভিতরে সঞ্চারিত হ'তে পারে না।

প্রশ্ন। বড় বড় ত্রিশূল নিয়া গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই চলিতে পারেন। সাধারণ লোক তো আর তাহা পারে না!

গোঁসাই। ৩।৪ ইঞ্চি, ছোট একটি ইস্পাতের ত্রিশূল রাখ্‌লেও হয়।

আমাদের দেশে খুব ছোট ছেলে পিলেদের, ভূত-প্রেত ও ডাইনির দৃষ্টিহইতে রক্ষা করিবার জন্য, কোমরে লোহা বেঁধে দেয়। গুরুদশা কালেও অশৌচান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, উপরি উপদ্রব হইতে নিরাপদ থাকিতে লোকে লোহা ধারণ করে—এ সকল তো ভয়ানক কুসংস্কার বলিয়াই মনে করি। জানি না যোগীদের ত্রিশূল ধারণের মত এ সকল নিয়মেরও কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা।

সাংবৎসরিক উৎসবে মহাসংকীর্ত্তন—ভাবাবেশের কথা।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সাল।

আজ সাংবৎসরিক উৎসব। দেখিতেছি ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব ক্রমে সকল সম্প্রদায়েরই উৎসব হইয়া দাঁড়াইল। ছোট লোক, বড় লোক, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির আসিয়া আজ ব্রাহ্মসমাজ-'কম্পাউণ্ড্' পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দলে দলে লোক ১৫।২০ জন এক একটা স্থানে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। শত শত লোক নানা স্থানে দাঁড়াইয়া বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। প্রকাণ্ড সমাজাঙ্গনের সম্মুখে গোস্বামী মহাশয় ধ্যানস্থ ছিলেন। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়, অধ্যাপক প্রসন্ন বাবু ও ডাক্তার প্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে, খোল বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের এই কীর্ত্তনের আরম্ভ হইতেই ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া পড়িল। স্কুল কলেজের ছেলেরা, কুঞ্জ বাবুর সঙ্গে পরম উৎসাহে গোঁসাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঢুলু-ঢুলু নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। পরে, ভাবাবেশে দিশাহারা হইয়া, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিলেন। জানি না কোথাহইতে ঠিক এই সময়ে একজন অপরিচিত, পরমতেজস্বী সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে এক একটি গানের দলে প্রবেশ করিয়া, হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনে দুই এক 'পাক' নৃত্য করিয়া সমস্ত কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব মহাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া ছেলেবুড়ো সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয় 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ত্তনের দলগুলি অলক্ষিতভাবে সম্মিলিত হইয়া পড়িল। বহু খোল করতালের ধ্বনি সংকীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া ঝম্ ঝম্ আওয়াজে সমাজ-প্রাঙ্গণ কম্পিত করিতে লাগিল। দর্শকগণের মধ্যে বহুলোক গাছতলায়, রাস্তার উপরে, সিঁড়ির ধারে ও ঘাসের উপরে মাটিতে পড়িয়া হাত পা আছড়াইয়া নানা অবস্থায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। এই ব্যাপার কতক্ষণ চলিল জানি না। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে, ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তারা কেহ কেহ আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা এখন উঠুন; উপাসনার সময় হইয়াছে'। গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে চোখ্ মেলিলেন এবং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া একটু সময় স্থির হইয়া রহিলেন। তৎপরে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাশূন্য লোকের নিকটে যাইয়া,

কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহাকেও বা কাণের কাছে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া চৈতন্য-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। সমাজের বারেন্দায়, সিঁড়ির ধারে ১৩।১৪ বৎসরের একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, গোস্বামী মহাশয় তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বারংবার নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতনা হইল না। অবশেষে গোঁসাই তাহাকে নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ছেলেটি অব্যক্ত ক্লেশসূচক একটা করুণস্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, ধীরে ধীরে, তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল। গোঁসাই তখন বলিলেন—"ছেলেটি সহস্রারে গিয়া বসিয়াছিল"। এ কথার যে কি অর্থ, জানি না। ছেলেটি কুঞ্জ বাবুর আত্মীয়, আমার বিশেষ বন্ধু—নাম বসুধা।

সকলকে সুস্থ করিয়া, গোস্বামী মহাশয় বেদিতে গিয়া বসিলেন। গোঁসাই আজ বেদিতে বসিয়া, প্রণালী ধরিয়া উপাসনা করিতে পারিলেন না। নারদ, বাল্মীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির প্রকাশ দেখিয়া, তাঁহাদেরই স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। কথা বেশী না বলিলেও, গোঁসাইয়ের ভাবেই সকলে অভিভূত হইলেন। সর্ব্বশেষে, গোঁসাই ভাবাবেশে এই এই কয়টি কথা বলিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। গোঁসাই বলিলেন—ঐ দেখ, মা আস্‌ছেন। আজ মা থালা ভ'রে প্রসাদ নিয়ে আস্‌ছেন। দেখ, মা আমাকে এ কথা বল্‌তে নিষেধ কর্‌ছেন। কেন মা, বল্‌ব না কেন ? রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও ; আজ তোমার সকল ছেলেকেই দিতে হবে। শুধু আমাকে দিলে খাব না। তুমি সকলেরই তো মা। এঁদের কেন দেও না ? এঁরা যে উপবাসী থাকেন। মা, তোমার এ কি ব্যবহার ? আজ মা, তোমার সব চালাকী সকলকে ব'লে দিব। বিক্রমপুরের সেই 'পাতক্ষীরের' কথা ব'লে দিব, রাম বাবুর কথা ব'লে দিব, শিকল খুলে দিয়েছিলে সে কথাও ব'লে দিব, তোমার ঘরের সব কথাই ব'লে দিব। যে ভাবে চল্‌লে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ ব'লে দিব। দেখুন, আপনাদের বলে দিচ্ছি—আপনারা এই তিনটি নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌লে মায়ের প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মা'কে নিবেদন করে নিবেন ; অনিবেদিত বস্তু কখনও গ্রহণ করবেন না।

অন্যের কুৎসা নিন্দা কখনও কর্‌বেন না। দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধর্‌ছেন,-- আর বল্‌তে দিচ্ছেন না। মা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধর্‌ছেন। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

অস্ফুটস্বরে এই সব বলিতে বলিতে গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া পড়িল; বহুচেষ্টা করিয়াও, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। চারিদিকে হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেরই কান্না ও ভাবের মহাধুম পড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথ বাবু একটু পরে গান ধরিলেন। আজ বেদির কাজ গোস্বামী মহাশয় আর করিতে পারিলেন না। ক্রমে নিস্তব্ধ হইলে, সকলে আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন, আমিও সেইসঙ্গে চলিয়া আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় কতক্ষণ বেদিতে বসিয়া রহিলেন, জানি না।

কতিপয় আশ্চর্য্য ঘটনার সূত্র।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসার পর, এই দুই তিন বৎসরে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজে, যথায় তথায়, আলোচনাও অনেক সময় হইতেছে। ঐসকল ব্যাপার যদি যথার্থই সত্য হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্যের কথা। গোস্বামী মহাশয়ের নিজ মুখে ওসকল কথা না শুনিয়া, আমি উহা আর "ডায়েরীতে" লিখিতে ইচ্ছা করি না। কথার ছলে বা প্রশ্ন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যখন ঐ সকল ঘটনা-বিষয়ে পরিষ্কার জানিব, তখন ঐ সকল বিবরণ যথাযথ লিখিয়া রাখিব। স্মরণার্থ, এখন শুধু এ স্থলে সূত্রাকারে একটু উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

(১) গোস্বামী মহাশয়ের কন্যাদ্বয় একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পদ্মাদেবীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা সাগ্রহে গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার আদেশ মত চাউল, কলা, নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া কন্যাগণের পদ্মাগর্ভে পদ্মাপূজা এবং সেই সময়ে অকস্মাৎ পদ্মাদেবীর আবির্ভাব।

(২) বিক্রমপুর, চাঁচরতলায় কালী-স্থানে আশ্চর্য্য প্রকারে হরি সঙ্কীর্ত্তন ও তৎকালে আকাশহইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি।

(৩) ৺কামাখ্যা তীর্থে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর অদ্ভুত দর্শন ও ৺কামাখ্যা দেবীর রজোনিঃসরণ প্রত্যক্ষ করা। তৎসহ সেখানে অচলানন্দ স্বামীর বিশ্বাসপ্রভাবে চাউল বুনিয়া ধানগাছ উৎপাদন।

(৪) গেণ্ডারিয়ায় আনন্দ বাবুর নির্জ্জন বাগানে কঠোর সাধন, দুর্জ্জয় পরীক্ষা ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকাদি দর্শন।

(৫) ধর্ম্মার্জ্জনে হতাশ হইয়া বুড়ীগঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে উদ্যত জনৈক ব্যক্তিকে অকস্মাৎ গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা।

(৬) প্রচারার্থ গমন করিয়া বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজে অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব-বিস্তার, ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবের উচ্ছ্বাসে জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করা।

(৭) ব্রাহ্মসমাজে তুমুল বিরুদ্ধ আন্দোলনের সময়ে প্রশ্নচ্ছলে মন্মথ বাবুর দ্বারা "যোগ-সাধন" প্রণয়ন ও প্রচার।

আমার অসাধ্য ব্যাধি।

অগ্রহায়ণের শেষ, ১২৯৪ সাল।

কফাশ্রিত বায়ুতে ও পিত্তশূল বেদনায় মরণাপন্ন হইয়া স্কুলপরিত্যাগপূর্ব্বক কবিরাজী চিকিৎসার জন্য বাড়ী আসিয়াছি। এই দুইটি রোগই আমি পিতা মাতা হইতে পাইয়াছি, আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই এরূপ অনুমান করেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস শরীরের উপরে অতিরিক্ত অত্যাচারে আমিই ইহা সৃষ্টি করিয়াছি। খুব ছোটবেলাহইতে "ধর্ম্ম-ধর্ম্ম" করিয়া আমার একটা বিষম অস্থিরতা রহিয়াছে। গত তিন চার বৎসরহইতে তাহা আবার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোথায় গিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিব, কিরূপে চলিলে কি ভাবে সাধন করিলে তাঁহাকে পাইব—সর্ব্বদাই প্রায় এই ভাবনা আসে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কোনও দুর্গম, নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে থাকিয়া, আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন, এই সুদৃঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছামত জীবন-গঠন করিতে গিয়াই আমি এমন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

আমাদের কুলের গুরু একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তাঁহার ধীর-গম্ভীর প্রকৃতিতে ও সুমধুর ব্যবহারে আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। আমার আশানুরূপ অবস্থা, তাঁহার ব্যবস্থামত চলিলে, আমি সহজেই লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া, একদিন তাঁহার চরণ দুটি জড়াইয়া ধরিলাম। খুব কাতর হইয়া তাঁহাকে ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়া বলিলাম, 'যাহাতে জিতকাম ও আহার-ত্যাগী হইতে পারি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দিন; আমি পাহাড়ে গিয়া সাধন করিব।' তিনি আমাকে দৈহিক উত্তেজনা নষ্ট করিবার জন্য পঞ্চনিম্ববটিকা ও আহার-ত্যাগের

জন্য বিল্ববটিকা যথারীতি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে বলিলেন। এসব কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমি স্ত্রীলোকের মুখপানে দৃষ্টি করিব না ও জিহ্বার লালসায় কোন বস্তুই আহার করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া গত দুই বৎসর যাবৎ প্রত্যহ উক্ত ঔষধ দুটি সেবন করিয়া আসিতেছি। নিম্ববটিকার অদ্ভুত গুণে দুর্ব্বার কামভাব আমার অনেকটা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, এবং বিল্ববটিকাসেবনে আশ্চর্য্যরূপে ক্ষুধা-বোধ নষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে চেষ্টাদ্বারা মাত্র এক মুষ্টি অন্ন আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছি। এইসকল চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার কুম্ভকও অনেক দিন করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, বহুকাল এই নিম্ব ও বিল্ব-বটিকা সেবনে ও আহারের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতার দরুণই আমার এই দুঃসহ ও দুরারোগ্য পিত্তশূল রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শ্বাসরোধের অস্বাভাবিক উৎকট চেষ্টাতেই এই দারুণ কফাশ্রিত বায়ু জন্মিয়াছে। সে যাহা হউক, এবার পীড়িত অবস্থায় বাড়ীতে আসিয়া ঔষধ দুইটি ত্যাগ করিয়াছি। বায়ুরোগের সূচনামাত্রই শ্বাসরোধের চেষ্টা ছাড়িয়াছি; আনুষঙ্গিক অন্যান্য নিয়মানুষ্ঠানও সমস্তই ছুটিয়া গিয়াছে; কেবল, আহারের পরিমাণটা পূর্ব্ববৎ এখনও সেই এক মুষ্টি অন্নই নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাড়ীতে আসিয়া দেশের প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজের দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা লইলাম। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত কালী কবিরাজ মহাশয়ের আদেশমত, তাঁহারই ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দেশানুসারে বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া যথারীতি এখন সেবন করিতেছি। কিন্তু কোন উপকারই হইতেছে না; বরং বায়ু ও বেদনার প্রকোপ আরও যেন ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে মনে হয়। চিকিৎসকগণ অনেকেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, রোগ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, আরোগ্য কিছুতেই হইবার নয়; তবে, সোণা, লোহা, মুক্তা-প্রভৃতি 'জারিত' করিয়া, ভাল কবিরাজ দ্বারা খুব যত্নের সহিত ঘরে বহুমূল্য ঔষধাদি প্রস্তুত করাইয়া রীতিমত সেবন করিলে, রোগের সাময়িক একটু উপশম হইতে পারে মাত্র। আমিও মনে মনে এক প্রকার জানিয়া নিয়াছি যে অধিক দিন আর এ যাতনা ভোগাইতে ভগবান্ আমাকে এ সংসারে রাখিবেন না। সুতরাং আসন্ন মরণাশায় সাধন ভজনের দিকে মনটা আমার আরও ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। রোগের চিকিৎসা যেন একটা অনাবশ্যক বাহুল্য কার্য্য বলিয়াই মনে হয়। সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ৯৷৷ টা পর্য্যন্ত একটি লোক প্রত্যহ আমার সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তৈল মালিস করে।

সকালে দুইবার ঔষধ সেবন করিতে হয়। এ সময়টা আমি বেশ নাম করিয়া কাটাই। মধ্যাহ্নে আহারান্তে বাড়ীর পশ্চিম দিকে গ্রামের শিশুদের কবরস্থানে 'ছকির বাড়ী'র ভয়ঙ্কর জঙ্গলে যাইয়া বসি; অপরাহ্ণ ৫টাপর্য্যন্ত নির্জ্জনে ভগবানের নাম করিয়া বড়ই আনন্দ পাই। কোনদিন কোনও কারণে আমার এই নির্জ্জন সাধন না হইলে মনে বড় কষ্ট হয়।

অযোধ্যাগমনের সঙ্কল্প ও গোঁসাইয়ের আদেশ।

বাড়ীতে অনেক দিন হয় আসিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিল। শুনিতে পাইলাম—ঢাকাতে গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া বিষম গোলযোগ। তিনি নাকি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রচারক-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাস ছাড়িয়া, (লক্ষ্মীবাজার শিকওয়ালা বাড়ীর পরে) একরামপুরের কদমতলায় একটি পৃথক্ বাসা ভাড়া করিয়া, সপরিবারে সেখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। সংবাদটি পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাপারটা যে কি, পরিষ্কার কিছুই বুঝিলাম না। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

এদিকে কবিরাজের ঔষধ-সেবনেও রোগের কিছুই উপশম হইল না। রোগ বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অধিকন্তু, চক্ষেরও রোগ জন্মিল। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনেরা শীঘ্রই আমাকে বড় দাদার কাছে অযোধ্যা পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে একবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মতির জন্য সমস্ত অবস্থা শ্রদ্ধেয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিলাম। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই পত্রের উত্তর আসিল। গোস্বামী মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক তেমনই লিখিয়া পাঠাইলেন —

১। অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে একবার ঢাকায় এসে সাক্ষাৎ করিও।

২। চক্ষুর পীড়া, সুতরাং দৃষ্টি-সাধনের প্রয়োজন নাই।

৩। ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে পার; আপত্তি কি?

নিঃ—শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। একরামপুর, ঢাকা।
৫ই পৌষ, ১২৯৪।

পত্রখানা পাইয়া আমি দৃষ্টিসাধন ছাড়িয়া দিলাম। প্রত্যহ বা তিন বেলা খুব কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। নামও করি বটে; কিন্তু নাম অপেক্ষা প্রার্থনা করিয়াই

আমার অধিক আনন্দ হয়। উপকারও প্রার্থনাতেই বেশী হইতেছে মনে করি। শুনিয়াছি—সাধনপথে চলিতে সর্ব্বপ্রথমেই নাকি গুরুভক্তির প্রয়োজন; গুরুতে ভক্তি না দাঁড়াইলে নামে রুচি হয় না। কিন্তু আমার ত দেখিতেছি গুরুভক্তির অত্যন্ত অভাব। গোস্বামী মহাশয়কে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি বটে; কিন্তু, তা' বলিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বা অসাধারণ একটা কিছু ভাবিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে, যাহা আমি জানি না বা বুঝি না এমন কোন অলৌকিক বা অস্বাভাবিক গুণ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে অযথা কল্পনা করাও আমি দোষ মনে করি। গোঁসাই নিষ্কপট ভাল মানুষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করি; তিনি বলিয়াছেন এই সাধন করিলে উপকার হইবে, তাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, নাম ও প্রাণায়াম করিয়া যাইতেছি মাত্র।

স্বপ্ন—অদ্বৈত ভাব—গোঁসাইয়ের কৃপা।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার কোনই উপকার হইতেছে না, মনে হয়। তাঁহার উপরে নিষ্ঠা বা ভক্তি না জন্মিলে, তাঁহার বাক্যেই বা আমার তেমন শ্রদ্ধা হইবে কেন? সতত সঙ্গ করিয়া তাঁহার ঐ সব 'অসাধারণ' অবস্থাগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার উপরে আমার ভক্তিই বা জন্মিবে কি প্রকারে? তাহা ত আমার পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং এ সাধন-গ্রহণ আমার বিড়ম্বনা হইল। এজন্য আমার প্রত্যহই এখন কষ্ট বোধ হইতেছে। একদিনও উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না।

৯ই পোষ, ১২৯৪; শুক্রবার।

আজ মনোদুঃখে আকুল হইয়া প্রার্থনা করিলাম—'হে অন্তর্যামী পরমেশ্বর, আমার অন্তর তুমি দেখিতেছ। প্রভো, এ জীবনের যাহাতে কল্যাণ হয়, যে ভাবে চলিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়, কিছুই বুঝি নাই। তুমি দয়া ক'রে জানিয়ে দাও। কি করিলে নামে রুচি হইবে, তোমাতে ভক্তি হইবে, বুঝাইয়া দাও। গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নিয়াছি। তিনি এখানে নাই; আমার যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, দয়া করিয়া তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর।' প্রার্থনান্তে রাত্রি প্রায় ১১ টার সময়ে, বিছানা হইতে নামিয়া, মনের বিষম উদ্বেগে হতাশ হইয়া, গোঁসাইয়ের চরণোদ্দেশে মাটীতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, ব্যাকুল ভাবে বলিলাম—"গোঁসাই, এ জীবন তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু কই, তোমার প্রদত্ত সাধনে আমার ত রুচি হইল না, তোমাতেও ভক্তি জন্মিল না! দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। গুরুদেব, তুমি দয়া না করিলে আমার উপায় আর কে করিবে?" খুবই কাতরভাবে কিছুক্ষণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলাম।

১০ই পৌষ, শনিবার।

ভোর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—বহুদিন ব্রাহ্ম-মতে উপাসনাদি করিতে করিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্যের ভাব ও মর্ম্ম হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। তখন প্রকৃতিকে ঈশ্বরহইতে অভিন্ন দেখিতে লাগিলাম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গমসহ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিকাশ ভাবিয়া, সর্ব্বত্র মাথা নোয়াইতে লাগিলাম। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার ভিতরে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—'বাঃ, এ তো বেশ সাধন করছ! যদি সকলই ঈশ্বর, তবে নিজেকে বাদ দিচ্ছ কেন? তুমিও ত ঈশ্বর। তোমাকেই তুমি ঈশ্বর ভেবে সন্তুষ্ট থাক না কেন?' আমি বলিলাম—'ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আমি গুরুতে ভক্তি ও নামে রুচি চাই। আপনি আমাকে দয়া করুন' গোঁসাই বলিলেন—'বেশ! তা' হ'লে প্রত্যহ সাধনের পূর্ব্বে * * * এই নামটি সহস্রবার জপ ক'রে নিও।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমারও অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়িয়া গোঁসাইকে নমস্কার করিয়া ঐ নামটি হাজার বার জপ করিলাম। এই ব্যাপারে আমি বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। বহুদূরহইতেও প্রার্থনা করিলে গোঁসাই তাহা জানিতে পারেন, এইপ্রকার একটা সংস্কার আমার ভিতরে আসিয়া পড়িল। গোঁসাই-ই যে স্বয়ং স্বপ্নযোগে আমাকে এইরূপ বলিয়া গেলেন এ বিষয়ে আমার আর কোনরকম দ্বিধা আসিল না।

প্রার্থনার ব্যর্থতা বোধ।

স্বপ্ন দেখার পরহইতে তদনুসারে কার্য্য করার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অবস্থার দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী-অনুযায়ী উপাসনাদি বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছি। প্রার্থনা করিয়া বড়ই আনন্দ পাই। যেদিন প্রার্থনা করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া না যাই, সেদিন যেন প্রার্থনাই হইল না মনে করিয়া, সারাদিন একটা উদ্বেগে ছটফট্ করি। নিত্য তিন বেলা আমার প্রার্থনা করার নিয়ম। কিন্তু, কেন জানি না, স্বপ্নদর্শনের পর আমার প্রার্থনাতে পূর্ব্বের ভাব আর রহিল না। গতি একেবারে ফিরিয়া গেল। প্রার্থনার ভিতর দিয়াই, 'প্রার্থনা অসার' ভগবান্ আমাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে লাগিলেন। দেখিতেছি, যখনই যে ভাব লইয়া প্রার্থনা করি তখনই সেই ভাবে ডুবিয়া যাই আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে

বিভোর হইয়া পড়ি। মনে করি—এইতো ঈশ্বরকে অনুভব করিলাম; কিন্তু প্রার্থনা ছাড়িয়া উঠিলেই, কিছুক্ষণ পরে আর সে ভাব, সে আনন্দ, সে উৎসাহ থাকে না, সমস্তই যেন নিবিয়া যায়। ইহা পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া বিচার আসিল, 'এপ্রকার হয় কেন? যদি সত্যস্বরূপ সেই নিত্য আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রার্থনার সময়ে উপলব্ধি করি, তবে তাহা স্থায়ী থাকে না কেন? তাঁহাকে তেমন ভাবে একবার যথার্থ অনুভব করিলে আর কি অন্যভাব হৃদয়ে আসে, ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, না আনন্দশূন্য অবস্থা অন্তরে আসিতে পারে?' কয়দিন ধরিয়া এই বিষয়ে বিচার করিলাম। শেষে, একদিন প্রার্থনা করিতে করিতেই বুঝিলাম—স্পষ্ট বোধ হইল যে—আমার অন্তর্হিত ভাবগুলিকে প্রার্থনাদ্বারা জাগ্রত করাইয়া নিয়া, যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাই ঈশ্বরের প্রকাশজনিত আনন্দ মনে করিতেছি; বাস্তবিক ঈশ্বরের উপাসনা করি না—অন্তরের ভাবেরই উপাসনা করিতেছি মাত্র।

পরমেশ্বরে এক-একদিন এক-একটা সদ্‌গুণ আরোপ করিয়া, তাঁহাকে সেই গুণের একমাত্র আধার ভাবিয়া আমি উপাসনা করি। ভগবান্ সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, আনন্দময়, পরম দয়াল, ইত্যাদি বলিয়া, স্বীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জল-বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুতে তাঁহারই প্রকাশ বা গুণ দেখিয়া স্তব স্তুতি করি। ক্রমে উহা ধ্যান করিতে করিতে একাগ্রতা হইলেই ঐ সকল ভাবে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি; তখন 'এই পরমেশ্বর' 'এই পরমেশ্বর' জ্ঞানে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ হইয়া যাই। প্রার্থনার দ্বারাই এখন সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি—উহা ঈশ্বর নয়। বাক্যদ্বারা, ধ্যানদ্বারা, একাগ্রতাদ্বারা উহা আমারই অন্তর্নিহিত ভাববিশেষের স্ফুরণ মাত্র; ধ্যান-ধারণাজনিত বা একাগ্রতালব্ধ এরূপ কোন ভাবকেই আমি আর ঈশ্বর বোধ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে চাই না। আমি বাক্য-কল্পনা-বিনির্ম্মুক্ত, ভাব-সংস্কার-বর্জ্জিত, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্যপ্রকাশেরই অভিলাষী। আমি প্রার্থনা করিয়া নিজের বাক্য নিজে শুনিয়া অথবা আপন সংস্কার বা ভাবানুরূপ ধ্যান করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আরাম লাভ করিয়া থাকি, তখন আনন্দহেতুক মোহবশতঃ তাহাকে সত্যস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের প্রকাশ বই অন্য কিছু ভাবিতে পারি না, সত্য; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উহা ছুটিয়া গেলে পরিষ্কার বুঝি, উহা আমারই অন্তরের একটি ভাবের উচ্ছ্বাস বা কাল্পনিক একটি সুখানুভূতি-মাত্র। ঈশ্বরের অনুভূতি হইলে অবশ্যই তাহা স্থায়ী হইত, এবং সেসম্বন্ধে এরূপ কোন সংশয় সন্দেহও কোন কালে আমার মনে কিছুতেই উঠিত না। পরমেশ্বর সত্য বস্তু; তাঁহার অনুভব বিন্দুমাত্র হইলে সে বিষয়ে বিস্মৃতি বা সংশয় কি কোনও

কালে হইতে পারে? অগ্নি যদি কোন লোকের শরীরে লাগে সে, জাগরিতই থাকুক আর নিদ্রিতই থাকুক, লাফাইয়া উঠিবে; অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও শরীরে জ্বালা থাকিবে; জ্বালাও যদি যায়, ক্ষতটা কিছুকাল স্থায়ী হয়; ক্ষত সারিলেও তাহার একটা চিহ্ন থাকিয়া যায়, অন্ততঃ একটা স্মৃতিও থাকে। কিন্তু আমার এবেলার ঈশ্বরানুভূতির লেশটুকুও তো ও বেলা অন্তরে খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং কখনও আমি ঈশ্বরোপাসনা করি না; কল্পনার, বাক্যের, ও ভাবেরই উপাসনা করিতেছি মাত্র। প্রার্থনা করিয়া খুব আনন্দ হয়; কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল থাকে না। উহা ছুটিয়া গেলেই যেন শতগুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রার্থনাতে এপ্রকার অস্থায়ী অসার আনন্দ অনুভব হওয়াতে প্রাণ আমার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। প্রার্থনার উপরে বিরক্তি ও ক্রোধ জন্মিল। আর প্রার্থনা করিব না—অস্থায়ী অসার আনন্দকে আর কখনও ঈশ্বর-সম্ভোগ-জনিত আনন্দ মনে করিব না,—স্থির করিলাম। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে যে তাঁহার উপাসনা হয় না, এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল।

বহুকালের অভ্যস্ত প্রার্থনা বিসর্জ্জন দিলাম। ভাবিলাম—'এখন আর কি লইয়া থাকি? অগত্যা পরমেশ্বরের নামই জপ করি; এখন যা' করেন ভগবান্।'

কিছু কাল হইল প্রার্থনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। গোঁসাই যে সাধন দিয়াছেন, তাহাই করিতেছি। দু' বেলা প্রাণায়াম করি, আর সর্ব্বদা মনে মনে নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করি। নাম করায় কিন্তু কোন উপকারই বুঝিতেছি না, আনন্দও পাইতেছি না। দিন দিন দারুণ শুষ্কতায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়া পড়িল।

ভগবানের নাম করিতেছি, কখন কখন এই ভাবটি গাঢ় হইলে একটু আনন্দ পাই; তাহাও স্থায়ী হয় না বলিয়া, উহাতেও আর তেমন আমার চেষ্টা নাই।

ইষ্ট নামের উৎপত্তি-অনুভূতি।

কিছু দিন যাবৎ নাম করিতে করিতে মনে হইতেছে—'এই নাম কে করে? কোথা হইতে এ নাম উঠিতেছে? আমিই বা কোথায় আছি?' নাম করার সঙ্গে সঙ্গে এসব সম্বন্ধে প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া থাকি। প্রত্যেকটি নাম করার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক কোথাহইতে এই নাম আসিতেছে, তাহা তল্লাস করি। বোধ হইতেছে যেন অসীম সাগরে পড়িয়া বুদ্‌বুদের গোড়া খুঁজিতেছি, নামগুলিকে সাগরের বুদ্‌বুদবৎ মনে হইতেছে, বুদ্‌বুদ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ডুব দিতেছি; কিন্তু, অগাধ অতলস্পর্শ সাগরে ডুবিতে ডুবিতে,

কিছু দূরে তলাইয়া গিয়া, আবার বুদ্‌বুদের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া উঠিতেছি। উদরের ভিতরে নানা স্থানে ঘুরিতেছি; কিন্তু কোথাও গোড়া পাইয়া বসিতে ঠাঁই পাইলাম না। এই অনুসন্ধানে আমার চিত্তের ভিতরে একটা ব্যস্ততা থাকিলেও, বাহিরের কোন জ্ঞানই বড় থাকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যেন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে। এ কয় দিন ক্রমে ক্রমে তলপেটে, নাভিমূলে, হৃদয়ে, কণ্ঠায়, অবশেষে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নামের উৎপত্তি অনুভূত হইল; কিন্তু খুব পরিষ্কার রূপে নয়।

এ সময় একবার গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। মাঘোৎসবও নিকটবর্ত্তী। গোঁসাইকে দেখিতে এবং এসব বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অবিলম্বেই ঢাকা যাইব, স্থির করিলাম।

ভাবুকতায় গোঁসাইয়ের শাসন।

গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে ঢাকায় আসিয়াছি। অদ্য সকালে কয়েকটি ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারের ঘরে উত্তরমুখ হইয়া নিজ আসনে গোঁসাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, দেখিলাম। ঘরে অনেক লোক, সকলেই নীরব। আমি ঘরের এককোণে গিয়া বসিলাম।

বিক্রমপুরনিবাসী, জগন্নাথ স্কুলের একটি ছেলে রাধা-কৃষ্ণের একখানা চিত্রপট হাতে লইয়া, ঘরের সকলকে অতিক্রম করিয়া, একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া বসিল; পুনঃ পুনঃ গোঁসাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল; রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি গোঁসাইয়ের মুখের কাছে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"গোঁসাই, ব'লে দাও, ব'লে দাও, কিরূপে পাইব, বল। আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি! আর কিছু আমি চাই না, আর কিছু চাই না। কিরূপে পাব ব'লে দাও।" গোঁসাই পুনঃ পুনঃ তাহাকে 'স্থির হও, স্থির হও' বলিয়াও, কিছুতে তাহার সেই অস্থিরতা থামাইতে পারিলেন না। ছেলেটি যেন আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন গোঁসাই ধমক দিয়া বলিলেন—'বটে? এখানে চালাকী! আর কিছু চাও না? নবাবের বাগানে নির্জ্জনে সুন্দরী একটি যুবতী পেলে চাও কিনা, ভেবে বল তো। চালাকী করছ?' গোঁসাইয়ের কথা শুনিবামাত্র ছেলেটির সমস্ত ভাব যেন শুকাইয়া গেল। সে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ম্লান মুখে উঠিয়া পড়িল।

অনুগতের বিরুদ্ধতা।

গত বৎসর একদিন সমাধির অবস্থায় হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের মুখহইতে এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—সাধনের ভিতরের একটি কৃতবিদ্য, সুশিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্যের আসন গ্রহণ কর্‌বেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলে মিশে আমাকে নানা রকমে অপদস্থ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন। পরে, বিষম বিপন্ন হ'য়ে ঢাকা ছেড়ে পালাবেন।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরে অনেকেই বুঝিলেন, ঐ ব্যক্তি আর কেহ নহেন—গোস্বামী মহাশয়েরই প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থানকালেই তাঁহার মধুর সঙ্গলাভ মানসে মন্মথ বাবু ঢাকায় আসেন, এবং ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে একত্র অবস্থান করেন। তৎকালে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশক্রমে তিনি কখন ছাত্রসমাজে, কখনও ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। ৪।৫টি বক্তৃতাতে সহরে একটা 'হৈ হৈ' রব পড়িয়া গেল। 'কেশব বাবুর পরে এমন বক্তা ঢাকাতে এপর্য্যন্ত আর কেহ আসেন নাই' অনেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে অতি অল্প কালের মধ্যেই শিক্ষিত-সমাজে মন্মথ বাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তি জন্মিল। গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজত্যাগের পরও ব্রাহ্মদের অনুরোধে, মন্মথ বাবু স্বীয় সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, মন্মথ বাবু স্বীয় অদ্ভুত শক্তি ও তেজস্বিতা গোঁসাইয়ের অভ্রান্তশাস্ত্র-বাদ, অভ্রান্তগুরু-বাদ-প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-ভাবে বক্তৃতা করিয়া অতি তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আসিলে, মন্মথ বাবুর উৎসাহ উদ্যম ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের আকর্ষণ চলিতেছে। সহরে সর্ব্বত্র মন্মথ বাবুর জয় জয়কার। ব্রাহ্মদের গৃহে তিনি আদৃত হইতেছেন; বয়ঃপ্রবীণ ব্রাহ্মও কেহ কেহ তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মাঘোৎসবে উপাসনা।

১১ই মাঘ।

আজ মাঘোৎসব। প্রতিবৎসর এই মাঘোৎসবে ভগবানের নাম লইয়া কতই আনন্দ করি! সকালবেলা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট না যাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে গেলাম। মন্মথ বাবু উপাসনা করিতেছিলেন। বিপুলজনতাপূর্ণ, বিস্তৃত সমাজঘরের এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। উপাসনা খুব ভাল লাগিল।

মন্মথ বাবুর তেজঃপূর্ণ ভাষায় অন্তরের নিদ্রিত ভাবগুলি যেন জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমি খুব শক্ত হইয়া বসিলাম, ভাবিতে লাগিলাম 'এ তো কেবল ভাবের উপাসনা, বাক্যের আড়ম্বর ও কল্পনার ছড়াছড়ি মাত্র। পরমেশ্বর কোথায়?' এইপ্রকার চিন্তার দ্বারা মনটিকে খুব কঠোর করিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়েই মন্মথ বাবু হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা আনন্দময়ি, আজ মাঘোৎসবে সকলেরই হৃদয় তুমি উজ্জ্বল করিয়াছ কিন্তু, মা, একটি ছেলে তার শূন্য অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া দেখ কি ভাব্‌ছে। মা আনন্দময়ি, আজ তার অন্ধকার ঘর কি তুমি তোমার আলোকে উজ্জ্বল করিবে না?" ইত্যাদি। শুনিয়া আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিলাম—'বুঝি মন্মথবাবুর অন্তরের ভাব অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে; এবার তিনি আমার শুষ্কতা টের পাইয়া তাঁর ভাবুকতায় আমাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিবেন।' আমি তদ্দণ্ডেই আসনহইতে উঠিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। দোতলায় গিয়া দেখি, গোস্বামী মহাশয় ২০।২৫টি শিষ্য লইয়া একটা বড় ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন; শ্রীযুক্ত রজনী বাবু, আনন্দ বাবু-প্রভৃতি গণ্য মান্য ব্রাহ্মগণও অনেকে রহিয়াছেন।

প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল ভাবের ধার ধারি না। ভাব হইলে তাহা স্থায়ী হইবে না, কিছুক্ষণ পরেই ছুটিয়া যাইবে, এই ভয়ে ভাবের কথা শুনি না। ভাবের গান ভালবাসি না, ভাবুকদের নিকটে বসিতেও প্রাণ চায় না। ভিতরটি শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া আছে। গোস্বামী মহাশয় ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া উপাসনা করেন, আমার এ বিশ্বাস আছে। তাই, আমার শুষ্কতা দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনায় যোগ দিলাম। ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীমত এখানেও তিনি উদ্বোধন করিয়া, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মা অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড়, কাঙ্গাল-ফকির, সকলকেই তুমি পেটভরা অন্ন-দান কর্‌ছ। দেশেবিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন! আমাকেও পেট্‌ভরা অন্ন দিচ্ছ। ছেলেবয়সথেকে এই দিনে, মা, আমাকে তুমি বিশেষভাবেই তোমার প্রসাদ দিয়ে আস্‌ছ। এ বছরেও, মা, আজ আমাকে তুমি বিশেষভাবে দয়া কর।

এই কথা কয়টি বলার পরেই গোস্বামী মহাশয়ের অপূর্ব্ব অবস্থা দেখিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—হ'য়েছে, হ'য়েছে! হ'য়েছে, মা; উঃ! উঃ!

উঃ! আর না, আর না, আর না, মা। কাণাকড়ি—একটি কাণাকড়ি, মা, আমি তোমার কাঙ্গাল ছেলে তোমার হাতে একটি কাণাকড়ি চাই মা। তাই আমার যথেষ্ট। মা, আমার কি সাধ্য এত হজম করি? রোজ রোজ দিও, মা, একটি ক'রে কাণাকড়ি দিও। আর না, আর না। এই বলিতে বলিতে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া নীরব হইলেন। শরীরের নানাস্থান থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। অবিরল-ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। এক একবার কাঁদোকাঁদো স্বরে, 'জয় মা জয় মা' বলিতে লাগিলেন। এ সময়ে, জানি না কেন, দয়াময়ীর গুণেই হউক অথবা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ গুণেই হউক, আমার শুষ্ক কঠোর প্রাণও অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেল। শরীরটি পুনঃপুনঃ কাঁপিতে লাগিল। আমি একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মেজেতে লুটাইতে লাগিলাম। কয়েকজন কাঙ্গালের গান ধরিলেন—"মা, আমি তোমার পোষা পাখী।" ঘরের ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। গুরুভ্রাতারা প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক কাল ভাবাবেশে মগ্ন থাকিয়া পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

অবিচারে ব্রাহ্মদীক্ষাদানে প্রতিবাদ।

অপরাহ্নে ২।৩টি গুরুভ্রাতার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া বলিলেন—চিত্রপট নিয়ে সে দিন যে ছেলেটি এসেছিল সে নাকি আজ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা নিবে! গোঁসাই শুনিয়া খুব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'কি? সেই ছেলেটিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌বে? এ সব কি? কাল যে আমার কাছে এসে রাধা-কৃষ্ণের পট নিয়ে এত কাণ্ড কর্‌লে, কত ধমকিয়ে দিলাম,—আজই তাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা! এরকম সবলোককে দীক্ষা দিয়েই তো ব্রাহ্ম-সমাজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন। কাল এক মত ছিল, আজই অন্য মত হ'ল; আবার, কালই যে সে আর এক মত ধর্‌বে না, তা' কে বল্‌তে পারে? কেবল কি দলবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য? লোকবৃদ্ধি হ'লেই হ'ল! তা' হ'লে পাগল-গুলোকে নিয়েও তো দীক্ষা দিতে পারে। উঃ, কি ভয়ানক! এসব খবর হয় ত ওঁরা জানেন না। একবার জানানো দরকার। তোমরা কেহ যেতে পার?'

আমি অমনই যাইতে রাজী হইয়া বলিলাম—"আমি যাব। কা'কে কি বল্‌তে হবে, বলুন!" গোঁসাই বলিলেন,—'তুমি গিয়ে নির্জ্জনে মন্মথকে আমার কথা বল্‌বে যে

কাল যে মূর্ত্তি নিয়ে ঘুরেছে আজই তাকে ব্রাহ্ম-সমাজ দীক্ষিত কর্‌তে পারেন না। ঐ ছেলেটিকে অন্ততঃ ১৫ দিন দেখা আবশ্যক।' আমি ছুটিয়া ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। মন্মথ বাবুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া, গোস্বামী মহাশয় পাঠাইয়াছেন জানাইয়া, সমস্ত কথা যথাযথ তাঁহাকে বলিলাম। মন্মথ বাবু বলিলেন—"এ সব আমি কিছুই জানি না। আচ্ছা, তুমি যাও। আমার অজ্ঞাতসারে কেহ দীক্ষা নিতে পার্‌বে না, এই কথা গিয়ে গোঁসাইকে ব'ল।" আমি অমনি একরামপুরে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত বলিলাম।

ব্রাহ্মসমাজহইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে আমার জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনকে আমার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লইয়া যাইতে জেদ করিতে লাগিলাম। পাটুয়াটুলির রাস্তার ধারে রেবতী বাবু গোস্বামী মহাশয়ের সাধন সম্বন্ধে আমাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রেবতী বাবু গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে বড় আহ্লাদিত হই। রেবতী বাবু অতি সুগায়ক—গোঁসাই রেবতী বাবুর কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। দীক্ষাগ্রহণ করিতে রেবতী বাবুকে বারংবার বলিলাম। রেবতী বাবু বলিলেন—"দীক্ষা নিতে আমার খুব ইচ্ছা আছে; তবে আরও কিছুদিন দেখে শুনে নিতে চাই। আর আমি দীক্ষা নিতে চাহিলেই কি তিনি দিবেন?" ইত্যাদি—

সাধনানুভূতিতে উৎসাহদান। ভক্ত মালাকারের বাঞ্ছাপূরণ।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

সকালে উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। গোস্বামী মহাশয়কে ধ্যানস্থ দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তনে গোঁসাইকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি, আমাদের বাধা না মানিয়া, গোস্বামী মহাশয়কে আসনহইতে ডাকিয়া তুলিতে গিয়া অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন। তাঁহার নূতন পরিহিত বস্ত্রখানা স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গেল। পায়েও খুব আঘাত লাগিল। গোঁসাইয়ের ধ্যানভঙ্গ না করিয়া ভদ্রলোকটি মনোদুঃখে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গোঁসাইয়ের চৈতন্য হইল। সকলে চলিয়া গেলে পর আমি গোঁসাইকে বলিলাম—কাল আমি বাড়ী যাব।

গোঁসাই। তোমাদের দেশে ইছাপুরায় কাল আমরাও তো যাব। মধ্যাহ্নে আহার ক'রে এস, একসঙ্গে যাওয়া যাবে। এখন কেমন? তোমার শরীর ভাল

আছে তো? তোমার না দাদার কাছে যাবার কথা ছিল? পশ্চিমে যেতে পার্‌লে বেশ সুবিধা ছিল। কবে যাবে?

আমি। দাদার শীঘ্রই বাড়ী আসিবার কথা আছে। তাই, যাওয়া হইল না।

গোঁসাই। লেখাপড়া বুঝি হচ্ছে না? যাক্, শরীরটি আগে সুস্থ ক'রে নাও। লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। সাধন কেমন চল্‌ছে? নাম কর তো?

আমি। দেশে ভাল সঙ্গ নাই। কুচিন্তা কুকল্পনায় সময়ে সময়ে চিত্ত বড়ই অস্থির করে। রোগও সারিতেছে না। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। নাম তো করি, কিন্তু শুষ্কতায় দিন দিন কাঠ হইয়া যাইতেছি। বড়ই কষ্ট হয়। প্রাণে নৈরাশ্য আসে।

গোঁসাই। হাঁ সবই বুঝ্‌ছি। সাধন কর্‌তে থাক, সমস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। একটু একটু দৃষ্টিসাধনও ক'রো। প্রাণায়াম করতে যদি কষ্ট হয়, নাই কর্‌লে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু প্রাণায়াম কর্‌তে পার্‌লে দেখ্‌বে এ অসুখ থাকবে না। এই প্রাণায়াম একবার বেশ অভ্যস্ত হ'লে কোন রোগই থাকে না। আর প্রাণায়ামের সময়ে একটু একটু নিশ্বাস রোধ ক'রে নাম ক'রো। শুষ্কতায় কোন ক্ষতি নাই। নাম কর্‌তে কর্‌তে এ শুষ্কতাও দূর হ'য়ে যাবে। এতে নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই।

আমি। আমি যাদের খুব ভাল ব'লে জানি, শ্রদ্ধাভক্তি করি, সাধনের পূর্ব্বে এরূপ কয়েকটি লোককে আমি প্রত্যহ স্মরণ ক'রে থাকি। এপ্রকার কল্পনায় কোনও ক্ষতি হয়?

গোঁসাই। এতো খুব ভাল। এতে ক্ষতি কিছুই হয় না; উপকারই যথেষ্ট হয়। বেশ! ও রকম খুব করবে। আমিও ওরূপ ক'রে থাকি।

আমি। সাধনের সময়ে নামটি কোথা হইতে আসে, অনুসন্ধান কর্‌তে ইচ্ছা হয়। তলপেটে, নাভিতে, কণ্ঠায়, এইরূপ নানাস্থানে অনুভব করি। এখন মাথার পিছন দিকে একটা স্থানে ধারণা হচ্ছে। এইরূপ অনুসন্ধান ক'রে যে যে স্থানে অনুভব হয় ধারণা কর্‌ব?

গোঁসাই। হাঁ হাঁ, খুব কর্‌বে। এ সব ধারণা অনেক স্থানে হবে। কপালে ও ব্রহ্মতালুতে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—ক্রমে এসব স্থানেও হবে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে এসব ধারণা আপ্‌না হ'তেই হয়। এসব হওয়া খুব ভাল।

এ সব কথা বার্ত্তার পরে গোঁসাই আবার চক্ষু মুদিলেন। আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই একটি হরি সঙ্কীর্ত্তনের দল কদমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয়, দুরহইতে খোলের আওয়াজ শুনিয়াই, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন কদমতলায় আসামাত্রই তিনি আসনহইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং কীর্ত্তনে মিলিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তন চলিল, তিনিও তৎসঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। ক্রমে আমরা বেনিয়াটোলার শ্রীযুত বিহারী মালাকারের বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। ওখানে গিয়াই গোঁসাই বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গেলেন। কীর্ত্তনও একটু পরে থামিল। কিয়ৎকাল গত হইলে, গোঁসাই চৈতন্য লাভ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন— এ কি? আমি এখানে এলাম কিরূপে? আমি ত ভাবছিলাম কদমতলায়ই আছি।

এ সময়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সম্মুখে দেখিয়া, গোঁসাই মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মালাকার করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন—"প্রভু, আজই আমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল। বড় আশা ছিল, একবার এখানে আপনার শুভাগমন হয়, চরণধূলি পড়ে। আপনাকে বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে সাহস পাইলাম না; আপনি দয়াল, তাই আমার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া পূর্ণ করিলেন।" এই বলিয়া মালাকার গোঁসাইয়ের পদতলে পড়িয়া লুটালুটি করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর আমি কখনও গোঁসাইকে প্রতিমূর্ত্তির নিকটে নমস্কার করিতে দেখি নাই। মনে বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, হায় ভগবান্, এ দৃশ্য আমাকে দেখাইলে কেন?

ইছাপুরা গ্রামে গোঁসাই ও লাল। মহোৎসবে মল্লবেশে নৃত্য।

সকালবেলা মুখ হাত ধুইয়া বসিয়া আছি, ছোট দাদা আসিয়া বলিলেন—"এখনও ব'সে আছিস্ কেন? গয়নার (খেয়া নৌকার) সময় হইয়াছে। আজ না বাড়ী যাইবি?"

১৪ই মাঘ, শুক্রবার।

আমি বলিলাম—আজ গোঁসাইও ইছাপুরায় হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাবেন; আমিও সেই সঙ্গে যাব ব'লে এসেছি। ছোট দাদা গোঁসাইয়ের সঙ্গে যাইব শুনিয়া খুব বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"গোঁসাইয়ের সঙ্গে না হইলে বুঝি বাড়ী যাওয়া হয় না? 'গোঁসাই'! গোঁসাই।' কেবল গোঁসাই তা' হবে না। এখনই তুই গয়নায় চ'লে যা।" আমি আর কি করিব? ছোট দাদার কথা মতই রওনা হইলাম। গয়নায় উঠিয়া আমার কান্না পাইল। মনে মনে গোঁসাইকে প্রণাম

করিয়া জানাইলাম যে, "ছোট দাদার কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই গয়নায় চলিলাম। আমার জন্য আপনি যেন আর অপেক্ষা না করেন। আর আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।" সারাটি পথ আমার কষ্টে কাটিল।

সকালবেলা উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে ব্যস্ত হইলাম। বাড়ীহইতে অর্দ্ধঘণ্টার পথ অন্তরে ইছাপুরা গ্রাম। উকীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে যথাসময়ে গিয়া পঁহুছিলাম। দেখিলাম বাড়ীটি লোকে পরিপূর্ণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আজ মহোৎসব হইবে। 'ছোট'লোক, বৈষ্ণব, বাউল ভিন্ন ভদ্রলোকেরা এদেশে বড় মহাপ্রভুর উৎসব করে না; উহা ছোটলোকদের হৈ চৈ ব্যাপার বলিয়া আমরা জানি। আজ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এই উৎসবে আসিবেন; গত কল্য গোঁসাইও আসিয়াছেন—এখবর পাইয়া সম্ভ্রান্ত সমাজপতিরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

১৫ই মাঘ, পূর্ণিমা, শনিবার।

আমি একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া পড়িলাম। সে ঘরে তখন কোনও লোকের গোলমাল নাই, মাত্র গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য রহিয়াছেন দেখিলাম। আমি যে কেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে আসিতে পারি নাই তাহা তাঁহাকে বলিতে না বলিতেই তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি যে কাল সকালবেলা গয়নায় চ'লে এলে তা' আমি তখনই জান্‌তে পেরেছিলাম।

আমি। আপনাকে কি কেহ খবর দিয়াছিল?

গোঁসাই। না, তা' নয়।

সংক্ষেপে এই উত্তরটুকু দিয়াই, আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করার অবসর না দিয়া, পুনঃ পুনঃ হরিচরণ বাবুকে ডাকিতে লাগিলেন। হরিচরণ বাবু উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

'ঘরে মুড়ি আছে? দু' মুঠো মুড়ি এনে দিন্ তো। বুকে বেদনা বোধ হ'চ্ছে। পিত্তের বেদনায় মুড়ি উপকারী; সময়ে সময়ে খাওয়া 'মাত্র দমন হয়'। শরীর আমার অতিশয় রুগ্ন। বুকের বেদনা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই লাগিয়া আছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ অতি-ক্লেশে দেড় ঘণ্টায় চলিয়া আসিয়াছি। গোঁসাইয়ের নিকট পঁহুছিয়া বেদনার যন্ত্রণায় বুক চাপিয়া বসিয়াছিলাম। হরিচরণ বাবু মুড়ি আনিয়া দিলেন। দু' একবার গোঁসাই তাহা মুখে দিয়া আমাকে অবশিষ্ট খাইতে বলিলেন। মুড়ি খাইয়া আমার বেদনা অনেকটা কমিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আমা অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক একটি ছেলে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। ছেলেটিকে দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। উহার পরিচয় পাইবার জন্য শ্রীধর বাবুকে লইয়া ঘরহইতে বাহিরে আসিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীধর বাবু বলিলেন—"ইঁহার নাম লালবিহারী বসু; বাড়ী শান্তিপুর। বয়সে ছেলে মানুষ বটে, কিন্তু ইনি একজন জাতিস্মর মহাপুরুষ। আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ইনি ঘরহইতে বাহির হন। সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ-প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ছয় জন সিদ্ধ পুরুষের নিকটে ক্রমান্বয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কঠোর সাধন-ভজনে বহু যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন। কিন্তু কোথাও যথার্থ তৃপ্তি না পাইয়া এখন আশ্চর্য্য প্রকারে দৈব ঘটনায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার পরিচয় আর কি বলিব? ইঁহার সঙ্গ করিলেই ক্রমে সমস্ত জানিবে।" আমি শ্রীধরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ওদিকে মহোৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত উঠানের উত্তর প্রান্তে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমরা সকলে গোঁসাইকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে সতৃষ্ণ নয়নে মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া আপাদমস্তক থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। চারি দিকে বাউল বৈষ্ণবেরা গোঁসাইয়ের ভাব দেখিয়া মহা উৎসাহের সহিত, দলে-দলে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। বহু খোল-করতালের "ঝমাঝম" আওয়াজে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়, কয়েকবার সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে তুড়ি দিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, হঠাৎ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; অমনই বাম হস্তে লালকে ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লাল তখন ভাবাবেশে উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে হাত ছাড়াইয়া এক পাশে সরিয়া পড়িল। গোস্বামী মহাশয় লালের দিকে তীব্রদৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক মল্লবেশে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। লালও অনিমেষে গোঁসাইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিল। এ সময়ে গোস্বামী মহাশয় ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং বাণযোদ্ধার ন্যায় দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী লালের দিকে সন্ধান-পূর্ব্বক ঘন ঘন আকর্ণ আকর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক পদ চলিয়াই পুনঃপুনঃ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তির্য্যক্ ভাবে বাম পদ অগ্রে প্রক্ষেপ করিতে করিতে দিগন্তস্পর্শী হরিধ্বনি করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে

লালের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। লাল তৎক্ষণাৎ বাম হস্ত সম্মুখের দিকে ঢাল আকারে বিস্তার করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। ২৫।৩০ হাত সরিয়া গিয়া লাল অকস্মাৎ ভীম রবে 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ সম্মুখের দিকে প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক গোঁসাইয়ের মত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। গোঁসাই তখন, লালের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন, সম্মুখে হস্তাবরণ পূর্ব্বক ত্রস্ত ভাবে দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্‌গামী হইতে লাগিলেন। ২৫।৩০ হাত সরিয়া গিয়া গোস্বামী মহাশয় আবার অধিকতর উদ্যমে প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়া, "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে লালের দিকে ধাবমান হইলেন। লাল তখন আবার পূর্ব্ববৎ হটিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার একের প্রতি অন্যে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অসংখ্য বাউলবৈষ্ণব-পরিবেষ্টিত, বহুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্রীধর উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দিকে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া, অগ্নিপূর্ণ প্রকাণ্ড 'ধুনুচি' গ্রহণ করিলেন, এবং 'বোল বোল' রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া, পুনঃ পুনঃ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর নতশিরে গোঁসাইয়ের চরণে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রাখিয়া সধূম ধুনুচি দ্বারা আরতি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এ সময়ে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী মুহুর্ম্মুহুঃ উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে লোক সকল বেহুঁস হইয়া পড়িতে লাগিল। বহু মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি কীর্ত্তনকোলাহলে মিলিত হইয়া সকলকে কাঁপাইয়া তুলিল। উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

কি শুনি, কি শুনি, সিংহ রবরে নদীয়ায়।
নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী, 'ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-রব করি';
(হুঙ্কারিয়া) শ্রীঅদ্বৈত বগল বাজায় রে (নদীয়ায়);
জগা বলে, মাধা ভাই, পালাবার আর স্থান নাই,
সংসার ঘেরিল হরি নাম রে নদীয়ায়!"
শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি;
শ্রীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে (নদীয়ায়)।

বহুক্ষণ এই প্রকার নৃত্যের পর লাল অকস্মাৎ গোঁসাইয়ের চরণতলে পড়িয়া

লুটাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ও উচ্চ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কয়েকবার হরিধ্বনি করিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। হরিচরণ বাবু ও আমি গোঁসাইয়ের পদদ্বয় অন্যের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিলাম এবং বাতাস করিতে লাগিলাম। শ্রীধরও মূর্চ্ছিত। ক্রমে সঙ্কীর্ত্তন থামিয়া গেল।

যথাসময়ে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হইল। অপরাহ্নে আহার করিয়া আমরা সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

চন্দ্রগ্রহণ।

লালের সঙ্গে আজই আমার প্রথম আলাপ; উঁহার জীবনের অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আজ এই উৎসবে আসিবার কথা ছিল; তিনি আসেন নাই। গোঁসাই নাকি আগামী কল্য বারদী যাইবেন। রাত্রে শ্রীধর ও লাল অন্য ঘরে গিয়া শয়ন করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও আমি গোঁসাইয়ের নিকট রহিলাম। আজ চন্দ্রগ্রহণ।

একটু বেশী রাত্রে গোঁসাই বলিলেন—'আজ গ্রহণ। সারা রাত জেগে আজ অনেকে জপতপ কর্‌বে।' আমি বলিলাম—'কেন? আজ জপ কর্‌লে কি কোন বিশেষ ফল লাভ হয়?'

গোঁসাই। তা' তো বল্‌তে পারি না। তবে তিথির একটা গুণ আছে তা' জানি।

কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই কথায় কথায় বলিলেন—সেরাজদিঘা নদীর পাড়ে একটি আশ্রম হ'লে বড় ভাল হয়। সহরের গোলমাল থেকে সময়ে সময়ে এসে ওখানে নির্জ্জনে থাকা যায়।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, গোঁসাই আমাকেও শয়ন করিতে বলিলেন। আমি রাত্রি আড়াইটার পরে শুইলাম। গোঁসাই সম্মুখে জ্বলন্ত ধুনি রাখিয়া সারা রাত্রি এক ভাবে বসিয়া রহিলেন। এসময়ে একবার বলিলেন—একটি পাহাড়ে এক সময়ে আমাদের সকলকে মিলিত হ'তে হবে। গুরুজী আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সাধনার্থে এক একটি দল ক'রে সংসারে প্রেরণ কর্‌বেন।

ঘুমের ঘোরে শুনিয়া এ কথায় আমি আর কিছু প্রশ্ন করিলাম না।

সাধনের সংকল্প।

ফাল্গুন মাস।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার আন্তরিক আস্থা তেমন আশাপ্রদ এখনও দাঁড়ায় নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে যতই মিশিতেছি ততই তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজের যেসকল ব্যক্তি এই সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যা' তা' একটা অবস্থা হওয়া বা ওরূপ একটা বলা কিছুই অসম্ভব মনে করি না। উহা আমি গণনার ভিতরেই আনি না, কিন্তু ব্রাহ্মভাবাপন্ন প্রত্যক্ষবাদী, ভয়ঙ্কর গোঁড়া গোঁসাইশিষ্যগণও যখন এই সাধন লইয়া সন্তুষ্ট আছেন দেখিতেছি এবং নানা অদ্ভুত অবস্থার পরিচয় দিতেছেন শুনিতেছি,—বিশেষতঃ আজন্ম সত্যবাদী, নিরপেক্ষ গোস্বামী মহাশয় এই সাধনের সাফল্য বিষয়ে যখন নিজ জীবনে পরিষ্কার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তখন আর ইহাতে সংশয় রাখি কি প্রকারে? আমার চেষ্টার ত্রুটি বশতঃই সাধনে উপকার পাইতেছি না মনে করিয়া, নিজের উপরে ধিক্কার আসিল। প্রাণপণে সাধন করিয়া, দেহপ্রাণ জ্বালাইয়া অঙ্গার করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্নানাহার ও নিদ্রা বাদে, ভোরবেলাহইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ অবিশ্রামে নাম জপ করিতে লাগিলাম। প্রাণায়াম কুম্ভক এবং দৃষ্টিসাধনও যথামত চলিল। প্রায় মাসাধিক কাল এই ভাবে সাধন করিয়া আসিতেছি।

জ্যোতির্দর্শনে সংজ্ঞাবিলোপ।

চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ।

আর আর দিনের মত আজও অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, নিজ আসনে বসিয়া স্থিরভাবে নাম করিতেছি, অকস্মাৎ দেখিলাম—একটি অদ্ভুত জ্যোতি ঝিকিমিকি করিয়া প্রকাশ হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ জ্যোতি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; এবং সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় আশ্চর্য্য ছটা বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। ধীর তরঙ্গায়িত স্বচ্ছ জলাশয়ে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের ন্যায়, অত্যুজ্জ্বল, চঞ্চল জ্যোতি নিজ ললাটমধ্যে দর্শন করিতে করিতে, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলাম। ৫।৭ মিনিট কাল এই জ্যোতি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়া, স্থিরভাব ধারণ করিল। উহার বিমল মনোহর সৌন্দর্য্যে চিত্ত আমার উহাতে একেবারেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল; অন্য আর কোন জ্ঞানই রহিল না। ঐ সময়ে নাম করিতেছিলাম কি না তাহাও আমার স্মরণ নাই। এই দর্শনের পরে আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ যে ছিলাম, তাহাও কিছুই জানি না।

জাগরিত হইয়া, ঐ জ্যোতির স্মৃতিতে এখন আমি যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় গেলে, কি করিলে আবার আমি উহা দেখিতে পাইব, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

আগামী কল্যই আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইব, স্থির করিলাম। আজ সমস্ত যেন আমার নিকটে বিষাদময় নীরস ও বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। জ্যোতিটির স্মৃতি চিত্তে একটানা লাগিয়া রহিয়াছে।

ঢাকায় পঁহুছিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ ও শ্রীমান্ লালবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। উঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিভৃতে লইয়া গিয়া আমার এই দর্শনের বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। তাঁহারা সকলেই এই দর্শনের যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—"উহাই জ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দিব্যচক্ষু। উহা প্রকাশিত থাকিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দিব্যালোকে মধুময় দর্শন হয়। যে যবনিকার অন্তরালে পরলোক রহিয়াছে, এই আলোকেই তাহা স্বচ্ছ হইয়া যায়। তখন দেখা যায় জীবন ও মরণ, ইহলোক এবং পরলোক সমস্তই এক। গুরুর কৃপাতেই এ অবস্থা লাভ হয়। তাঁরই ইচ্ছায় ইহা স্থায়ী হয়।" লাল বলিলেন—"এই জ্যোতি ক্রমে হৃদয়ে আসিয়া পড়ে, এবং অষ্টপ্রহর আনন্দরূপে বিরাজ করে। ইহা অদৃশ্য হইলে, নৈরাশ্যে ও শুষ্কতায় জীবন যেন শ্মশানতুল্য হইয়া যায়; তখন নানাপ্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষা আসিতে থাকে; জ্বালা যন্ত্রণায় হৃদয় ফাঁক করিয়া দেয়। নামেই ইহার প্রকাশ; আর, নামশূন্য হইলেই ইহা অন্তর্হিত হয়।" শ্রীধর বলিলেন—"আরে ভাই, এই ত জিনিস! একেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ বলে। এ অবস্থা স্থায়ী হ'লে কি আর রক্ষা আছে? বাসনা কামনা সমস্ত লয় পাইয়া, ঐ জ্যোতিতে লোক আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যায়! সাধনে নিষ্ঠা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে গুরুদেব চরম অবস্থার আভাসমাত্র সাধকদের নিকটে প্রকাশ করেন; আবার টানিয়া নিয়া যান। শুধু তোমার নয়, প্রথম প্রথম এরূপ এক একটা আশ্চর্য্য অবস্থা এক একজনার হয়। ইহা চেষ্টাসাধ্য নয়, সাধনসাধ্য নয়, শুধু গুরুর কৃপাতেই এই অবস্থা হয়। তাঁহার কৃপাব্যতীত কিছুই হইবার যো নাই!"

ইঁহাদের কথা শুনিয়া আমার একটা আনন্দ হইল বটে; কিন্তু অধিকক্ষণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম সত্য বস্তু পরিজ্ঞাত থাকিলে সহস্র লোকেও ঠিক একই প্রকার বলিবে। ইঁহারা তো দেখিতে পাই—এক একজনে এক এক রকম বলিলেন। ইঁহাদের কথায় পরস্পর বিরোধী বিশেষ কিছু না থাকিলেও, আমার সন্দেহ হয়—ইঁহারা বোধ হয় সকলেই 'আন্দাজী' কথা বলিলেন! আমি অন্যদিক্ দিয়া অনুসন্ধান করিতে

ব্যস্ত হইয়া, ব্রাহ্ম ডাক্তার কৈলাস বাবুর নিকটে গেলাম। তাঁহাকে আমার সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ দর্শন আমার চোখের দোষে বা মাথার কোন রোগের দরুণ হয় নাই তো?" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তা ভিন্ন আর কি বলিব, তোমার তো 'সর্ট-সাইট' আছেই। চোখের রোগে মানুষ দিন-দুপুরেও জোনাকিপোকা দেখে। আমাদের এ 'পারফেক্ট সায়ন্সে,' ডাক্তারী কেতাবে ওরূপ 'ঢের ঢের' প্রমাণ আছে। 'যোগ-টোগ' করে চোখ-মাথা নষ্ট হইলে, আরও কত দেখ্‌বে।"

ডাক্তার বাবুর কথায় আমার দর্শন বিষয়ে বিষম একটা 'খটকা' জন্মিল। সুতরাং, গোস্বামী মহাশয়কে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ জ্যোতির্দর্শনের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতা আপনা আপনি হইতে লাগিল।

যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর উৎসাহে সাধন করিতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই সে জ্যোতির একটা স্মৃতি আমার অন্তরে রহিয়া গেল। উহা আর ছাড়াইতে পারিলাম না।

ঢাকার টর্নেডো।

বেলা-অবসানে ঢাকার পশ্চিমাকাশে নদীর উপরে এক খণ্ড কালমেঘ দেখা দিল। নবাব গণি মিঞা সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণে অকস্মাৎ ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গার জল আলোড়িত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষহইতে হস্তিশুণ্ডাকৃতি জলস্তম্ভ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া, কাল মেঘে মিলিত হইল। তখন অসংখ্য অগ্নিগোলা উহাহইতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। ২০।২৫ খানা 'এঞ্জিন' এককালে চলিলে যে প্রকার শব্দ হয় সেইপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দে সহরটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। হঠাৎ ঐ শব্দ শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় আসন ত্যাগ করিয়া ব্যস্ততার সহিত ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং কাদো কাঁদো স্বরে কালী ও মহাবীরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, মহাবীর ও মহাকালী ভীষণ আকারে প্রকাশিত হইয়া, গভীর গর্জ্জন সহকারে দিগন্ত কাঁপাইয়া, অগ্নি-গোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক, নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন! কালীর অনুচারিকাগণ সম্মুখে যাহা পাইতেছেন লণ্ডভণ্ড করিয়া ভীম গতিতে কালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন! গোস্বামী মহাশয় ছল ছল চক্ষে কম্পিত কলেবরে, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—জয় মা কালী! জয় মা কালী! দয়া কর, দয়াময়ি, দয়া কর, মা।

২৬শে চৈত্র,
শনিবার।

প্রসন্ন হও, মা, প্রসন্ন হও। একটু পরে আবার ব্যস্তভাবে বলিলেন—জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! ও সব অগ্নিগোলা আমার বুকে নিক্ষেপ কর! সকলের প্রতি দয়া কর, সকলকে রক্ষা কর। এই ভাবে স্তবদ্বারা গোস্বামী মহাশয় উঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে ২।৩ মিনিটের মধ্যে যাহা হইবার হইয়া গেল। উপদ্রবেরও শান্তি হইল। কিন্তু সমস্ত সহরে লোকের মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকা ও বিক্রমপুরে শত শত গ্রামে, যে সব অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা বুদ্ধির অগোচর ও বিস্ময়জনক। একটা আশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তির প্রভাবে যে কতকগুলি অদ্ভুতকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—

১। বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণপারহইতে একটি বৃদ্ধাকে নদীর উত্তর পারে, সহরের মধ্যে বহু উচ্চ অট্টালিকা সমূহ অতিক্রম করিয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলের দোতলায় একটি কোঠার ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছে! ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধার কিন্তু কোন অঙ্গেই বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

২। "ঢাকাপ্রকাশ" যন্ত্রালয়ের একখানা বড় টেবিল ৫।৬ মিনিট দূরের পথে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিয়া ফেলিয়াছে। টেবিলটি যে ঘরে ছিল তাহাতে মাত্র একটি দরজা দিয়া কায়দামত 'কাত' করিয়া বাহির না করিলে, অন্য কোন উপায়ে উহা বাহিরে আনা যায় না। টেবিলটি প্রায় আড়াই মণ ভারি! উহার কোন অঙ্গই ভগ্ন হয় নাই।

৩। মুড়িপরিপূর্ণ কলসী একবাড়ীর কার (মাচাঙ্গ) হইতে তুলিয়া লইয়া ৩।৪ মিনিট দূরের পথে অপর একবাড়ীতে আনিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। আলগা সরার ঢাকনি সমেত মুড়িপরিপূর্ণ কলসীটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিয়াছে!

৪। একটি ১৫।১৬ হাত লম্বা 'দস্তি' থামকে (বোধ হয় চড়ক পূজার) ৫।৬ ফুট পোতা স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া, ঐ গর্ত্তেই উহার মাথার দিক নীচে দিয়া উল্টাভাবে পূর্ব্ববৎ পুতিয়া রাখিয়াছে।

৫। সুদৃঢ় বৃহৎ অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ইষ্টকাদি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে! অথচ তাহার ঠিক পার্শ্বে মাত্র ১২।১৪ ফুট অন্তরে অর্দ্ধশুষ্ক গোলাপফুলের একটি পাপ্‌ড়িও বৃন্তচ্যুত হয় নাই!

৬। একটী যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ অক্ষত রাখিয়া, শুধু স্তন দুইটি ক্ষুর-কাটার মত সমান করিয়া তুলিয়া নিয়াছে!

৭। অঙ্গুলীপরিমিত স্থূল, প্রায় ১ হস্ত দীর্ঘ, আগাসরু একটি বাঁশের বাখারীদ্বারা

একটা সুপারি গাছকে এপিঠ ওপিঠ বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! খুব বলবান্ লোকেও উহা টানিয়া খুলিতে পারিতেছে না।

যেসকল স্থান দিয়া এই ঘূর্ণীবায়ু বহিয়া গিয়াছে সে সমস্ত স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাকা বাড়ীর দেওয়ালের, এমন কি—ভূমিরও, রং পর্য্যন্ত পোড়া মাটির মত হইয়াছে। মাঠ ময়দানের দূর্ব্বাগুলিও যেন জ্বলিয়া গিয়াছে। বহু বলিষ্ঠ 'জোয়ান' লোকও নানাস্থানে এই ঝড়ে পড়িয়া মারা গিয়াছে; আবার বহু শিশু, বালক, গর্ভবতী স্ত্রী, এবং বৃদ্ধেরাও এই ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া নিরাপদে সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইয়াছে! ক্ষণস্থায়ী একটা ঝড়ে কি প্রকারে যে এত সব কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, বুঝিতেছি না। জড়শক্তিতে ভগবদিচ্ছায় চৈতন্য মিলিত হইলে তাহাদ্বারা যে নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা না মানিয়া পারিতেছি না। কিন্তু দেবদেবী বা ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্বেই আমার অবিশ্বাস, সুতরাং এ সকল ঘটনা তাঁহাদের কোন কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গ। বিচিত্র জীবনকাহিনী; অজ্ঞাতভূগোল-বৃত্তান্ত।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে বহুকাল যাবৎ যে মহাপুরুষ গুপ্তভাবে রহিয়াছেন তাঁহাকে সকলেই এখন বারদীর ব্রহ্মচারী বলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে অনেক বার এই মহাপুরুষের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ও অসাধারণ মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছি। গোঁসাই বলিয়াছেন—"বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া, বহু পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এপ্রকার উচ্চ অবস্থার একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এ অবস্থার লোক আর নাই।" গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা অনেকেই বহুবার বারদী গিয়াছেন। ঢাকা ও বিক্রমপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সমস্ত ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গে আজকাল ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ। কথায় কথায় গোস্বামী মহাশয় আমাকেও একদিন বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নাই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌বে। হিমালয় ও তিব্বতাদি হ'তে প্রাচীন যোগিগণ যোগশিক্ষা কর্‌তে রাত্রিকালে এই ব্রহ্মচারীর নিকটে আসেন। এজন্যে রাত্রে কেহ সেই ঘরে যেতে পায় না। তিনি সন্ধ্যার সময়েই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি একবার ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে যাইব?

গোঁসাই—হাঁ, হাঁ, খুব যাবে। গেলে উপকার পাবে। ওখানে গিয়ে নিজে থেকে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না, চুপ্ ক'রে একটু দূরে ব'সে থেকো। তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজন নিজহ'তেই তিনি তোমাকে ডেকে বল্‌বেন।

গোস্বামী মহাশয়ের কথায় ব্রহ্মচারীকে দেখিতে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। বহুকাল পরে বড় দাদা (শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) বাড়ী আসিয়াছেন; মেজ দাদা ও ছোট দাদাও ছুটি উপলক্ষে বাড়ীতেই আছেন। বড় দাদা সকল সময়েই প্রায় আমার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। কথাপ্রসঙ্গে সুযোগ পাইলেই আমি তাঁহাকে গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ ধর্ম্মজীবনের কথা বলি। গোঁসাইয়ের সত্যনিষ্ঠা, দয়া ও সরলতার দৃষ্টান্তে দাদা খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। আমিও তখন দাদাকে গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা লইতে অনুরোধ করি; যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ নিতান্তই প্রয়োজন; দাদা কিন্তু গোঁসাইয়ের একথা স্বীকার করেন না। ছেলেবেলা হইতে তিনি কেশব বাবুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কেশব বাবুকে গোস্বামী মহাশয় অপেক্ষাও অনেক বড় মনে করেন। কেশব বাবু কখনও দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, দাদা ইহাই জানেন; সুতরাং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও পুরুষকার দ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়, কেশব বাবুর দৃষ্টান্তে দাদা ইহাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন! আমি ভাবিলাম, কোন প্রকারে দাদাকে একবার বারদীতে নিয়া ফেলিতে পারিলে হয়; ব্রহ্মচারী মহাশয় যদি একবার দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেন, তাহাতে দাদার প্রত্যয় জন্মিবে। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের একগ্রামবাসী, দাদার সমবয়স্ক ও বিশেষ বন্ধু। তাঁহার দ্বারা অনুরোধ করাইয়া দাদাকে বারদী যাইতে রাজী করাইলাম। অবিলম্বেই আমরা বারদী যাত্রা করিব স্থির হইল।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫; রবিবার।

ভোর রাত্রে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। আজ জাগরিত অবস্থাতেও প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার ন্যায় নিয়ত এ স্বপ্ন আমার স্মৃতিতে উদিত হইতেছে। এই স্বপ্নে পরিষ্কাররূপে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দর্শনলাভ হইল। যে সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা এ স্বপ্নে আমি দেখিলাম তাহার সঙ্গে আমার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা নিশ্চয় মনে হয়। তবে গোস্বামী মহাশয়কে উহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা না করিয়া ডায়েরীতে উহা তুলিতে ইচ্ছা করি না।

সকালে আহার করিয়া বড় দাদা, মেজ দাদা, তারাকান্ত দাদা এবং আমি বারদী রওনা হইলাম। দাদার শরীর অত্যন্ত স্থূল, ৪।৫ মিনিট চলিলেই তিনি হাঁপাইয়া পড়েন। তালতলা

পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া, স্থূল উরুদ্বয়ের সংঘর্ষণে ছাল উঠিয়া ঘা হইয়া গেল। সাধু-দর্শনে হাঁটিয়াই যাইবেন এই জেদেই দাদা এই উৎপাতের সৃষ্টি করিলেন। তালতলাহইতে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই আমরা বারদীর বাজারে পঁহুছিলাম। সন্ধ্যার পরেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দরজায় খিল পড়ে, সকলেই জানে। কিন্তু দাদা চিত্তের আবেগে, রাত্রিকালেই দর্শনে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই চলিয়া গেলেন; আমার ইচ্ছা হইল না, আমি নৌকাতেই রহিলাম। একটু পরে উঁহারা আসিয়া বলিলেন, দর্শনলাভ হইয়াছে। উঁহাদের যাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তোমাদের জন্যই আমি এত রাত্রিপর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করি নাই; এখন যাও, গিয়ে বিশ্রাম কর, কাল এস।" এই বলিয়া তিনি সকলকে নৌকায় পাঠাইয়া কপাটে খিল দিলেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫; সোমবার।

ভোর বেলা স্নানাদি করিয়া আমরা ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারেন্দার সম্মুখে পৌছিতেই ব্রহ্মচারী মহাশয় উঠিয়া আসিয়া দাদাকে হাতে ধরিয়া স্বীয় আসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইলেন; এবং দাদাকে বলিলেন—"তুমি মহাপুরুষ। ছদ্মবেশে বাবু সাজিয়া আমার কাছে আসিয়াছ।" দাদা বলিলেন—"আমি সর্ব্বদা এই বেশেই তো থাকি।" পরে বহুক্ষণ ধরিয়া দাদার সঙ্গে নানারূপ আলাপাদি চলিল। দাদার অবস্থা শুনিয়া খুব সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার কর্ম্ম প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। তুমি আবার আমাকে দর্শন কর্‌তে এসেছ? দশ বছর পরে শত শত লোক তোমাকেই দর্শন ক'রে ধন্য হবে।" দাদা বলিলেন—আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে, আপনি ব'লে দিন।" ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন—"তা' হ'লে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা লও। সত্যবস্তু তাঁরই নিকটে আছে। তিনি আশ্রয় দিলে খুব শীঘ্রই কল্যাণ লাভ কর্‌বে।" আরও অনেক কথাই ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন; কিন্তু এই কথা কয়টি আমার ভাল লাগিল বলিয়া এখানে লিখিয়া রাখিলাম। মেজ দাদাকেও অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে—"অর্থ উপার্জ্জন কর, এবং নির্লিপ্তভাবে লোকের সেবায় উহা ব্যয় কর," এই কথাটিই খুব বিশেষ করিয়া বলিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ শেষ হইলে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে তুই এসেছিস্ কেন? দেবতা দেখ্‌তে এসেছিস্?" আমি কোনও কথা বলিব না স্থির করিয়া, চুপ করিয়া বারেন্দায় স্থির হইয়া বসিয়া ছিলাম। ব্রহ্মচারীর প্রশ্ন শুনিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলাম 'না'। ব্রহ্মচারী আমাকে 'কিল' দেখাইয়া ধমক্ দিয়া বলিলেন—"মাথা ঝাঁকিস! মাথা ভেঙ্গে দেব! কথা বল্!" পরে ব্রহ্মচারী তাঁহার আসনের পাশে আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি

ঘরে গিয়া বসিলাম। ব্রহ্মচারী আমাকে কত কি উপদেশ দিয়া শেষকালে বলিলেন—"ওরে তুই তো নিত্য 'নোট্' লিখিস্? (ইহা কি প্রকারে ব্রহ্মচারী জানিলেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।) তাতে তোর সম্বন্ধে আমার দু'টো কথা লিখে রাখিস্।—'বিলাসিতা ত্যাগ কর্! বিদ্যা হবে না।' আচ্ছা, আমার এ কথার অর্থ কি বুঝ্লি বল্ তো?" আমি বলিলাম—'সকলপ্রকার সুখভোগ ত্যাগ করিতে বলিলেন; তা' হ'লেই ধর্ম্মে মতি হইবে, এবং ওরূপ হইলে লেখাপড়াও হইবে না।' ব্রহ্মচারী আবার ধমক্ দিয়া বলিলেন—"মূর্খ! আমি তাই বুঝি বলিলাম? অবিদ্যা কাকে বলে, বিদ্যা কাকে বলে—তাই তুই জানিস্ না? লেখাপড়া কর্‌বি না কেন? খুব গিয়া লেখা পড়া কর্। লেখাপড়া কর্‌লেই পাশ হবি। বিলাসিতা করিস্ না। পোষাক পরিস্ না। একখানা কাপড় একখানা চাদর মাত্র পরিস্। জুতার দরকার নাই—সাধারণমত এক জোড়া চটীজুতা মাত্র রাখ্‌তে পারিস্। পিরাণ গায়ে দিস্ না। মন খারাপ হ'লে এখানে এসে উপদেশ নিয়ে যাস্। আমাকে চিঠি লিখিস্। ধর্ম্ম কর্ম্ম সব হবে। অস্থির হ'স্ না। কোন ভয় নাই। একটা বেদনায় তুই খুব কষ্ট পাচ্ছিস্, না? কাছে আয়—আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি, এখনই সেরে যাবে।" আমি বলিলাম—'বেদনা সারায়ে দিবেন, এজন্য আমি আসি নাই। শুধু আপনাকে দর্শন কর্‌তে এসেছি। আমি স্বপ্নে আপনাকে ঠিক্ এইরূপই দেখেছিলাম।'

ব্রহ্মচারী। "স্বপ্নটি বল্ না?" আমি স্বপ্নটি বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—'স্বপ্নটি লিখে রাখিস্। তোর পথ তো স্বপ্নেই তোকে দেখায়েছি। তুই আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলি না কেন, বল্ তো?' আমি বলিলাম—'আমার ভবিষ্যতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত বিষয় আপনি নিজেহইতেই আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, গোস্বামী মহাশয় এরূপ বলিয়াছিলেন। নিজহইতে কোনও কথা বলিতে তিনিই আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাই, বলি নাই।' ব্রহ্মচারী এ কথার পর বলিলেন—"আচ্ছা, তোর সব কথা পেয়েছিস্ তো?" আমি বলিলাম 'হাঁ'। ব্রহ্মচারী।—"তবে যা। স্বপ্নটি 'নোটে' লিখিস্। বেদনা তোর প্রারব্ধের। হাত বুলা'য়ে দিলে সেরে যেতো বটে; কিন্তু আবার কখনও তা' ভোগ কর্‌তে হ'ত। ঔষধাদি কিছু খাস্ না; তাতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ভোগকাল শেষ হ'লে আপনাহ'তেই সেরে যাবে। (দাদাকে দেখাইয়া) ওদের ঔষধে কোন উপকারই হবে না। অসহ্য বোধ হ'লে, তাজা মাটি নিয়া ডলিস্; ক'মে যাবে।" আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। মধ্যাহ্নে

আহারান্তে আবার সকলে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মচারী তাঁহার জীবনের অনেক কথা বলিলেন। যতটা স্মরণ আছে, লিখিয়া রাখিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন—শান্তিপুরে বিশুদ্ধ 'অদ্বৈতবংশে' তাঁহার জন্ম। গোস্বামী মহাশয়ের প্রপিতামহের তিনি সহোদর ছিলেন। আত্মজীবন সম্পর্কে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমরা চারি সহোদর ছিলাম বলিয়া, আমার পিতামাতা আমার উপনয়নের পরেই আমাকে একটি ষট্‌চক্রভেদী সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি আমাকে দীক্ষা দান করিয়া সাধন শিক্ষা দিতে লাগিলেন; এবং বহুযত্নে নিয়ত আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। যৌবনাবস্থায় ক্রমে আমি যখন দুর্ব্বার রিপুর উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, গুরু তখন আমাকে লইয়া কোনও পাহাড়ের সন্নিকটে এক পল্লীতে গিয়া একটি কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে বিধির চক্রে আমার একটি সুন্দরী যুবতী জুটিয়া গেল। গুরু ভিক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমস্ত আনিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আমাকে রান্না করিয়া খাওয়াইতেন; আর সারাদিন কুটীর ছাড়িয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নানা ভাবে সেই যুবতীর সঙ্গে আমোদ করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। এই প্রকারে প্রায় তিন বৎসর আমার কাটিয়া গেল। ভোগের ফলে ঐ দিকে স্পৃহাও ক্রমে আমার কমিয়া আসিল। এই সময়ে সহসা একদিন আমার মনে হইল, 'এ কি কর্‌ছি? চিরকাল এই কর্‌তেই কি আমি বাপ-মা ছেড়ে মহাপুরুষের সঙ্গে এলাম?' ভিতরে তখন আমার ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হইল। আমি তখন অন্যত্র যাইতে গুরুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন তিনি আমার সে কথায় কাণই দিলেন না। পরে 'আজ যাই, কাল যাই' বলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। আমারও ক্রমেই অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। খুব জেদ করিয়া যখন গুরুকে ধরিলাম, তখন তিনি অসুস্থ বলিয়া ভাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিতরের অসহ্য জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, একদিন গুরুকে বলিলাম,—'আর আমি একটি দিনও এখানে থাকিব না।' গুরু বলিলেন—"শরীর বড় অসুস্থ। আর দুই দিন এখানে থাক।" আমি তখন হাতে মুদ্গর লইয়া গুরুর দিকে ছুটিলাম; বলিলাম—সারাদিন কুটীর ছেড়ে ঘুর্‌তে পার, রোজ রোজ ভিক্ষা ক'রে এনে নিজে রান্না ক'রে আমাকে খাওয়াতে পার, তখন তোমার কোন অসুখ থাকে না, আর এস্থান হ'তে যেতে বল্লেই অসুখ হয়! আজ তোমাকেও খুন কর্‌ব, নিজেও খুন হব।" গুরু দৌড়িয়া পলাইলেন। পরে আসিয়া বলিলেন,—"চল এবার ঠিক হয়েছে।"

পথ চলিতে চলিতে গুরুকে বলিলাম—'এত দিন আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই, আজ যে বড় শুনিলে?' গুরু বলিলেন—'এত দিন ত বাবা, তেমন করিয়া বল নাই।' 'তুমি ভোগকে ছাড়িয়াছিলে, কিন্তু ভোগ তোমাকে ছাড়ে নাই, আজ ছাড়িয়াছে।'

অতঃপর কোন এক নিভৃত পাহাড়ে লইয়া গিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল গুরু আমাকে হঠযোগ অভ্যাস করান। রাজযোগ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলে, গুরু আমার হঠযোগের পরীক্ষা নিলেন; বলিলেন—"তোমার উরুদ্বয়ের মধ্যে হাঁড়ি চাপাইয়া মিষ্টান্ন রান্না করিয়া, আমাকে খাওয়াইতে হইবে।" আমি তাহাই করিলাম। তারপরে রাজযোগের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রাজযোগে কৃতকার্য্য হইতে বহুকাল লাগিল। তৎপরে গুরু অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম—'আপনি নাকি একবার উদয়াচলে গিয়াছিলেন?' ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চেষ্টা ক'রেছিলাম কিন্তু যেতে পারি নাই। আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল—হিতলাল মিশ্র (ত্রৈলিঙ্গ স্বামী), বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক মহাত্মা, আবদুল গফুর নামে একজন মুসলমান ফকির। আমরা এই চারজনে সূর্য্যলোকে যাইব সঙ্কল্প করিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। হিমালয়ের উপর দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। আহার আমাদের ফলমূল মাত্র ছিল। বরফের উপর দিয়া এই ভাবে বহুকাল চলাতে শরীরের চর্ম্ম একরকম খড়্‌খ'ড়ে হইয়া গেল। পরে সাপের যেমন খোলস্ ওঠে, আমাদেরও সেইপ্রকার একটা খোলস্ উঠিয়া গেল, তখন শরীরটি ঠিক্ দুধের মত সাদা হইল। বরফের ঠাণ্ডা শরীরে লাগিত না। ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি যেখানে হয় আমরা সেস্থানও ছাড়াইয়া বহুদূরে গেলাম। সেখানে এখানের মত দিন রাত বা চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই।"

প্রশ্ন। কতকাল আপনারা ঐরূপ স্থানে চলিয়াছিলেন?

ব্রহ্মচারী। যেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, দিন রাত্রি কিছুই নাই, সেখানে সময় বা বৎসরের হিসাব পাইব কি উপায়ে? তবে, বহুকাল চ'লেছিলাম এই মাত্র বল্‌তে পারি।

প্রশ্ন। চন্দ্র সূর্য্য নাই, তবে পথ দেখিতেন কি প্রকারে?

ব্রহ্মচারী। ও সব স্থানে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চল্‌তে চল্‌তে চক্ষের উপাদানই অন্য প্রকার হইয়া গেল। চন্দ্র-সূর্য্যের আলো না থাক্‌লেও চক্ষে সমস্ত দেখ্‌তে পেতাম।

প্রশ্ন। আপনারা কি উদয়াচলে উঠেছিলেন?

ব্রহ্মচারী। আমরা সকলেই উঠেছিলাম। বেণীমাধব বেশীদূর উঠ্‌তে পার্‌লেন না। আবদুল গফুর বহুদূর উঠে ফিরে এলেন; আমিও তাই। হিতলাল মিশ্র কতদূর উঠেছিলেন জানি না। তাঁকেও নেবে আস্‌তে হ'ল।

প্রশ্ন। উঠ্‌তে পার্‌লেন না কেন ?

ব্রহ্মচারী। ঊর্দ্ধ দিকে বায়ু ক্রমেই হাল্‌কা। আমি যে স্থানে উঠেছিলাম সেখানকার বাতাস অতিশয় হাল্‌কা, স্থির; বাতাসের তরঙ্গ সেখানে নাই। কাজেই শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। শুনিলাম হিতলাল মিশ্র আরও খানিক উঠে বাতাস না পেয়ে নাব্‌লেন।

প্রশ্ন। সে সব মহাত্মারা এখন কোথায় আছেন।

ব্রহ্মচারী। তখন আবদুল গফুর মক্কাতে গেলেন; এখনও তিনি জীবিত। বেণীমাধব চন্দ্রনাথের পাহাড়ে গিয়েছিলেন। আমি নীচে এসে দু'বার মক্কায় এবং এশিয়া ইউরোপের বহুস্থানে ঘুরে চন্দ্রনাথ যেতেছিলাম, রাস্তায় আমাকে পুলিশে ধর্‌ল। তার পর এখানে।

প্রশ্ন। আপনাকে পুলিশে ধ'রেছিল কেন ?

ব্রহ্মচারী। কামাখ্যা (গৌহাটী) সহরের 'ম্যাজিষ্টার' সাহেব কয়েকটি সাধুর জটার ভিতরে টাকা মোহর পেয়ে, চোর অনুমানে তাঁদের জেলে আটক রাখেন। জটাধারী পেলেই তাকে ধর্‌বার জন্য পুলিশের উপর হুকুম হ'ল। আমার জটা ছিল, তাই আমাকেও ধর্‌লেন। সাহেব আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; আমি উত্তর দিতে পার্‌লাম না। শাকসবজী বহুকাল খেয়ে এবং অনাহারে বহুকাল থেকে জিহ্বা অন্যপ্রকার হ'য়ে গিয়েছিল, বাক্‌শক্তি ছিল না, কথা বল্‌তে পার্‌তাম না। 'ম্যাজিষ্টার' সাহেবের দিকে একটু তাকাতেই তাঁর একটা ভক্তি হ'ল—আমাকে ছেড়ে দিতে বল্‌লেন। 'অন্যান্য সাধুদের না ছাড়্‌লে আমিও জেলে থাক্‌ব,' ইঙ্গিতে জানালাম; সাহেবের দয়া হ'ল। তিনি আমার মনস্তুষ্টির জন্য আর সকলকেও ছেড়ে দিলেন। পরে আমরা সকলে চন্দ্রনাথ চল্‌লাম। এখানকার একটি ভদ্রলোক পথে আমার খুব সেবা কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনিই আমাকে রাস্তা ঘুরা'য়ে বারদীতে নিয়ে এলেন। আমি এখানে এসে, সাধারণ লোকের মত, পাগলের মত থাক্‌তাম। একটি ১০।১২ বৎসরের বালিকা নিত্য আমাকে কিছু কিছু খাবার এনে দিত, আমি তা কিছুই খেতে পার্‌তাম না। পরে সেই মেয়েটিই একটু একটু দুগ্ধ, পরে মোহনভোগ, তার পর ক্রমে আরও শক্ত শক্ত জিনিস খাওয়াতে আরম্ভ করে। এই সময়ে আমার রক্তের রঙ লাল হ'তেছে দেখ্‌লাম—এতদিন ঘাসের রসের মত ছিল। ক্রমে ক্রমে কথাও ফুট্‌লো। পরে, প্রারব্ধ কর্ম্মটুকু শেষ কর্‌তে অনেক কাণ্ড করেছি। "নাস্তা" খেয়ে মুসলমান চাষীদের সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে ক্ষেত নিড়া'য়েছি; কান্ধে বাঁশ নিয়ে সারারাত জেগে শূকর তাড়া'য়েছি। বহুকাল আমি এইভাবে কাটা'য়েছি; কেহই আমার পরিচয় পায় নাই।

শেষকালে জীবনকৃষ্ণই আমাকে মহাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'রে সর্ব্বনাশ কর্‌বার যোগাড় করছে! এখন দিন-রাত এখানে লোকের ভিড়। একটু স্থির হ'তে পারি না।

মেজ দাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তবে কি কর্‌ব?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"পূজা।" প্রশ্ন। "কি পূজা?" উত্তরে ব্রহ্মচারী মহাশয় অঙ্গুলিদ্বারা একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া কহিলেন, "এই, বুঝ্‌লে না?" মেজ দাদা—"না; শালগ্রাম?" ব্রহ্মচারী।—"না; টাকা, টাকা। অর্থ উপার্জ্জন কর, আর ভোগ ক'রে কর্ম্ম শেষ কর।" মেজ দাদা একথার উত্তরে বলিলেন—"আমরা তো পড়েছি 'ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োঽএবাভিবর্দ্ধতে॥" একথা শুনিয়া, ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, ইহার বাঙ্‌লা কর তো।" মেজ দাদা—"কাম কখনও কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় না; অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন বাড়িয়া যায় তদ্রূপ আরও বৃদ্ধি পায়।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি তো ভোগ করেই কর্ম্ম শেষ কর্‌তে বলেছি উপভোগের কথা তো বলি নাই। ভোগ আর উপভোগে পার্থক্য আছে, যেমন পতি আর উপপতি! শাস্ত্র-বিধি অতিক্রম ক'রে স্বেচ্ছাচারে যাহা করা যায় তাহাই উপভোগ, তাতে শান্তি হয় না; বিধিপূর্ব্বক ভোগে হয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য লোক লোকান্তরে মানুষের গতিবিধির কোনও পথ আছে কি?"

ব্রহ্মচারী। "পথ একটা না থাকিলে সে সব স্থানে লোক যাতায়াত কর্‌লে কি ক'রে? যাতায়াত ক'রে দেখে শুনে না এলে সেসকল লোক সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ক'রে বল্‌লেই বা কি প্রকারে? বহু ঋষি মুনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক রকমই তো ব'লে গেছেন! কোন্ লোক কিপ্রকার; কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ; কোন্ লোকে কত পাহাড়, কত নদী; এমন কি—বড় বড় রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পর্য্যন্ত র'য়েছে। সে সব স্থানের অধিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, তাহাদের কার্য্যকলাপ সমস্তই তো বিস্তারিতরূপে লিখে গেছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের পরিষ্কার পথ আছে। বহুসংখ্যক মণি যেমন একসূত্রে মালার আকারে গাঁথা থাকে, তদ্রূপ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমস্ত লোক পর পর শিকলে গাঁথার ন্যায় সংহত র'য়েছে। তবে সকল শরীরেই তো সকল স্থানে যাতায়াত সম্ভব নয়? দেহটিকে স্থানের ও পথের উপযোগী ক'রে নিতে হয়। তা নইলে হয় না।" প্রশ্ন করিলাম—"এই উপযোগী দেহ কিপ্রকারে প্রস্তুত হয়?"

ব্রহ্মচারী। "যোগাভ্যাস দ্বারা। যোগ-ক্রিয়াতে মানুষ ইচ্ছানুরূপ দেহ পরিগ্রহ কর্‌তে

পারে। সেসব স্থানে যেতে হ'লে কোথাও জল-প্রবেশোপযোগী দেহ, কোথাও বায়বীয় দেহ, কোথাও তৈজস দেহ আবশ্যক হয়।"

প্রশ্ন। সেসব দেহে কি রক্ত, মাংস, হাড়, মজ্জা থাকে না?

ব্রহ্মচারী। তা থাক্‌বে না কেন? সেই দেহের প্রধানভূতানুরূপ সমস্তই থাকে।

প্রশ্ন। আমরা তো এই পৃথিবীতেই সর্ব্বস্থানে যেতে পারি না।

ব্রহ্মচারী। পৃথিবীর তো দূরের কথা, ভারতবর্ষেরই সবস্থানে যেতে পারিস্ না। পাশ্চাত্য ভূগোল প'ড়ে, সেই সংস্কারমত পৃথিবীকে যে তোরা বড়ই ছোট ক'রে ফেল্‌ছিস্! সপ্তদ্বীপা পৃথিবী! তার এক দ্বীপের খবরও তো কেহ জানে না। এক একটা দ্বীপে সাতটা করে বর্ষ, তারও বিন্দু-বিসর্গ কেহ এখনও বিশ্বাস করে না। জম্বুদ্বীপের যে সাতটা বর্ষ, তার এক এই ভারতবর্ষকেই এখন তোরা পৃথিবী ব'লে জানিস্। লোহিতসাগর, কৃষ্ণ-সাগর, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, চীন, পারস্য, আরবাদি সমস্তইতো প্রাচীন ভূগোলমতে এক ভারতবর্ষের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের পর কিংপুরুষবর্ষেরই তো আজপর্য্যন্ত কারও কোনও খোঁজ নাই। সে দেশের লোকের মুখ ঘোড়ার মত। সেখানকার বিবরণ কয়জন এসে বল্‌তে পেরেছে?

আমি। গোল পৃথিবীকে তো শত শতবার মানুষ জাহাজে চ'ড়ে পরিক্রমা করে এসেছে। তাদের চোখে তো এসব পড়ে নাই?

ব্রহ্মচারী। ওঃ! ওরে, পৃথিবী গোল কে বল্‌লে? সেসব স্থানে জাহাজ নিয়ে যাবে কি ক'রে, পূর্ব্ব-পশ্চিমেই গোল, তাই ঘুরে আসে। আর উত্তর-দক্ষিণের পার কি কেহ পেয়েছে? ঐ দু' দিকের খবর কেহ বল্‌তে পারে?

প্রশ্ন। তবে এ পৃথিবী কি গোল নয়?

ব্রহ্মচারী। গোল নয় কেন? পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোল; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে শঙ্খাকৃতির মালার মত, পরে-পরে সাতটি! প্রথমটি হ'তে দ্বিতীয়টি দ্বিগুণ, এইপ্রকারে ক্রমান্বয়ে বড়; এইরূপ সাতটিকে একসূত্রে গাঁথ্‌লে যেমনটি হয়, পৃথিবী অনেকটা সেইমত। সপ্তদ্বীপের মধ্যে লবণ বেষ্টিত যে দ্বীপ তাহাই জম্বুদ্বীপ। তার পরে প্লক্ষ-দ্বীপ। এই প্রকার ক্রমান্বয়ে সাতটি পরে পরে সংলগ্ন আছে। এখন মানুষে সেসব বিশ্বাস কর্‌বে কি ক'রে? দেখে নাই তো! কিন্তু যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা দ্বীপের অন্তর্গত পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী-প্রভৃতির পরিমাণ ও বিস্তৃত বিবরণ পরিষ্কার রূপেই লিখে গেছেন!

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটহইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে দাদাকে আবার তিনি

গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা-গ্রহণের কথা বলিলেন। দাদাও অতঃপর দীক্ষা-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া, অবিলম্বেই ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমরা অগৌণে ঢাকা রওনা হইলাম। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় বুঝি না। ঢাকায় পৌঁছিয়া শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় ২।৩ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। দাদার ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম। দাদার অবকাশ কাল উত্তীর্ণ হইল। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থান অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন। দীক্ষা আর হইল না!

আমার দৈহিক দুরবস্থা ও মানসিক দুর্গতি।

আমি কফাশ্রিত-বায়ু ও পিত্ত-শূল বেদনার চিকিৎসায় বহুকাল বাড়ীতে কাটাইলাম। বাড়ীতে ভাল কবিরাজ রাখিয়া সোণা, রূপা, মুক্তা ইত্যাদি যথারীতি জারিত করিয়া, প্রচুর অর্থব্যয়ে ঔষধাদি প্রস্তুত করাইলাম। 'বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র', 'বৃহৎ বাতচিন্তামণি', 'ধাত্রীলৌহ', 'নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস', 'ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি' প্রভৃতি বটিকা এবং 'মহাচৈতসাদি ঘৃত' বহুকাল ধরিয়া সেবন ও ব্যবহার করিলাম; 'কুব্জপ্রসারিণী', 'শূলগজেন্দ্র', 'ত্রিশুতি-প্রসারিণী', 'পুষ্পরাজ-প্রসারিণী'—এই সকল তৈলেরও যথেষ্ট প্রয়োগ হইল। কিন্তু রোগের বিন্দুমাত্রও উপশম হইল না; বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগের সেই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রফুল্লতাও ক্রমে হ্রাস পাইল এবং, তেজস্কর ঔষধ সেবনে ও নিয়ত তৈলাদি মর্দ্দনেই বোধ হয়, এ সময়ে আমার শারীরিক নিস্তেজ রিপুসমূহেরও পুনরাবির্ভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু, সাধন ভজনে কখন কখন বিশেষত্ব উপলব্ধি হওয়ায়, ঐ সকল দুরবস্থাকে আমি গণনার ভিতরেই আনিলাম না। ভাবিলাম—রিপু-দমন, ইহা তো যে কোন অবস্থায় আমারই ইচ্ছাধীন! নিজের উপরে এইরূপ অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়ায়, সাধারণ বিধিনিষেধেও আমার শৈথিল্য আসিয়া পড়িল। পরে দুইটি ঘটনাতে ক্রমে আমাকে একেবারেই রসাতলে ডুবাইবার উপক্রম করিল। ঘটনা দুইটি এই—

বাড়ীর অনতিদূরে ভিক্ষোপজীবিনী হীনজাতীয়া একটি বৈষ্ণবী অর্থলাভমানসে একটি ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে জুটাইয়া আনিয়াছে। কোনও অবস্থাপন্ন যুবক তাহাকে 'রক্ষিতা' রূপে রাখিয়াছে। পাড়ার মধ্যেই এরূপ বেশ্যার বাস জানিয়া, আমার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল; অবিলম্বে একজন বলিষ্ঠ 'সর্দ্দার'কে (লাঠিয়ালকে) লইয়া উহাদিগকে যথোচিত শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ইঙ্গিতমাত্র সর্দ্দার লাঠি মারিয়া উহাদের উভয়ের পা ভাঙ্গিয়া খোঁড়া

করিয়া ফেলিবে এই হুকুম দিয়া, সন্ধ্যার পরে আমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সর্দ্দার একটু অন্তরালে রহিল, আমার প্রবেশমাত্র সেই বৈষ্ণবী মেয়েটিকে কি যেন ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়িল। আমি বাবুটির অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া রহিলাম। তখন ধীরে ধীরে মেয়েটি আসিয়া আমার সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করিল। কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য আমি উহার কথায় 'হুঁ হুঁ' দিয়া যাইতে লাগিলাম; মনে মনে স্থির করিলাম, কোনরূপ কুভাব ব্যক্ত করিলেই 'সর্দ্দার' ডাকিয়া উহাকে 'বেদম' প্রহার লাগাইব। মেয়েটি নানাপ্রকার হাবভাবে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখাইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে দু'এক পা অগ্রসর হইয়া, আমাকে একেবারে ধরিয়া ফেলিল এবং অনায়াসে টানিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিল। তাহার স্পর্শমাত্র আমার সমস্ত তেজস্বিতা, এমন কি—বিচার-বুদ্ধি পর্য্যন্ত, বিলুপ্ত হইল; মন সহসা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল; আমি যেন 'ভেড়া' হইয়া গেলাম। পরে উহার ঘরের দরজাপর্য্যন্ত যাইয়া 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কা'ল আসিব' বলিয়া কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করাতে সে আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি অমনই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া, মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়াই 'আছাড়' খাইয়া পড়িলাম; পায়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল! সর্দ্দার আমাকে কান্ধে তুলিয়া লইয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিল। পরদিন প্রাতে গ্রামের সব সমবয়স্কদের লইয়া যুক্তি করিলাম, রাত্রেই উহার ঘরে আগুন ধরাইব। বৈষ্ণবী, লোকপরম্পরায় আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, ঐদিনই আসিয়া, আমার পায়ে পড়িয়া, কান্দিয়া বলিল, "আর তিনটি দিন শুধু আমাকে সময় দিন; আমি এগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।" কার্য্যেও সে তাহাই করিল।

এই ঘটনাটিতে আমার মানসিক অবস্থা আর একপ্রকার হইয়া পড়িল। যদিও ইহাদিগকে কর্কশভাষাপ্রয়োগপূর্ব্বক গ্রামহইতে তাড়াইয়া দিলাম; তবু সেই কুলটার স্পর্শজনিত সুখের স্মৃতি একদিনের জন্যও মনহইতে দূর করিতে পারিলাম না। ঐভাবে যুবতীর অঙ্গস্পর্শ এজীবনে আমার আর কখনও ঘটে নাই। এখন এই স্পর্শসুখ আমার সাধন-ভজন অপেক্ষাও মধুর বোধ হইতে লাগিল। সর্ব্বদাই উহার বাহুবেষ্টিত আলিঙ্গন অন্তরে উদিত হইয়া বর্ত্তমানের ন্যায় আমাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। আমি সাধন ভজনে অন্যমনস্ক হইয়া, নিয়ত উহাই কল্পনা করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে, আবার আর একটি বিষম প্রলোভন উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে একটি পিতৃমাতৃহীনা, বয়স্থা কুলীন-কুমারী আমাদের সংসারে রহিয়াছেন; ভবিষ্যতে তাঁহাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবার মানসে বর্ত্তমান রুচি অনুসারে তাঁহার অভিভাবকেরা

লেখা-পড়া শিখাইতে ইচ্ছা করিলেন, আমার বাড়ীতে থাকার সময় হইতেই তাঁহারা ঐ ভার আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন। মেয়েটি খুব নিপুণতার সহিত সারাদিন গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিশেষ শ্রদ্ধা-যত্নসহকারে আমার রোগের সেবা করিতে লাগিল; সমস্ত দিন অনবকাশবশতঃ রাত্রি ন'টা দশটার সময়ে আমার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত থাকিলেও, মেয়েটি আমার নির্জ্জন ঘরে বিছানার এক পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিত। উহার সেবাতে শ্রদ্ধা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, লেখা-পড়ায় উৎসাহ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া, দিন দিন আমি উহাকে অধিকতর ভালবাসিতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরহইতে শিকার-হারা কুকুরের মত আমার অবস্থা দাঁড়াইল। আমি অদম্য কামের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে ঐ কুমারীর ফুটন্ত যৌবনের সৌন্দর্য্যে আমার শিথিল চিত্ত দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি ভীষণ দুরবস্থার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম; কিন্তু, মোহবশতঃ, উহাকে পড়াশুনা করাইতে ক্ষান্ত হইলাম না। নিস্তব্ধ নিশীথে সকলে নিদ্রায় অচেতন, এদিকে আমি নির্জ্জন ঘরে কামের উত্তেজনায় ছটফট করিতেছি। বিচার-বুদ্ধি, চেষ্টা সকলই আমার প্রবৃত্তির অনুকূলে সাহায্য করিতে উন্মুখ। পার্শ্বে নবযৌবনা, সুন্দরী কুমারী, কখন উপবিষ্টা কখন বা অর্দ্ধশয়িতা অবস্থায় আমারই বিছানার উপরে রহিয়াছে। সময়ে সময়ে তাহাকে স্পর্শও করিতেছি! এ অবস্থাও একদিন দু'দিনের জন্য নয়; আমি আর স্থির থাকিব কিরূপে? অনুকূল অবস্থা আমার অধীর চিত্তকে ধীরে ধীরে আরও প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, আমি হাবেভাবে নানারূপে অতি সতর্কতার সহিত নিজ দুরভিসন্ধি উহাকে জানাইতে লাগিলাম। মেয়েটি, আমার মর্য্যাদারক্ষাপূর্ব্বক, আমার ভাবে অনাদর দেখাইয়া, আমাকে সতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে আমাকে 'নাছোড়বান্দা' বুঝিয়া একদিন আমার পায়ে পড়িয়া কান্দিয়া বলিল—"আপনি আমাকে পরীক্ষা কর্‌ছেন কেন? আমি এতে বড় ভয় পাই। আপনি যোগ সাধন করেন, আপনার মন কখনই খারাপ হইতে পারে না; শুধু আমাকে পরীক্ষা করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আমায় রক্ষা না করলে এ অবস্থায় আমার আর উপায় কি বলুন?" উহার পরিষ্কার কথা শুনিয়া আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। এক দিকে ভিতরে আমার অদম্য কামের উত্তেজনা, সম্মুখে আমার আয়ত্তাধীনে সুন্দরী যুবতী; অপর দিকে বাহিরে আমার ধার্ম্মিকতার ভাণ, 'সকলে আমাকে যোগ-সাধক বলিয়া মানুক' এই বাসনা, বিশেষতঃ যে আমাকে চরিত্রবান্ মহাসাধু বলিয়া শ্রদ্ধা করে তাহারই নিকটে কি প্রকারে আমি মর্য্যাদাশূন্য হই এই চিন্তা। এই অবস্থায়

পড়িয়া আমি সঙ্কল্পিত অধ্যবসায়হইতে বিরত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কামাগ্নি নিস্তেজ হইল না, বরং, অহরহঃ সজনে নির্জ্জনে উহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে যখন বুঝিলাম, আমার ভিতরের অগ্নি ধীরে ধীরে উহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে, এবার আর রক্ষা নাই, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, মানের দায়ে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ঢাকা পলাইলাম, সকলে মনে করিল রোগ কতকটা উপশম হইয়াছে। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

ভিতরের দুরবস্থা গোপন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিতে লাগিলাম। একদিন তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় বলিলেন—"এবার যোগাবলম্বীদের ভিতরে যার যে ছিদ্র আছে প্রকাশ হ'য়ে পড়্বে, সময় অতি ভয়ানক।" এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম, খুব সাবধানতার সহিত চলিতে লাগিলাম।

গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা চলিলেন। এই সময়ে ঢাকাতে গোঁসাইশিষ্যদের নানাপ্রকার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। পরস্পরে ঝগড়া-ঝাঁটি, শত্রুতা, হাতাহাতি, এমন কি—চরিত্রহীনতা এবং গুরুদ্রোহিতা পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। আমি এসব দেখিয়া শুনিয়া খুব সতর্কতার সহিত নূতন উদ্যমে প্রাণপণে সাধন আরম্ভ করিলাম।

স্থিরোজ্জ্বলজ্যোতির্ম্মণ্ডল-দর্শন।

কিছুকাল যাবৎ সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে সাধন ভজন করিয়া আসিতেছি। শেষ রাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাদের উপরে গিয়া পূর্ব্বমুখে আসন করিয়া বসি। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম ও একান্ত মনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটি সহস্রবার জপ করি; তৎপরে প্রাণায়াম ও ইষ্টনাম যথামত ঘণ্টাধিককাল করিয়া থাকি। ৮।১০ দিন হইল একদিন ধীরে ধীরে আমার ললাটদেশ কম্পিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব জ্যোতির মনোহর সৌন্দর্য্যের এককণাও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! ইহাকে চন্দ্র কি সূর্য্য বলে, তাহা জানি না। ললাটের ভিতরে বা বাহিরে—নীল আকাশে, বহুদূরে, চন্দ্র-সূর্য্যাকৃতি স্নিগ্ধ, অত্যুজ্জ্বল, শ্বেত জ্যোতি দর্শন করিতেছি! স্থির জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যস্থলে, ক্ষীণ তরঙ্গাকার উজ্জ্বল ঝিকিমিকির ছটায় এক এক সময়ে আমি দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি। অবিরাম অষ্টপ্রহরই এই জ্যোতি আমার চক্ষে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্য দেখিতেছি! যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায়, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই জ্যোতি একই প্রকারে প্রকাশমান! চক্ষু বুজিয়া বা মেলিয়া

এই জ্যোতি একই রকম দেখিতেছি। চন্দ্রকিরণের ন্যায় এই জ্যোতির রশ্মি শীতল, শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় উজ্জ্বল, এবং তদপেক্ষা অতীব মনোহর ও নির্ম্মল!

ইহার প্রথম দর্শনের সময়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন নিয়ত দেখাতে তাহা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই জ্যোতি একটু তরঙ্গায়িত ছিল; এখন চন্দ্রমার ন্যায় স্থির দেখিতেছি। এই জ্যোতি কোথায় যে দর্শন করিতেছি তাহা বহু অনুসন্ধানেও ঠিক করিতে পারিতেছি না। যখন চক্ষু মেলিয়া থাকি তখন দেখি বাহিরের আকাশে, ললাটের উপরে, ঊর্দ্ধদিকে; যখন চক্ষু মুদিয়া রাখি, মনে হয়, কপালেরই মধ্যে নীলবর্ণ বিস্তৃত আকাশের মধ্যভাগে। এই জ্যোতি একই প্রকারে প্রকাশিত থাকায়, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে, বাহিরের কার্য্য ছাড়িয়া নামে ও গুরুতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে, ইহার মাধুর্য্যে আরও অভিভূত হইয়া পড়ি। গুরুর স্মৃতিতে জ্যোতির অপূর্ব্ব ছটা স্তরে স্তরে বিকীর্ণ হইয়া সময়ে সময়ে আমাকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতেছে। গোঁসাইয়ের রূপ-ধ্যানে, এই জ্যোতির সৌন্দর্য্য এবং মনোহারিত্ব কেন যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহা বুঝিতেছি না। এখন এ অবস্থাটি আমার আয়ত্বাধীন ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।

জ্যোতিহারা।

২৯শে শ্রাবণ,
১২৯৫;
রবিবার।

হায়! হায়!! আজ দু'দিন হয় আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! দুরদৃষ্টবশতঃ অকস্মাৎ অজ্ঞাত একটি অপরাধে পড়িয়া আমার অতুল আনন্দের অবস্থা হারাইয়াছি! এখন আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি! শুষ্ক মরুভূমি-তুল্য উত্তপ্ত অন্তরে, থাকিয়া থাকিয়া, সেই জ্যোতির স্মৃতি প্রত্যক্ষ অগ্নির ন্যায় আমার প্রাণটিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। যে অপরাধে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল তাহা পরিষ্কাররূপে লিখিয়া রাখিতেছি।

শূদ্রবংশোদ্ভবা একটি সুন্দরী বিধবা, আপদে বিপদে সর্ব্বদা সাহায্যকারিণী থাকিয়া, আমাদের বিশেষ আত্মীয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি সে রক্ষকাভাবে নিতান্ত অসহায়া এবং জীবিকানির্ব্বাহের ভবিষ্যচ্চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া সে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার বড় দয়া হইল। অবিলম্বে আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সন্ধ্যার সময়ে নির্জ্জন গৃহে সে আমাকে একাকী পাইয়া হাতে ধরিয়া তাহার

শয্যায় বসাইল। একটু পরে আমার বাম পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া অস্বাভাবিকরূপে আমাকে আদর করিতে লাগিল। উহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, দৃষ্টি লোলুপ ও অস্থির—সর্ব্বাঙ্গ দক্ষিণে বামে ঘন ঘন হেলাইয়া পড়িতেছে; ইহা দেখিয়াই আমার কামের উত্তেজনা আসিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে, অবিরাম যে জ্যোতি আমার নিকটে সমভাবে স্থিররূপে প্রকাশমান ছিল, অকস্মাৎ দেখি সেই জ্যোতি থর্-থর্ কাঁপিতেছে। আমি অমনি উহার শয্যা ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। যুবতীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আমাকে ধরিল এবং পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি 'ছাড়, ছাড়' বলিয়া সজোরে সরিয়া পড়িলাম। তখন বস্ত্রে উহার 'অশুচির' লক্ষণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ কি?' যুবতী পরিচয় দিল; আমি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝিলাম আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল; নামমাত্র বিন্দুপাতে পূর্ণ ইন্দু অস্তমিত হইল! দু'তিন মিনিটের মধ্যেই, তরঙ্গায়িত জলাশয়ে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের ন্যায় চঞ্চল হইয়া, আমার স্থির উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডল ধীরে ধীরে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেমন কর্ম্ম তেমনিই ফল! হায়, হায়, এখন আমি কি করিব?

পতিত জনে অযাচিত দয়া।

৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৫।

গোস্বামী মহাশয় অদ্য ঢাকায় পহুছিবেন, সংবাদ পাইলাম। তাঁহাকে আনিবার জন্য কতিপয় গুরুভ্রাতাকে লইয়া 'দোলাইগঞ্জ' ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া সকলের পশ্চাতে সঙ্কুচিত মনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। না জানি গোস্বামী মহাশয় আমাকে কি বলিবেন, প্রতিক্ষণে ইহাই মনে হইতে লাগিল। এ দিকে আর একটি গুরুভ্রাতাও কোন একটি স্ত্রীলোকের সংসর্গে স্খলিত হইয়া গুরুভ্রাতাদের নিকট বিশেষরূপে অপদস্থ হইয়াছেন। সকলে তাঁহার নিন্দা কুৎসা রটনা করিয়া একরূপ তাঁহাকে একঘরেই করিয়া রাখিয়াছেন। লজ্জায় ও অনুতাপে ম্রিয়মাণ হইয়া, তিনি সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপন গৃহেই অতি গোপনে একাকী দিন রাত কাটাইতেছেন। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইবেন না—এই ক্লেশে তিনি আজ ঘরে বসিয়া কান্দিতেছেন।

সন্ধ্যার সময়ে গোস্বামী মহাশয়, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। গাড়ীর ভিতর হইতেই গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি আমাকেও দেখিতে পাইলেন। সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ

গুরুভ্রাতারা গোস্বামী মহাশয়ের গাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি কুলদা এসেছ? বেশ, বেশ! তোমরা সকলে বাসায় যাও—আমি ফুলবেড়ে ষ্টেশনে নেবে যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি এমনি সস্নেহ-দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে তাকাইলেন যে, আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল! অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গোঁসাই ফুলবেড়ে (ঢাকা) ষ্টেশনে গিয়া নামিলেন। দোলাইগঞ্জে না নামিয়া, প্রায় একঘণ্টার পথ তফাতে ঢাকা ষ্টেশনে গোস্বামী মহাশয় কেন গেলেন, কেহই কিছু বুঝিলাম না।

গোঁসাই ঢাকা ষ্টেশনে নামিয়া, গুরুভ্রাতৃগণের নিকটে নিন্দিত, অনুতপ্ত, সেই গুরুভ্রাতাটির বাসায় পৌঁছিলেন। বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ছিল। পুনঃপুনঃ ঘা দেওয়ায় সেই ভদ্রলোকটি আসিয়া যেমনই দরজা খুলিলেন, গোস্বামী মহাশয় অমনই তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তুমি আমার নিকট যাবে না, তাই আমি ষ্টেশনে নেবেই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি। গুরুভ্রাতাটি কান্দিতে কান্দিতে পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে যাঁহাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া দূরে রাখিয়াছিল, গোঁসাই ঢাকায় পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই আলিঙ্গন দিয়া আসিলেন! এই ব্যাপারে আমি বড়ই ভরসা পাইলাম ও ঠাণ্ডা হইলাম।

বিচিত্র স্বপ্ন—পথপ্রদর্শন।

আজ মধ্যাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। দেখিলাম আমতলায় তিনি ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। দূরহইতে নমস্কার করা মাত্রই, তিনি চোখ্ মেলিয়া চাহিলেন এবং আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি 'ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়াছিলাম' ধীরে ধীরে জানাইয়া, বলিলাম—ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপদেশমত দাদা আপনাকে দেখিতে ঢাকায় আসিয়াছিলেন; আপনি তখন এখানে ছিলেন না। দাদা যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন—যদি আপনি পশ্চিমে যান, দয়া করিয়া একবার দাদার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার অনেক বলিবার আছে।

গোঁসাই। শরীর সম্প্রতি বড় কাতর। সুস্থ হ'লে, একবার যাবার ইচ্ছা আছে। তখন তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময়ে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গোস্বামী মহাশয় বিস্তারিতরূপে জানিতে চাহিলেন। দাদা ও মেজ দাদার সব কথা বলিয়া, পরে আমার

কথা সমস্তই আদ্যোপান্ত পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। গোঁসাই শুনিয়া বলিলেন— "বিদ্যা হবে না" ইত্যাদি যে সব কথা তিনি লিখে রাখ্‌তে ব'লেছেন, তা লিখে রেখো। ওঁদের কথা বুঝা বড় কঠিন। যা তোমাকে ব'লেছি তাই ক'রে যাও। আমি তো আছি; পরে যা কর্‌তে হবে আমিই ব'লে দিব। ব্যস্ত হইও না। স্বপ্নটি বল ত?

আমি আমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলাম—"দেখিলাম, বেলা অবসান-প্রায়, আপনি অকস্মাৎ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর সময় নাই, এখনই চল।' বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও আপনার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ও (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারী মহাশয়, তৎপরে আপনি, তারপর তারাকান্ত দাদা, এবং সকলের পশ্চাতে আমি চলিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় আগে আগে যাইতেছেন অনুভব হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম না। অন্ধকারে কাহারও সঙ্গে চলিলে তাহার একটা সত্তা যেমন অনুভবে আসে, ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও আমার সেইরূপ জ্ঞান হইতেছিল। পথে চলিতে চলিতে কিছুদূরে গিয়া, বহুদূরে একটা ভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিতে পাইলাম। উহা দেখিয়াই ভয় হইতে লাগিল। কিন্তু যতই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, সবুজবর্ণ, নীলবর্ণ, ঘন ঘন বৃক্ষের শোভায় ততই আনন্দ হইতে লাগিল। বনের খুব সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখি, ওটি শুধু বন নহে—প্রকাণ্ড একটি পাহাড়। আমরা উহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্রহ্মচারী পথ ধরিয়া নিজের মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন; আপনি দণ্ডদ্বারা কাঁটা সরাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে করিতে চলিলেন। তারাকান্ত দাদা সশঙ্কিত মনে এপাশ ওপাশ দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। আমি আপনার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা বহু উচু নীচু স্থানে ওঠা নামা করিয়া, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটা সমতল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আপনি আমাকে একটি স্থানে লইয়া গিয়া তিনখানা আসন দেখাইলেন। আসন তিনখানার চারিদিকে বহু পুরাতন, বড় বড়, ঝাঁপ্‌ড়া গাছ; স্থানটি কতকটা অন্ধকারের মত, বৃক্ষচ্ছায়ায় আবৃত। আসন তিনটিই গৈরিক রংএর লাল প্রস্তরে প্রস্তুত ও চতুষ্কোণ—পূর্ব্বমুখে পাতা রহিয়াছে, দেখিলাম। আসন তিনখানি ১, ২, ৩ অঙ্কদ্বারা চিহ্নিত। '৩' চিহ্নিত আসনটি দেখাইয়া আপনি আমাকে বলিলেন—এই তোমার আসন। এখানে ব'সে কিছুকাল সাধন কর্‌তে হবে। আসনে ব'সো।—

চিহ্নিত আসনটিতে আপনি বসিয়া পড়িলেন। '১' চিহ্নিত আসনটি 'খালি'

রহিল। কিছুকাল ওখানে বসিয়া আমি সাধন করিলাম। পরে আপনি উঠিয়া বলিলেন— আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল। তখন আমরা চারিজনেই আবার পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে চলিতে লাগিলাম। উঁচু নীচু স্থানগুলি জঙ্গলময় ও কণ্টকাবৃত থাকায়, পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; স্থানে স্থানে হোঁচট্ লাগায়, দুই তিনবার আছাড়ও খাইলাম। আপনি তখন দুর্গম সঙ্কীর্ণ রাস্তার সঙ্কট আমাকে সঙ্কেতে জানাইয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পুনঃপুনঃ আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'খুব সতর্কতার সহিত, ধীরে ধীরে পা ফেলে আমার পেছনে পেছনে এস।' বহুক্লেশে অনেক দূর চলিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। ঘন ঘন সবুজ বৃক্ষ সকলের পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের তেজ আসিয়া পড়িতেছে দেখিলাম। আমরা সেই রশ্মি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আপনি এক একবার মুখ ফিরাইয়া আমার পানে পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া খুব ভরসা দিতে লাগিলেন। তাহাতে আমার মনে হইতে লাগিল, সাম্‌নে উৎপাত আছে। আমরা যে অরণ্যে ছিলাম তাহাহইতে ঐ জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র দ্বার; অতিশয় অপ্রশস্ত। সমস্তটি রাজ্য ঘন কণ্টক-বেড়াদ্বারা বেষ্টিত। আমরা খুব উৎসাহের সহিত ঐ দ্বারের দিকে চলিলাম; দ্বারের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি, একটা ভয়ঙ্কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, লম্বা সর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত তেজের সহিত ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে আসিল। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সর্পটি ফণা ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; অমনিই আবার ফণা নামাইয়া সোঁ সোঁ শব্দে আপনার দিকে ছুটিল। আপনি কিন্তু ওদিকে একেবারেই গ্রাহ্য করিলেন না। পশ্চাৎ দিকে আমার পানে চাহিয়া, "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। সর্পটিও আপনার নিকট ফণা সঙ্কোচ করিয়া তারাকান্ত দাদাকে লক্ষ্য করিয়া চলিল। তাঁর হাতে মোটা লাঠি ছিল। তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া সর্পটিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্পটিও তাঁহার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিল। উনি যতই আঘাত করিতে লাগিলেন, সর্পটি উঁহাকে ততই বেষ্টন করিতে লাগিল। আপনি তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মেরো না, মেরো না, থাম, থাম। মেরে ওকে ছাড়াতে পার্‌বে না। ওকে না মার্‌লে ও কখনও কাম্‌ড়াবে না।" আপনার কথায় তারাকান্ত দাদা স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভয়ে ও ব্যস্ততায় তিনি পুনঃ পুনঃ সর্পের উপরে লাঠি মারিতে লাগিলেন। সর্পও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইতে লাগিল। এই সময়ে

চাহিয়া দেখিলাম—উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, একজটী ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া শ্বেতোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন; আপনি ঐ দ্বারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার অর্দ্ধাঙ্গ, বেড়ার অপর দিকে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে, অপরার্দ্ধ এ দিকে। আমাকে হাত নাড়িয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া ক'হিলেন, 'পাশ কেটে আমার দিকে লাফ দাও, সর্প কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।' আমি ইঙ্গিতমাত্র লাফদিয়া সর্পকে অতিক্রমপূর্ব্বক যেমনই আপনার নিকটে গিয়া পড়িলাম, অমনই সেই ধাক্কায় নিদ্রাভঙ্গ হইল।" ভোর রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়া আর ঘুম হইল না। স্বপ্নের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে কখনও আমি দেখি নাই। স্বপ্নে যেমনটি দেখিলাম, বারদীতে গিয়া দেখি, ব্রহ্মচারীর আকৃতি ও রূপ অবিকল সেইপ্রকার।

স্বপ্নটি শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 'এই স্বপ্নটি লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্ন কাজে আসে। এখন গিয়ে লেখা-পড়া কর; পরে, আমি তো আছি, যা কর্‌তে হবে ব'লে দিব।'

আমার কয়েকটি দর্শন বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'এসব বিষয় বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ কর্‌তে নাই; শ্রদ্ধাবান্ দেখে শুধু সাধনের লোকের নিকটে বল্‌তে পার।'

মহাপুরুষ চিনিবার উপায়।

৭ই ভাদ্র, ১২৯৫; ২২শে আগষ্ট, বুধবার।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া দেখিলাম, ঘর-ভরা লোক। নানা বিষয়ের ধর্ম্মালোচনা হইতেছে। অকস্মাৎ একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার মুসলমান ফকির গোস্বামী মহাশয়ের সেই আসন ঘরে প্রবেশ করিয়া, নিঃসঙ্কোচে, প্রফুল্ল-মনে গোঁসাইয়ের সম্মুখে গিয়া বসিলেন; নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক ফক্কিরী ভাষায় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি গান করিয়া গুরুর মাহাত্ম্য কিছুক্ষণ ধরিয়া বলিলেন; পরে গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ফকির সাহেব ঘরহইতে বাহির হওয়ামাত্রই গোঁসাই আমাদিগকে বলিলেন, 'দেখ তো ফকির সাহেব কোন্ দিকে যান।' আমরা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া রাস্তার দুই দিকেই অনুসন্ধান করিলাম, ফকির সাহেবকে দেখিতে পাইলাম না।

গোঁসাই বলিলেন, "তোমরা মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না, মানুষ চেন না। ইনি একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন। কত মুসলমান তো রাস্তাদিয়ে চলে যান, এস্থানে এভাবে কে আর আসেন? রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, দেব-দেবী বিষয়ে মুসলমানদের বল্‌লে তারা কাণে আঙ্গুল দিবে। আর ইনি কেমন অসাম্প্রদায়িকভাবে সকলের উপাস্য দেবতাকেই ভক্তি কর্‌লেন! গুরুর প্রতি নিষ্ঠা জন্মাবার জন্য 'গুরুই সত্য' এই ভাবের উপদেশ কে আর দেয়? কত মহাত্মা এরূপ ছদ্মবেশে এসব স্থানে আসেন বলা যায় না। সময় বুঝে, মানুষ দেখে এঁরা উপদেশ দিয়ে অদৃশ্য হন। মানুষ চিন্‌তে হয়। মানুষ চিন্‌তে হ'লে সকলকেই আপ্‌না অপেক্ষা বড় ব'লে মনে কর্‌তে হয়, নিজকে অধম, আর সকলকে অধমতারণ ভাব্‌তে হয়। রাস্তার মুটে-মজুরকেও মহাত্মা ভেবে নমস্কার কর্‌তে হয়। এরূপ ক'রে তবে যথার্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ-লাভ হয়। ইহা অনুমানের কথা নয়, কল্পনা নয়, যথার্থ ঘটনা, কল্পনা কর্‌লে হবে না, বাস্তবিকই এইরূপ নিজকে ভাব্‌তে হবে। তাহা হ'লেই মহাপুরুষদের কৃপা হয়, জন্ম সার্থক হয়।"

ধর্ম্মের মহাস্রোত—আবার সেই সত্যযুগ।

১১ই ভাদ্র ১২৯৫; রবিবার, ২৬শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

অপরাহ্নে একরামপুরের কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় গেলাম। রাত্রিতে বৈঠক করিব মনে করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যথাসময়ে সকলে আসিয়া একত্র হইলে সাধন আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয় কত দেব দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। 'বম্ মহাদেব! বম্ বম্ ভোলা!' বলিতে বলিতে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ একই ভাবে রহিলেন। পরে আপাদমস্তক সমস্ত শরীরটি থর্-থর্ কম্পিত হইতে লাগিল, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুক্ষণ অতি দ্রুত চলিয়া অবশেষে একেবারে স্থিরভাব ধারণ করিল। গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—

এক মহালীলা হইবে, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে। বেশী দিন বাকি নাই। মহাত্মারা সব বের হ'য়েছেন। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি স্থানে এক মহাকাণ্ড হইবে। আবার সেই সত্যকাল, প্রায় সত্যকালই হইবে। প্রত্যেক

স্থানেই এক একটি মহাত্মা! সকলেরই হাতে পাখা আছে। এখন হইতেই তাঁহারা বাতাস কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন, ক্রমেই জোরে বাতাস কর্‌বেন। কাশীর বাতাস অযোধ্যায়, ঢাকার বাতাস কলিকাতায়, এরূপ একস্থানের বাতাস অন্যস্থানের বাতাসে গিয়ে মিল্‌বে। বাতাসে বাতাস মিশে বাতাসের বেগ আরও বৃদ্ধি হবে। ক্রমে ঝড় হবে, মহাঝড় হবে। মহাঝড় গিয়ে সাগরে পড়্‌বে। সাগরের জল বাতাসে আলোড়িত হ'য়ে গঙ্গা-যমুনাসহিত সমস্ত দেশটিকে ভাসাবে, প্রায় সকল ভারতবাসীকেই ভাসাবে। শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজও ভেসে যাবে। এ স্রোত, মহাস্রোত সকলকেই ভাসাবে। কলিকাতা, ঢাকা আরও দু'তিনটি স্থানে এখনই ধীরে ধীরে বাতাস উঠেছে। মহাস্রোত! কার সাধ্য এ স্রোতে বাধা দেয়? দেশের লোকের অবিশ্বাস সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। তাতে কোন ক্ষতিই হবে না, উপকারই হবে। যাঁরা এই সাধনে আছেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হ'য়েছেন। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, কল্পনা নয়, নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ কর্‌বেন। ইহলোকেই থাকুন, আর পর-লোকেই থাকুন, কেহই বঞ্চিত হবেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস, আরও কোনও কোনও মহাত্মা পরলোকে থেকেই সাহায্য করবেন। কিছু ভয় নাই, সম্পূর্ণ নির্ভয়, সত্য সত্যই নির্ভয়। এই সাধনে যাঁরা আছেন, ধন্য হ'য়ে যাবেন। নামে রুচি, গুরুতে ভক্তি হ'লেই হ'ল। এসাধন যাঁরা লাভ ক'রেছেন, নামে রুচি গুরুতে ভক্তি তাঁদের হবেই। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, হবে-ই। ব্রহ্মচারী মহাশয় এদিকে লীলা কর্‌ছেন। সেই মহাপ্রলয়ের দিন এল। ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।

রাত্রে শুইবার সময়ে গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিয়া শুইলাম যেন শেষরাত্রিতে ৩টার সময়ে সাধন করিবার জন্য তিনি আমাকে জাগাইয়া দেন। ঠিক সময়ে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটি এই—'ভয়ঙ্কর একটা দস্যু 'রুল' হাতে লইয়া আমাকে প্রহার করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি নিরুপায় দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই সময়ে হঠাৎ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত হইয়া দস্যুকে তাড়াইয়া দিলেন।' ভয়ে ও ত্রাসে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেও গোঁসাইয়ের উপরে আমার একটা বিশ্বাস জন্মিল।

গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে প্রবেশ।

১৩ই ভাদ্র, ১২৯৫; মঙ্গলবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

আজ গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়ার নূতন বাড়ীতে আসিলেন। আশ্রমে যাইয়া দেখি মহা উৎসব চলিয়াছে। খোল করতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে স্থানটি মহা আনন্দের ধাম হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত হরিসঙ্কীর্ত্তন গৌর-কীর্ত্তন ও নামগান হইল। ব্রাহ্মদের অনেকে আসিয়াছিলেন। গৌর-কীর্ত্তন শুনিতে কাহারও কাহারও অসহ্য বোধ হওয়ায় চলিয়া গেলেন; কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম শেষ পর্য্যন্তই উৎসবে রহিলেন। একটা ধামাতে করিয়া কতকগুলি বাতাসা লইয়া গোস্বামী মহাশয় নিজ মস্তকোপরি ধরিয়া রহিলেন, পরে তাহা চারিদিকে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া ছড়াইয়া দিলেন। প্রকাশ্যভাবে 'হরির লুট' দিতে গোস্বামী মহাশয়কে আজই প্রথম দেখিলাম।

পরে গোস্বামী মহাশয় পূবের ঘরে দক্ষিণমুখো হইয়া আসন করিলেন। বহুক্ষণ এ ঘরেও কীর্ত্তনাদি হইল। শুনিলাম, আগামী কল্য গৃহসঞ্চার হইবে, মহা উৎসব হইবে। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিলাম।

আশ্রম-সঞ্চার উৎসব।

১৪ই ভাদ্র, ১২৯৫; ৺ জন্মাষ্টমী, বুধবার।

প্রত্যূষে স্নানান্তে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণবাদি নানা সম্প্রদায়ের বহুলোক একত্র হইয়া আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে আজ বহুলোক মাতিলেন। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া উৎসব হইল। ভিতরে বাহিরে ৩।৪ দলে কীর্ত্তন করিল। মুসলমনান ফকির ও ভাবুক বৈষ্ণববৃন্দের যোগদানে উৎসবের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খুব ভাবোচ্ছ্বাস চলিল। পরে গোস্বামী মহাশয় স্বহস্তে হরির লুট বিতরণ করিয়া পূবের ঘরে আপন আসনে গিয়া বসিলেন। এ সময়ে অনেকে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা আহার করিলেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া রহিলাম। গোঁসাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খাবে না?" আমি বলিলাম, প্রসাদ পাইব। বেলা প্রায় ২টার সময়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে লইয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেথানে আমরা প্রায় ১০।১২টি গুরুভ্রাতা গোঁসাইয়ের দুই পাশে বসিলাম। গোঁসাই আমাদের প্রসাদ দিলেন। আজই গোঁসাইয়ের প্রসাদ আমি

প্রথম পাইলাম। একটি গুরুভ্রাতা যথাকালে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিতে পারেন নাই; তিনি আসিয়া গোঁসাইয়ের ভোজনপাত্রহইতে নিঃসঙ্কোচে নিজেই প্রসাদ তুলিয়া নিয়া খাইতে লাগিলেন! গুরু-শিষ্যের এই প্রকার ভাব আর কোথাও দেখি নাই।

দর্শনাদিসম্বন্ধে উপদেশ। অলৌকিকরূপে চরণামৃতলাভ।

২১শে ভাদ্র, ১২৯৫।

সন্ধ্যাকালে কয়েকটি গুরুভ্রাতার সহিত গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পৌঁছিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে হরিচরণ বাবু, প্রসন্ন বাবু, শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোঁসাই বহুক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় অর্দ্ধ-স্ফুট-স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"সাধনের সময়ে আপনারা যিনি যাহা দেখেন, কল্পনা মনে কর্‌বেন না। এ সাধন এমনই জিনিস যে এসব দেখ্‌তেই হবে। প্রথম অবস্থায় এসব দর্শন চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী হয়; চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে এসব ক্রমেই স্পষ্ট ও দীর্ঘকালস্থায়ী হ'তে দেখা যায়। প্রথম প্রথম একখানা ছবির মত, পটের মত, ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে থাকে; পরে ধীরে ধীরে উহা পরিষ্কার মূর্ত্তিরূপে জীবন্ত দেখা যায়; কাথাবার্ত্তাও শুনা যায়; উহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে উত্তর পাওয়া যায়। শুধু জীবন্তই দর্শন হয় তাহা নয়, উহাদের হাত পা নাড়া ইঙ্গিতাদিও দেখা যায়। এ সাধনে শুধু আমাদের দেশের দেবদেবীরই যে দর্শন হয় তাহা নয়; এ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে যে কোন দেশে যে কোন রূপে লোকে পূজা ক'রেছেন,—আপনারা জ্ঞাত থাকুন, আর নাই থাকুন—সাধনপ্রভাবে ধীরে ধীরে সে সমস্তই জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ হবে। পূর্ব্বে গ্রীসে, রোমে ও অন্যান্য দেশে, এমন কি পাহাড়ে-পর্ব্বতে অসভ্য লোকেরাও এপর্য্যন্ত ভগবান্‌কে যিনি যে রূপে পূজা করেছেন ও কর্‌ছেন, সমস্ত প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌বে। এসব কল্পনার কথা বল্‌ছি না, এ সমস্ত বিষয় সত্য, প্রত্যক্ষ। প্রথম হ'তেই যদি এ সব কল্পনা মনে ক'রে তুচ্ছ করা যায়, একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সহজের পথ হারাতে হয়। কল্পনাই ভাবুন, আর যাই ভাবুন, এসকল প্রত্যক্ষ হবেই। ওসব সদা সর্ব্বদা দেখা যায় না। তার কারণ, আমাদের চিত্ত সব সময়ে এক অবস্থায় থাকে না; চিত্ত স্থির হ'লেই দর্শনটি পরিষ্কার হয়।

চিত্ত স্থির রাখ্‌তে হ'লে, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে হয়, পবিত্র আচার নিয়ে থাক্‌তে হয়। নামে রুচি হ'লে ও চিত্ত নির্ম্মল হ'লে একটি একটি ক'রে বাসনা কামনা ত্যাগ হ'তে থাকে। যে পরিমাণে বাসনা কামনা ত্যাগ হবে সেই পরিমাণে ওসকল প্রত্যক্ষ হবে। এইসকল দর্শনের অবস্থাই যোগের আরম্ভ। যোগের একবার আরম্ভ হ'লে আর বেশী দিন লাগে না। ক্রমে ক্রমে সব আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যক্ষ হ'তে থাকে, যাহা কখন কল্পনাও করা যায় না সে সব প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষ ধন্য হয়।

অধিক রাত্রিতে বাসায় আসিবার সময়ে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্‌সী মহাশয়ের সঙ্গে চলিলাম। তিনি রাস্তায় গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ দয়ার অনেক কথা তুলিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"দেখুন, আমি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক। ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না। প্রত্যহ রাত্রিতে শোবার সময়ে মাথার কাছে একটি খালি বাটি রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যেন তিনি চরণামৃত রাখিয়া যান। আশ্চর্য্য তাঁর দয়া! প্রতিদিনই শেষরাত্রে উঠিয়া ঐ বাটিতে চরণামৃত পাই। এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। আমি ব্যতীত আর কেহই এ বিষয় জানে না। আপনার ইচ্ছা হ'লে শোবার সময়ে খালি বাটি রাখিয়া শোবেন, নিশ্চয়ই পাবেন।" বক্‌সী মহাশয় চিরকাল নিষ্কপট, সত্যবাদী, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, ভাবিলাম—"এ আবার কি? এঁরও এই অবস্থা! যাহা কখনও হ'তে পারে না, তার পরখ কর্‌ব কি? বক্‌সী মহাশয়কে বহুকাল জানি, তাঁহার উপরে আমার শ্রদ্ধা কমিল না, মনে করিলাম, 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', অথবা অন্য কোন রহস্যও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে।"

প্রারব্ধক্ষয়ের উপায়নির্দ্দেশ।

২৪শে ভাদ্র, ১২৯৫; শনিবার।

বিকাল বেলা গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। নির্জ্জন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'একটি নাম আমাকে জপ কর্‌তে বলেছিলেন, স্বপ্নে দেখেছিলাম।'

গোঁসাই। হাঁ, হাঁ, সেই নামটিও জপ ক'রো, উপকার পাবে।

আজ শনিবার বলিয়া অনেক লোকের সমাগম হইল। প্রারব্ধ ও পুরুষকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। গোঁসাই বলিলেন—সংসারে সকলেই প্রারব্ধের অধীন। যে-ই যত চেষ্টা কর না কেন, প্রারব্ধ কার্য্যের গতি কেহই রোধ কর্‌তে পারবে না।

পুরুষকারদ্বারা প্রারব্ধের উপর আধিপত্য অসম্ভব। লোকে পুরুষকারে সাময়িক উপকার পেতে পারে বটে; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয়, পুরুষ-কারের প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম অতিক্রম ক'রে, সাধনের চতুর্থ অবস্থাও পেরিয়ে গিয়েছিলেন; অবশেষে, নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থানে পৌঁছিয়ে, আবার ঠেকে ফিরে এলেন। পরে তিনি নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত নিড়ায়ে, শূকর তাড়ায়ে কতকাল কাটালেন। অবস্থায় না প'ড়লে এসব কথা বুঝা যায় না। প্রারব্ধের হাত-থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত্রে দুইটি উপায় ব'লেছেন—বিচার ও অজপাসাধন। যখনই যাহা কিছু কর্‌বে, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্‌বে। উঠা বসা, স্নানাহারাদি যাবতীয় কার্য্য নিষ্কামভাবে বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হ'লেই শীঘ্র প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়। আর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে আরও সহজে হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের কথার অর্থ আমি বুঝিলাম না। প্রয়োজনে ঠেকিয়া, বাধ্য হইয়া অহরহঃ যে সকল কার্য্য করি, তাহাতে নিষ্কাম ভাব আনিব কি প্রকারে? আর বাহ্যি প্রস্রাব স্নানাহার ইত্যাদি কর্ম্ম ঠিক সাধন ভজনের মত ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা মনে করিবই বা কিরূপে? শ্বাসে প্রশ্বাসে দশ মিনিটও নাম করিতে পারি না, ফাঁপর হইয়া পড়ি। অবিচ্ছেদে শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম করিবই বা কি প্রকারে? এখন বুঝিতেছি, এ সাধন নেওয়াই আমার ভুল হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশ।

সশিষ্যে গোস্বামী মহাশয় আজ ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। গোঁসাইকে দেখিয়া ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহা-উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভাবোচ্ছ্বাসের মহা ধুম-ধাম পড়িয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ের কয়েকটি শিষ্য খুব মাতিয়া গেলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। শ্রীধর ভাবে উন্মত্তবৎ হইয়া 'ঐ দেখ্, ঐ দেখ্' বলিয়া ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই খুব আগ্রহের সহিত শ্রীধরকে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কুশারী মহাশয় ২।৪ লাফে শ্রীধরের সম্মুখে আসিয়া 'ঐ দেখ্, ঐ দেখ্ কিরে? ব্রহ্ম জগৎ-ময়, ব্রহ্ম জগৎ-ময়!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদির কার্য্য করিয়া উপদেশ দিলেন। তিনি সতেজ বাক্যে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন—'সাকার উপাসনাই কর,

আর নিরাকার উপাসনাই কর, এইমাত্র দেখিবে যে, নিজের ইষ্ট-দেবতাকে যথার্থ ব্যাকুলতার সহিত ডাকিতেছ কি না'—ইত্যাদি। ব্রাহ্মগণ আজ এভাবের উপদেশ শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অনেকে বলিলেন—গোস্বামী মহাশয় আজ সমাজে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই, নগেন্ বাবুর মুখহইতে এপ্রকার উপদেশ বাহির হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আজ তিন দিন যাবৎ নিয়ত মনে হইতেছিল—বড় দাদার ছোট কন্যা প্রিয়বালা জলে পড়িয়া মরিয়াছে। সময়ে সময়ে উহার মৃতদেহ কল্পনায় আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়িতেছিল। আজ খবর পাইলাম যথার্থই তাই। মনে বড়ই কষ্ট হইল। আমার অপর ভ্রাতুষ্পুত্রী সরযূ নিতান্ত বালিকা, ঘটনার ২ দিন পূর্ব্বে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ হয় কেন? ইহাতে মনে হয় প্রারব্ধ একটা কিছু থাকিতেও পারে।

ভয়ানক বিপদে পড়িলাম। ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা, বাহিরে একটার পর একটা ভীষণ প্রলোভন! এ অবস্থায় করি কি? ব্যভিচার করিয়া কামের বেগ শান্তি করিব, স্থির করিলাম। কিছু ব্যবস্থা পাইতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া উপনীত হইলাম। একটুক্ষণ বসিয়া থাকার পর, তিনি নিজহইতেই বলিতে লাগিলেন—

উপদেশ শুনে কি হবে? শুধু শুনে গেলে কিছুই হয় না। জীবনে উহা পরিণত করতে হয়। ইচ্ছা করলেই সব-উপদেশ-মত চলা যায় না, সত্য। অনেকের ভাল হ'তে ইচ্ছা আছে, চেষ্টাও আছে; কিন্তু পেরে উঠে না। সকল রিপুর উপরে সকলের সমান আধিপত্য নাই, এ খুব সত্য কথা। কিন্তু সত্য কথা তো লোকে ইচ্ছা করলেই বল্‌তে পারে; তাই বা করে কই? সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা—সকলেরই প্রয়োজন। এ তিনটি অভ্যস্ত হ'লে আর বড় উৎপাত থাকে না। ধর্ম্মার্থিগণের প্রথমে এই তিনটি অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। পরে সবই সহজ হয়ে আসে, একয়টি সহজেই অভ্যস্ত হয়। এই তিনটি আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাত শান্তি হয়ে যাবে।

এসব শুনিয়া আমি মনোদুঃখে বাসায় চলিয়া আসিলাম। ভাবিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় যোগাচার্য্য, এসব উৎপাত শান্তির কতপ্রকার প্রণালী জানেন, একটা কিছু মুষ্টি-যোগ বলিয়া দিবেন। কিন্তু তিনিও তো দেখি ব্রাহ্মসমাজের সেই পুরান নীতির গৎ-ই আওড়াইলেন।

মন্ত্রশক্তির প্রমাণ।

১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

আমাদের মাষ্টার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমরা ৮।১০টি সমবয়স্ক তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আছি এমন সময়ে একটি সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ ঐ বাসায় আসিয়া বলিলেন—"'উপরি' উপদ্রবে আপনাদের একটি ছেলে মারা পড়িতেছে। আপনাদের প্রবৃত্তি হইলে আমি একটি কবচ দিই, ছেলেটি ভাল হ'য়ে যাবে। দৈববলে আমি এই কবচ সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনাদের অর্থব্যয় বেশী কিছু হ'বে না; একটি যজ্ঞ করতে যৎকিঞ্চিৎ খরচ হবে মাত্র।" মাষ্টার মহাশয় ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্ম, তিনি একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"কবচ টবচের কাজ নয়। ও সব দৈব-টৈব আমি মানি না। যজ্ঞ কি হে, বাপু? কোন ঔষধ জান তো দাও। ওসব কিছু বিশ্বাস করি না।" আমরা সকলেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন, মনে করিলাম—'বেশ একটা বুজরুক্ আসিয়া জুটিল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঠাকুর, দৈববলে আমাদের কিছু দেখাতে পার?' সাধু-বেশধারী কহিল—"হাঁ, নিশ্চয় পারি। ছেলেটির মহাবিপদ্ দেখে কবচের কথা বল্‌ছিলাম। উহা নেওয়া না নেওয়া আপনাদের ইচ্ছা। ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই।"

দৈববল কিছু দেখাইবার জন্য সাধুটিকে খুব জেদ করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ ঠাট্টা তামাসাও করিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আচ্ছা, আপনারা কি চাহেন, বলুন।' আমরা সকলে তখন বলিলাম, 'দৈববলে কিছু খাবার মিষ্টি আনিয়া দাও।' ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এক ঘটী পরিষ্কার জল দিন্, আর ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া দিন্। আমি মন্ত্র পড়িয়া যখন 'আয় আয়' বলিব, তখন ঐ জল ঘরে ছিটাইয়া দিবেন।" আমরা তৎক্ষণাৎ ঝাড়ু দিয়া ঘরটিকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম; ব্রাহ্মণকে নিজেদেরই একখানা কাপড় পরাইলাম, এবং এক ঘটী জল ঘরের মধ্যস্থলে রাখিয়া আমরা প্রায় ১০।১২ জনে সেই ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া খুব সতর্কতার সহিত উঁহার হাত-মুখ নাড়ার উপরে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। বেলা ৩ টা ৩॥ টা হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে প্রৈত্র ধরিয়া স্থিরমনে জপ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরেই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তিনি উর্দ্ধদিকে হস্তদ্বয় তুলিয়া বার কয়েক 'আয় আয়' বলিয়া কাহাকে যেন আহ্বান করিলেন। আমরা অমনি সেই ঘটীর জল ঘরময় ছিটাইয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ তখন শূন্য হইতে প্রকাণ্ড—প্রায় দুই সের পরিমাণ—একটা মিশ্রির ডেলা লুফিয়া নিয়া আমাদের কাছে ফেলিয়া দিলেন। এত বড় মিশ্রির খণ্ডটা কোথা

হইতে যে কি ভাবে আসিল, একটানা স্থির নজর রাখিয়াও আমরা এতগুলি লোকে তাহার কিছুই ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাতেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন,—"যন্ত্র টন্ত্র ওসব কিছু নয়, কুসংস্কার! আমি কবচ চাই না।" সাধুটি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরেই ছেলেটির মৃত্যু হইল। মাষ্টার মহাশয়ের বিবেকের বল অদ্ভুত! এমন আপদেও স্বীয় ধারণা বা মতের বিরুদ্ধ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিলেন না! ইহা আমাদের পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত বটে! কতকগুলি মিশ্রি বাসায় আনিয়া আমি একটা শিশিতে পুরিয়া রাখিলাম, অন্য কিছু হয় কি না দেখিব।

আহারসম্বন্ধে উপদেশ—আনুষঙ্গিক কথা।

মধ্যাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। নির্জ্জনে অবকাশ পাইয়া বলিলাম,

১৩ই আশ্বিন, ১২৯৫; শুক্রবার। 'সাধনের সময়ে যে সব দর্শন হইত, এখন আর তাহা কিছুই হয় না!'

গোঁসাই। হয় না কেন? কোনপ্রকার অনিয়ম হয়েছে।

গোঁসাইয়ের একথাটি শোনামাত্র মনে হইল—'যে অনিয়ম অত্যাচারে দর্শন বন্ধ হয় তাহা তো আমার জানাই আছে, উত্তেজনাই মূল।' এই উত্তেজনাই বা কেন হয়, উহার গোড়ার কথা জানিতে ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'অনিয়ম তো কতই হয়! দর্শন বন্ধ হবার মূল কি তা তো বুঝি না।'

গোঁসাই। অনেকপ্রকার অনিয়মে ওরূপ হ'য়ে থাকে। আহারাদির অনিয়মেও দর্শন বন্ধ হয়।

আমি। মাছ মাংস কখনও খাই না। উচ্ছিষ্ট খাওয়ারও তো সম্ভাবনা নাই।

গোঁসাই। তা বল্‌লে কি হয়? কারও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, লোভের বস্তু, তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়। কোনও তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক আসনে বসে আহার কর্‌লেও অনিষ্ট হয়; এমন কি, একস্থানে বসে খেলেও হয়। আহারের বস্তুতে তমোগুণীর দৃষ্টি পড়্‌লেও ক্ষতি হয়। এসব বিষয়ে যখন দৃষ্টিটি খুলে যাবে, পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে ওসব লোকের দৃষ্টিমাত্র আহারের বস্তুতে কীটাণু ব্যাপিয়া পড়ে। এসকল পূর্ব্বে তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তাম না, মান্‌তামও না। কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'লে আর অবিশ্বাস করি কিরূপে? আহারের বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। দরজা বন্ধ ক'রে

আহার করা এখনও অনেক ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে। এজন্য দেবতার ভোগেও দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আহার্য্যে পড়্‌লে উহা ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। এজন্য দরজা বন্ধ ক'রে ভোগ প্রস্তুত করারও নিয়ম আছে। ভাবদুষ্ট, স্পর্শদুষ্ট ও দৃষ্টিদুষ্ট বস্তু আহার কর্‌লে ক্ষতি করে; দেবতাকে দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোষে অনেকপ্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হয়, ওতে সমস্ত রিপুরই উত্তেজনা জন্মে। এইজন্য এ সব বিষয়ে খুব সতর্ক থাক্‌তে হয়।

আমি। শুদ্ধাশুদ্ধ বস্তু পরিষ্কার না জেনে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন কর্‌লে আমার অপরাধ হবে না? আর তাতে ইষ্টদেবতার কোনও ক্ষতি হবে না?

গোঁসাই। না, কোন অপরাধই হয় না। কারণ উহা তো ব্যবস্থাই। ওরূপ না কর্‌লে যে রক্ষা পাবার উপায় নাই। ইষ্টদেবতারও কোন ক্ষতি হয় না। যথামত নিবেদন কর্‌লে ইষ্টদেবতা জান্‌তে পারেন, সতর্কও হন। ওতে কোন দিকেই অনিষ্ট হয় না।

আমি। ইষ্টদেবতার কৃপায় আহারের বস্তু শোধিত হ'লেও তো আবার দূষিত হইতে পারে; এজন্য প্রতি গ্রাস নিবেদন ক'রে থাকি। উচ্ছিষ্ট বস্তু পুনঃ পুনঃ নিবেদন করায় ইষ্টদেবতার অনিষ্ট হয় না?

গোঁসাই। না, কিছুই না। ঐ রকমই কর্‌তে হয়। এজন্য আহারের সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ কথাই বলেন না, মৌন থাকেন। দেশে এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে ঋষিগণ এসব খুব আবশ্যক বুঝে-ছিলেন; তাই আমাদের হিতের জন্য শাস্ত্রাদিতে লিখে রেখে গেছেন। বহু তপস্যাতে তাঁরা যে সকল মহাসত্য অভ্রান্ত বিষয় আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তার তত্ত্ব অবগত না হ'য়ে, একেবারে কুসংস্কার ব'লে উড়ায়ে দেওয়া ঠিক নয়। ঋষিরা যা সত্য ব'লে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন তাই আমাদের কল্যাণের জন্যই রেখে গেছেন, মিথ্যা কথা কতকগুলি লিখে রাখায় তাঁদের তো কোনও স্বার্থ ছিল না। আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করি, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা শাস্ত্রাদি লিখে গেছেন। যা সত্য বুঝ তাই এখন ক'রে যাও। সকল নিয়ম এখনই প্রতিপালন কর্‌তে পারবে

না; সাধ্যমত যতটুকু পার, ক'রে যাও; তাতেই ঢের উপকার পাবে। সকল নিয়ম রক্ষা ক'রে চলা যদি সহজ হ'ত, তা হ'লে তো অনায়াসে সকলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারত। আহারটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। প্রণালীমত আহার করতে পারলে তাতেই সব হয়, আর কিছুই করতে হয় না। তা তো কেহ কিছু করে না, জানেও না। আহার বিষয়ে নানাপ্রকার অনিয়ম চল্‌ছে, তাতে বড় অনিষ্ট হচ্ছে। এখন যা পার ক'রে যাও। ক্রমে সবই জান্‌বে, করতেও পার্‌বে।

চরণামৃতলাভ ও তদ্বিষয়ে উপদেশ।

২৪শে আশ্বিন, ১২৯৫; মঙ্গলবার।

আমার রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে; স্কুলও ছুটি হইল। বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। বাড়ীর নামে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া, আপদে পড়িলে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, ভাবিয়া ব্যস্ত হইলাম। শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় বলিয়াছিলেন—'গুরুর চরণামৃত গ্রহণ করিলে শারীরিক ও মানসিক বিকারের শান্তি হয়।' আমি ইহার কিছুই বুঝি না, তবে বক্সী মহাশয় বড়ই খাঁটী লোক, তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করি। তাই, ভবিষ্যতে বিষম উৎপাতের ভয়ে, উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি ঘরভরা লোক; নির্জ্জনে চরণামৃত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে গোঁসাইকে জানাইলাম। তিনি একটু পরেই প্রস্রাব করিবার জন্য বাহিরে গেলেন। আমিও সেই সুযোগে গিয়া বারেন্দায় দাঁড়াইলাম। গোঁসাই আমার নিকটে আসিবামাত্র প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা করিলাম, 'আমার যেন গুরুতে—সত্যবস্তুতে নিষ্ঠা হয়।' অন্য প্রার্থনা আসিল না। চরণামৃত দিয়া গোঁসাই বলিলেন—ইহা যত গোপনে ব্যবহার করবে, ততই উপকার পাবে। লোকের সাম্‌নে গ্রহণ ক'রো না, আর কাহাকেও জান্‌তে দিও না।

***

বারদীর ব্রহ্মচারীর সঙ্গ; মহাপুরুষের বিচিত্র উপদেশ ও অসাধারণ আচরণ।

অগ্রহায়ণের ২য় সপ্তাহ, ১২৯৫।

বাড়ীতে আসিয়া কিছু দিন বেশ কাটাইলাম। পরে নানা দিক্ হইতে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি প্রবল প্রলোভনে চিত্তকে বিষম বিক্ষিপ্ত ও প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল। ভাবিলাম, এবারে আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচারে গা ঢালিয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রতিদিনই আমি

চরিত্রস্খলনের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। দিবসের কুচিত্র রাত্রিতে কল্পনায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। পড়া-শুনা একরূপ ত্যাগই করিলাম। পরীক্ষার সুফলেও হতাশ হইলাম। সাধন ভজনেও চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিল। দিবানিশি আমার ললাটোপরি নিবিড় নীল আকাশে নিয়ত যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দর্শন হইত, ধীরে ধীরে উহা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি অহর্নিশি 'হা হুতাশ' করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। কুচিন্তার ফল হাতে হাতে পাইয়াও ছাড়িতে পারিলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন সমস্ত অবস্থা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে লিখিয়া জানাইলাম। তিনি স্বহস্তে পত্রের উত্তর দিলেন—

"নির্ব্বিঘ্নো ভব।

মন খারাপ হ'লে এখানে এসে উপদেশ নিয়ে যাইস্।—বেদনা অসহ্য হ'লে সার মাটি বুকে ডলিস্—কমে যাবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবা। পিরাণ জুতা পরিস্ না, শীতনিবারণার্থে সাধারণ। সব আপদ দূর হবে, কোন ভয় নাই।

আঃ—ব্রহ্মচারী।"

পত্রখানা পাইয়া ব্রহ্মচারীকে দেখিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। পাড়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি ব্রাহ্মণকে সঙ্গী পাইয়া বারদী রওনা হইলাম। সকাল বেলা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট পৌঁছিলাম। ব্রহ্মচারী প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পত্র পেয়েছিস্?" আমি বলিলাম—"হাঁ।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আজ কি খেয়েছিস্?" আমি—"কিছু না।" শুনিয়াই ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন "ভজলেরাম"কে ডাকিয়া কহিলেন—"ওগো, আজ যে নাড়ু প্রস্তুত ক'রেছ সব নিয়ে এস।"

স্নেহময়ী সেবিকা তৎক্ষণাৎ থালাভরা নাড়ু আনিয়া ব্রহ্মচারীর সম্মুখে রাখিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"এসব নিয়ে খা।" আমার সঙ্গের ব্রাহ্মণটিকেও অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনার প্রসাদ হ'লে খেতে পারি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"প্রসাদ কি? ইচ্ছা হইলে খেতে পার।" আমি ব্রাহ্মণটিকে বলিলাম—"উনি যখন দিতেছেন তখনই প্রসাদ হয়েছে। নিন্ না?" ব্রাহ্মণকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকেই সবগুলি খাইতে বলিলেন। সেবিকা নাড়ুর থালা রান্নাঘরে লইয়া গিয়া আমাকে আসন পাতিয়া বসিতে দিল; এবং ব্রহ্মচারীর কথামত সমস্ত নাড়ুগুলি খাইবার জন্য আমাকে জেদ করিতে লাগিল। আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। এক থাবা ভাত আমার পূরা আহার; অর্দ্ধসেরের অধিক পরিমাণ এই নাড়ু

আমি খাইব কি প্রকারে? বিশেষতঃ পিত্তশূল বেদনায় নাড়ু বিষতুল্য। যাহা হউক, ব্রহ্মচারীর আদেশ মনে করিয়া সমস্তগুলি নাড়ুই খাইলাম। ভজলেরাম কহিল—"বাবা আজ মধ্যাহ্নে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন একটি ছেলে অনাহারে খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ছে। উৎকৃষ্ট নাড়ু বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করে রাখ্, সে এলে খেতে দিবি।"

আহারান্তে ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া বসিলাম। মিলিয়া মিশিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময়ে ব্রহ্মচারীর আহার্য্য প্রস্তুত হইল। আহারের পর তিনি আমাকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম—"এইমাত্র রাশীকৃত নাড়ু খেয়েছি। এত খাবার বহুকাল খাই নাই। এখন আবার খাব কিরূপে?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"খেতে বস্ না গিয়ে, ক্ষুধা পাবে এখন!" আমি আর প্রতিবাদ না করিয়া আহার করিতে বসিলাম। অদ্ভুত মহাত্মার কৃপা! প্রসাদের চমৎকার গন্ধে আমার লোভ হইল, ক্ষুধা পাইল। রুচির সহিত নির্দ্দিষ্ট আহারেরও প্রায় চতুর্গুণ খাইলাম। রাত্রে ব্রহ্মচারীর ঘরের পাশেই রান্নাঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শুনিলাম ব্রহ্মচারী মহাশয় ভজন গাহিতেছেন—"প্রাণ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ—জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ*।" গাহিতে গাহিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সকাল বেলা উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে, তোর কিছু বল্‌বার থাক্‌লে এখন বল্।"

আমি। কামের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি বড় অস্থির হ'তেছি। কি কর্‌ব?

ব্রহ্মচারী। কেন, রমণ কর্‌বি। তোর কি জুটে না?

আমি। ঢের জুটে; কিন্তু তাতে যে পাপ হয়!

ব্রহ্মচারী। আচ্ছা, যা; তোকে কোন পাপ স্পর্শ কর্‌বে না। সব পাপ আমার।

আমি। লোকে যে নিন্দা কর্‌বে।

ব্রহ্মচারী। কে নিন্দা কর্‌বে? জ্ঞানীরা নিন্দা কর্‌বে না—মূরুক্ষুরাই কর্‌বে। মূরুক্ষুর নিন্দায় কি হয়?

আমি। জ্ঞানীরা নিন্দা কর্‌বে না কেন? সকলেই তো ঐ কাজের নিন্দা করে।

ব্রহ্মচারী। দেড়বৎসর দুইবৎসরের একটি ছেলে যখন দৌড়িতে শেখে তা দেখেছিস্? ৮।১০ হাত দৌড়িয়ে গিয়ে দুড়ুম্ করে আছাড় খেয়ে পড়ে, আবার উঠে। ২৫ বৎসরের একটি যুবক যদি সেই শিশুর উঠা পড়া দেখে হাঁসে, ঠাট্টা করে, তাকে কি বল্‌ব?

* ব্রহ্মচারী মহাশয় গোঁসাইকে চিরকাল "জীবনকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেন।

সে শালা মূরুক্ষু না? সে জানে না যে কত উঠা পড়া ক'রে এখন তার ঠ্যাঙ্গে জোর হয়েছে, সে দুক্রোশ দৌড়িতে পারে। শিশুর উঠা পড়ায় কি জ্ঞানীরা নিন্দা করে? কত আছাড় খেয়ে, পড়ে উঠে, তবে বলবান্ হয়—জ্ঞানীরা তা জানে।

আমি। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনার উপদেশমতই গিয়ে চলি, নিবৃত্তির কথা তো আর আপনি বল্‌ছেন না?

ব্রহ্মচারী। "আমি তোকে নিবৃত্তির কথা বল্‌ব কেন? তোর কর্ম্মেই তোকে নিবৃত্ত কর্‌বে। আমি উৎসাহ দিলেই কি তোর সাধ্য আছে যে তুই কর্‌তে পারিস্? ইটি জেনেই তোকে বল্‌ছি। তুই গিয়ে দেখ্ না! এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে অস্থির হইস্ না। কর্ম্মশেষ না কর্‌লে কিছুতেই কিছু হবে না। এখন গিয়ে লেখা পড়া কর্, প্রারব্ধ শেষ কর। ধর্ম্ম পরে লাভ হবে। আমি আরও একশত বৎসর আছি; শুধু তোদেরই জন্য, আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম—এখন আমার যাইতে ইচ্ছা নাই; কিছুদিন আপনার নিকটে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মচারী—তা বেশ, থাক্‌তে পারিস্ থাক্; তোর কর্ম্মেই তোকে টেনে নিবে। এই বলিয়া তিনি গোঁসাইয়ের কথা তুলিলেন, বলিলেন—"গোঁসাই দেশবিদেশে আমাকে মহাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে! ২৫ বৎসর কাল আমি এখানে বেশ ছিলাম; এখন রোগীর চীৎকার আর মাম্‌লা মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত আমি শুনি। এই জন্যই কি আমি এখানে আছি? শালা অন্ধ, মূরুক্ষু! কচি-কচি ছেলেগুলোকে যোগ-শিক্ষা দিচ্ছে আর বলে 'পরমহংসজী পরমহংসজী'!" এইপ্রকার নানা কথা গোঁসাইকে বলিয়া, আমাদের সাধনের কুৎসাও করিতে লাগিলেন। আমি সেসব কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; তখনই চলিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলাম। ব্রহ্মচারীর কথায় অতঃপর আহারান্তে বেলা ১২টার পর ঢাকায় রওনা হইলাম।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গ মানা।

গেণ্ডারিয়ায় আম গাছের নীচে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রহ্মচারীর বিষয় সমস্ত কথা বলিলাম। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—

এখন তোমাদের যে কেহ ব্রহ্মচারীর নিকটে যাবেন, তাঁকেই তিনি একবার 'নাড়া-চাড়া' কর্‌বেন। আমাকে তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন—"মুনি-ঋষি-দের 'কল্‌জে' তুই শেয়াল কুকুরগুলোকে বিলাচ্ছিস্!" আমি বল্‌লাম, যেমন্

পরমহংসজী আদেশ করেন তেম্‌নি আমি কর্‌ছি। তিনি বল্‌লেন—"আচ্ছা, আমি একবার বেশ ক'রে দেখ্‌ব!" তাই এখন তিনি আরম্ভ করেছেন। এতে তোমাদের আর কি? আমাকেই পরীক্ষা কর্‌ছেন! তিনি বলেছিলেন—তোর 'নাড়ি-ভুঁড়ি' আমি টেনে বের কর্‌ব। এখন তিনি তাই কর্‌ছেন। যত পারেন করুন্। তবে, তোমরা এখন কেহ সেখানে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা সকলকেই বলে দেওয়া ভাল।

গোস্বামী মহাশয়ের একথা আমাদের সকলের ভিতরেই প্রচারিত হইল। প্রায় সকলেই অতঃপর ব্রহ্মচারীর নিকটে যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু, যাঁহারা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত বন্ধ করিলেন না, তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই প্রারব্ধবাদী হইয়া সাধন ভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

বড় দাদার অযাচিত দীক্ষালাভে আমার আক্ষেপ। ঠাকুরের সান্ত্বনা দান।

বড় দাদার নিকটহইতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

২৩-২৬শে অগ্রহায়ণ।

"দীক্ষা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের কৃপার উপর তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী (রামকুমার বিদ্যারত্ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়) হঠাৎ ফয়জাবাদে আসিয়া আমাকে পূর্ব্বে কিছুমাত্র না বলিয়া, গুপ্তার ঘাটে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। সেখানে তিনি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কানে নাম দিয়া বলিলেন,—'আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম। এই নাম জপ কর।' আমি ইহা দৈবনির্ব্বন্ধ ভাবিয়া, দীক্ষা বলিয়াই মানিয়া নিয়াছি; এবং নিয়মমত জপ করিতেছি, উপকারও পাইতেছি।"

দাদার পত্রখানা পাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রাণে অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিয়া পত্রখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উহা প'ড়িয়া একটু হাসিমুখে আমাকে বলিলেন,—এ তো বেশ হয়েছে! যাক্, হ'য়েই ত গেল! ভগবান কতপ্রকারেই লোকের মঙ্গল করেন।

আমি। আপনি আগে আশা দিয়া দাদাকে একটু জানালে বোধ হয় এরূপ হইত না।

গোঁসাই। কেন? এ মন্দ কি হয়েছে? ঈশ্বরেচ্ছায় যা হয় তা কি কখন মন্দ হ'তে পারে? এ ত ভালই হয়েছে।

আমি। তাঁকে যদি আপনি কৃপা না করেন তা হ'লে হবে না। আমি একাই আপনার কৃপা ভোগ করতে চাই না।

গোঁসাই। কেন ? তাঁর কাজ তিনি করুন্, তোমার কাজ তুমি কর। যাঁর যাঁর কাজ তাঁর তাঁর কাছে।

আমি ইহার পর আর কিছু না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ মনে মনে গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"দাদাকে যদি দয়া করিয়া শ্রীচরণে টানিয়া না আনেন তাহা হইলে আমারও কিছুই প্রয়োজন নাই। দাদাকে ছাড়িয়া মুক্তিলাভেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" গোঁসাই আমার পানে একটু সময় তাকাইয়া থাকিয়া চোখ্ বুজিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবেশ অবস্থায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—একটি বৈদ্য গাছের শিকড়ের সহিত কোনও বস্তু মিলায়ে রোগীকে ঔষধ দিয়ে থাকেন; রোগী আরোগ্য হয়। লোকে ঔষধের মধ্যে মাত্র শিকড়টাই দেখে; অন্য বস্তু দেখে না। একব্যক্তি ভাব্‌ল, 'এ ত শিকড়েরই গুণ।' তিনি বস্তুটি বাদ দিয়ে একটি রোগীকে সেই শিকড় মাত্র সেবন করতে দিলেন। সুতরাং রোগের আরোগ্য নাই। ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—এক ব্যক্তি ধানগাছ জন্মাবে স্থির করলে। অতি সুন্দর একটি উর্ব্বরা ভূমি পেয়ে মনে করলে চাষারা অনুর্ব্বরা অপরিষ্কার ভূমিতে ধান ছড়াইয়া রাখে, তাতেই কেমন সুন্দর ধান হয়। আমি এই সুন্দর ভূমিতে ধান বুনিতে দিব না; যেমন সুন্দর সার মাটি তেমনি সুন্দর ধানের সার বুন্‌বো। সে তুষ ফেলে চাল বুন্‌ল। ধান বুন্‌লে অতি সুন্দর ফসল জন্মাত। চালে তা কিছু হবে না। ইত্যাদি।

অস্পষ্টভাবে এইপ্রকার আরও অনেক কথা বলিলেন। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া লিখিলাম না। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের চক্ষু দিয়া খুব জল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে চোখ মুছিয়া, মাথা তুলিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তোমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নাই। তাঁকে আমার নিকটেই আস্‌তে হবে। এই সাধনে ফল পাবেন না; তৃপ্তি ও লাভ করবেন না। এখন সাময়িক একটু শান্তি পেতে পারেন। এখন উনি ঐ সাধনই করুন; ওতে বেশ শিক্ষা

হবে। পরে অল্প সময়েই বেশ ফল পাবেন। তুমি কখনও তাঁকে নিরুৎসাহ ক'রো না। খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লিখ।

আমি। দাদার আস্‌তে হবে, তবে অনেকটা সময় নষ্ট হইল।

গোঁসাই। না, এ নষ্ট নয়। এতে তাঁর উপকারই হবে। আর এ ঘটনায় তোমারও খুব উপকার হবে। তা তুমি শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে। নির্দ্দিষ্ট সময়টি অতীত হ'লেই বুঝবে, এ ঘটনায় তোমার দাদারও কত উপকার হয়।

বিদ্যারত্ন মহাশয় দাদাকে দীক্ষা দিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—'ছয় মাসে তুমি সিদ্ধ হইবে।'

একমাসে সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দ্দেশ।

খুব অল্পসময়মধ্যে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার একটি প্রণালী আজ গুরুদেব আমাদিগকে বলিয়া দিলেন। একমাসকাল কেহ ব্যবস্থানুরূপ নিয়মে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন। শীঘ্র দেহত্যাগ হইবে, যদি কাহারও প্রাণে এইরূপ আশঙ্কা হয়, সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ হইতে পারে বলিয়া যদি কাহারও অন্তরে আক্ষেপ আসে, অনায়াসে তিনি ইচ্ছা করিলে একমাসকাল নিয়মে থাকিয়া এই প্রণালী ধরিয়া সাধন করিতে পারেন; সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। নিয়মগুলি অত্যন্ত শক্ত বলিয়া, কাহাকেও গুরুদেব জেদ করিলেন না, "যাঁহার ইচ্ছা হয় এই মত সাধন করিতে পারেন" ইহাই মাত্র বলিলেন। নিয়মগুলি এই—

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৫, মঙ্গলবার; ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

১। লোকসঙ্গত্যাগ। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ ও চিন্তাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

২। নির্জ্জনে শুচিশুদ্ধভাবে দিবসে একবারমাত্র স্বপাক আতপান্ন-আহার।

৩। শয়নত্যাগ। অত্যন্ত অবসাদ বোধ হইলে নিতান্ত আবশ্যকমত, বাহুমাত্র উপাধানে ভূমিশয়ন।

বাহিরে এইসকল নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে, নির্দ্দিষ্ট প্রকারে মুদ্রাবন্ধন এবং অহর্নিশি সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম, কুম্ভকসংযোগে প্রণালীমত নামসাধন করিতে হইবে।

এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া, একমাসকাল কেহ সাধন করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবেন। অন্ততঃ তিনটি দিনও যদি কেহ করেন, তিনি সাধারণের দুর্লভ কোনও একটি বিশেষ অবস্থা লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন—এই প্রকার মুদ্রাবন্ধন ক'রে আসনে বসা অভ্যস্ত হ'লে কামক্রোধাদি রিপুগণ নিস্তেজ হয়; শরীর রসশূন্য, সাধনোপযোগী সবল ও সুস্থ হ'য়ে থাকে।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে ঠাকুরের কুটীর।

গেণ্ডারিয়ার-আশ্রম সঞ্চারের কিছুদিন পরেই গোস্বামী মহাশয়ের আসনকুটীর নির্ম্মিত হয়। গোঁসাইয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ইহা প্রস্তুত করাইয়া দেন। আম্রবৃক্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, ৮ হাত অন্তরে ঐ ঘরটি অবস্থিত।

ছোট কুটীরখানা দক্ষিণদ্বারী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত, প্রস্থে ৮ হাত মাত্র। মৃত্তিকার প্রাচীরে নির্ম্মিত; চোচালা, ছনের (খড়ের) ছাউনীতে আবৃত। কুটীরের মাঝামাঝি দক্ষিণদিকে মাত্র একটি দরজা এবং উহার পশ্চিমাংশে উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে আড়াআড়ি ছোট ছোট দুইটি (১ ফুট প্রস্থ ও ১॥ ফুট লম্বা আয়তনের) গবাক্ষ। কুটীরের ভিতরে দুইটি প্রকোষ্ঠ। দরজার পূর্ব্বধার ঘেঁষিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, একটি উচ্চ প্রাচীর সমস্ত ঘরখানাকেই পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বদিকের যোগপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের একটিমাত্র ৪ ফুট লম্বা ২ ফুট প্রস্থ চৌকাটহীন সরু পথ; উহা ভিতরের দেওয়ালের উত্তরদিকে রাখা হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে বেলা দুই প্রহরের সময়েও আলো প্রবেশ করে না; অন্ধকারময়। ইহারই দক্ষিণের দেওয়াল সংলগ্ন, উত্তরমুখে গোস্বামী মহাশয়ের আসন রহিয়াছে। সম্মুখে মাত্র ধুনী; ঘরে আর কিছুই নাই।

সাধারণতঃ, গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমদিকের ঘরখানাতেই বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকের অন্ধকারময় কুঠরীতে গোস্বামী মহাশয় পঞ্চমুণ্ড আসন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—আসন রচনায় আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। শুনিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে—'পঞ্চ-মুণ্ডাসন করিয়া উহাতে একবার বসিলে, এই স্থান ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র আর কোথাও যাওয়ার উপায় থাকিবে না। সুতরাং উহাতে আর প্রয়োজন নাই!' কিন্তু

পঞ্চমুণ্ডাসন না করিলেও দিবসের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া ঐ আসনেই বসিতেন্। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমকুটীরের উত্তরদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে স্বহস্তে তিনি নিশান আঁকিয়া তদুপরি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম এবং আসনঘরের ভিতরে ঐ দেওয়ালের গাত্রে কয়েকটি উপদেশ চকখড়ির দ্বারায় লিখিয়া রাখিয়াছেন।

(ক) কুটীরের উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে—

(খ) কুটীরের অভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে—

এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

৪। সর্ব্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রম।

কুন্তলীন প্রেস কলিকাতা।

সাধকের পক্ষে প্রাত্যহিক প্রতিপাল্য বিধি।

আজ আমার সাধন-জীবনের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। অপরাহ্নে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম কয়েকটি গুরুভ্রাতা তাঁহার সম্মুখে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি ধীরে ধীরে আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন—প্রাণায়ামের কাজ তোমাদের প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

২রা পৌষ, ১২৯৩; রবিবার।

১। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে প্রণালীমত দৃষ্টি-সাধন অভ্যাস কর্‌বে।

২। শম—অন্তরেন্দ্রিয়ের শমভাব। চিত্তের প্রশান্ততা সর্ব্বদা রক্ষা ক'রে চল্‌বে।

৩। দম—ইন্দ্রিয়ের বিষয়হ'তে যেসমস্ত কুঅভ্যাস জন্মে, তা হ'তে মনটিকে নিবৃত্ত রাখ্‌বে।

৪। তিতিক্ষা—সকল প্রকার দুঃখের অবস্থায়ই ক্ষমা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর্‌বে।

৫। উপরতি—মৃত্যু ও পরলোক-চিন্তা কর্‌বে। দেহ, বিষয়, সংসারাদি সমস্তই অনিত্য অসার—প্রতিদিন ভাব্‌বে।

৬। দ্বন্দসহিষ্ণুতা—সুখ দুঃখ, মান অপমান, নিন্দা প্রশংসা—সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাতেও চিত্তের অবস্থা অবিচলিত, একই প্রকার স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

৭। স্বাধ্যায়—ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ-পাঠ। মহাভারতের মোক্ষ-পর্ব্ব, শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতা—এসবহ'তে অন্ততঃ দু'একটি শ্লোকও প্রত্যহ পাঠ কর্‌বে।

৮। সাধুসঙ্গ—প্রত্যহ সাধু-দর্শন বা ধর্ম্ম-বিষয়ে একটু আলাপ কর্‌বে।

৯। দান—যার যেরূপ সাধ্য, অন্ততঃ একটি সৎকথাও, দান কর্‌বে।

১০। তপস্যা—সাধন, যা ক'রে থাক।

প্রতিদিনই এ সকল নিয়ম রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

প্রত্যহ এইসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলা তো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। প্রতিদিন এ নিয়মগুলি অন্ততঃ যেন একবার স্মরণও কর্‌তে পারি, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। কীর্ত্তনান্তে আজ রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে বাসায় আসিলাম।

স্কুলের পড়াত্যাগ ও পশ্চিমে যাওয়ার আদেশ। ধ্যান ও আসনের উপদেশ।

কিছুকালযাবৎ আমার বেদনা-রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিন রাত অবিশ্রান্ত দুঃসহ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। শরীরের বিষম দুরবস্থা দেখিয়া, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে পড়া-শুনা ছাড়িয়া পশ্চিমে যাইতে বলিতেছেন। পড়াশুনায়, আমারও একেবারেই উৎসাহ নাই। কিন্তু বহুকাল বাড়ীতে থাকার পরে, কিছুদিন যাবৎ আবার লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছি। এখন পড়-শুনা বন্ধ করিলে দাদারা কি বলিবেন—সর্ব্বদা ইহাই মনে হইতেছে। আজ অকস্মাৎ বড় দাদার একখানা পত্র আসিয়া পড়িল। বিদ্যারত্ন মহাশয় দাদার গুরু; জানি না, তিনি আমার সম্বন্ধে দাদাকে কি বলিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, দাদা আমাকে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া অবিলম্বে পশ্চিমে যাইতে লিখিয়াছেন। আমার বর্ত্তমান দুরবস্থায় ভগবানের আশ্চর্য্য সকরুণ ব্যবস্থা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে দাদার দীক্ষাগ্রহণের সংবাদ শুনিয়া, মনে বড়ই দুঃখ পাইয়াছিলাম; গোস্বামী মহাশয় তখনই আমাকে বলিয়াছিলেন—'এতে তোমারও খুব কল্যাণ হবে। তা তুমি শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে।' গুরুদেবের এই কথা পুনঃ পুনঃ এখন স্মরণ হওয়ায়, আমার সংশয়পূর্ণ অবিশ্বাসী চিত্তকেও তাঁহার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। গুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে বারংবার প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম—'দয়াল ঠাকুর, এবারেই যেন চিরকালের মত লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্কুল-কারাগারহইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং তোমার সঙ্গ সতত লাভ করিতে পারি, ইহাই করিও।'

দাদার পত্র পাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই লেখাপড়ার পুস্তকগুলি গুছাইয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম; বাসার সকলে স্কুল কলেজে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল, আমি পশ্চিমে যাওয়ার অনুমতির জন্য গেণ্ডারিয়ায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে চলিলাম। শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পথে পাইয়া আমাকে বলিলেন—"এ সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শনলাভ সহজ

হইবে না।” কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—“দিন রাতই আজকাল তিনি আসনের ঘরে বদ্ধ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে একমাস কাল বসিয়া অতি তীব্র কঠোর সাধন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে বাহিরের লোকে তাঁহার দর্শন বড় পাইবেন না। সাধনের ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও নির্দ্দিষ্ট সময়েই মাত্র দেখা পাইবেন।” জিজ্ঞাসা করিলাম—গোঁসাইয়ের আবার পঞ্চমুণ্ডাসনে সাধন করিবার প্রয়োজন কি?’ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“তিনি বলিয়াছেন, পরমহংসজীর আদেশ।” গোস্বামী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই এখন সমাধিস্থ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে সিদ্ধ হইলে, পাঁচটি পরলোকগত মহাত্মা গোঁসাইয়ের দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন, ঐসকল আত্মা সকলপ্রকার আপদ্ বিপদে ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দুর্দ্দৈব হইতে দেহটিকে রক্ষা করিবেন। বক্‌সী দাদার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। গোঁসাইয়ের এই অদ্ভুত সাধনচেষ্টা নাকি গুরুভ্রাতারাও সকলে জানেন না। গুরুদেবের গেণ্ডারিয়াবাসী [illegible] ঘনিষ্ঠ শিষ্যমাত্র অবগত আছেন। এসম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল রহিল।

আমি গোঁসাইয়ের দর্শন-প্রত্যাশা মনে মনে প্রার্থনা করিয়া গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ৫।৭ মিনিট ভজন-কুটীরের কাছে বসিতেই গোঁসাই ঘরহইতে বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া আপনাহইতেই ডাকিয়া বলিলেন—তোমার শরীর তো খুব কাতর দেখ্‌ছি। এখন কি কর্‌বে, স্থির করেছ?

আমি। দাদা পশ্চিমে যেতে লিখেছেন। তাই কি কর্‌বো?

গোঁসাই। হাঁ। এখন তোমার পক্ষে তাই তো করা উচিত। এবার বুঝি পরীক্ষা? তা কি কর্‌বে? শরীর খারাপ ক’রে লেখাপড়াও তো ঠিক নয়।

আমি। এবারেও যদি পরীক্ষা না দেই তা হইলে আর কখনও দিব না। এখন আপনি যা বলেন!

গোঁসাই। স্কুলে প’ড়ে কি হবে? তুমিও যেমন! শরীরটি নষ্ট হ’লে পাশ দিয়ে কি কর্‌বে? বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য; সেটি হ’লেই তো হ’লো। যত বড় বড় লোকের কথা শুনা যায়—মিল-প্রভৃতি—অনেকেই স্কুলে পড়েন নাই। স্কুলে না প’ড়েও বিদ্যালাভ করা যায়; তুমিও তাই কর। স্কুলের পড়া তোমার পক্ষে সুবিধার নয়। যাদের শরীর সুস্থ নয়, স্কুলের পড়া তাদের পক্ষে আমি তো ভাল মনে করি না। আমাদের দেশে যেসব ছেলেপিলের ব্যারাম দেখা যায়,

অধিকাংশেরই স্কুলে প'ড়ে। আহার ক'রে অমনিই 'ভাতে-মুখে' স্কুলে দৌড়ে, সারাদিন অনিয়মিত পরিশ্রম করে, তার উপরে পরীক্ষার চিন্তায় মাথা নষ্ট করে। এসব কারণেই এত রোগ, এত অকাল জরা। তুমি তোমার দাদার কাছে চলে যাও—সেখানে তোমার শরীর মন সবই ভাল থাক্‌বে। ওদিকে মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের দর্শনও পাবে। তোমার তাই ভাল। একটু থামিয়া পরে আবার বলিলেন—তোমার দাদাকে এই সাধনের ভিতরের কোন কথা ব'লো না। ওসব বল্‌তে নিষেধ আছে। আর তাঁকে আমাদের সাধনের ভিতরে আন্‌তে কোন চেষ্টা ক'রো না। তাঁর জন্য তুমি কোন চেষ্টাই ক'রো না। তাঁর সময় হ'লে তিনি আস্‌বেন। তোমার কোন চেষ্টারই দরকার নাই। আমাদের এ সাধন প্রচারের বস্তু নয়। যাঁর প্রয়োজন, ভগবানই সময়মত তাঁর নিকটে প্রচার করেন। এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি লোকের অলৌকিকভাবে দীক্ষাগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেন। তাঁহাদের নিজেদের মুখে সেসব কথা সময়ান্তরে সুযোগমত বিস্তারিতরূপে শুনিয়া যথাযথ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রামকুমার বাবু কিরকম? তিনি কি ব্রাহ্মসমাজের সাধনছাড়া অন্য কোন প্রকার সাধন করেন?

গোঁসাই। হাঁ, তিনি অন্য সাধন করেন। কিন্তু শক্তি পান নাই। শক্তি পেলে গোপন করতে পার্‌তেন না। তা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ত।

আমি। রামকুমার বাবু সেদিন বলিলেন, "তোমাদের সাধনে কোন দোষই নাই, তবে বড় বেশী প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, এই যা। সাধন গোপনেই রাখ্‌তে হয়।

গোঁসাই। তা তো ঠিক্ কথা; কিন্তু শক্তি গোপনে থাকে না। আর সত্যের 'মার্' নাই। সত্যবস্তু প্রকাশ করতে কাকে ভয়? সত্য যা তা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। উনি যখন শক্তি পাবেন তখন দেখ্‌বেন উহা গোপনে থাকে না। রামকুমার বাবুকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রো; তিনি ভাল লোক। আমাদের এ সাধনে সকলকেই ভক্তি করতে বলে। রাস্তার মুটে মজুরকেও ভক্তি করবে। সকলেই ভক্তির পাত্র। অবিচারে যিনি যত সকলকে ভক্তি করতে পার্‌বেন তাঁরই তত উপকার।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধনের নূতন নিয়ম যা ব'লেছেন তা কি আমি করবো?

গোঁসাই। হাঁ, তুমিও করবে, আসন এইরূপ ক'রো; আর এইখানে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান ক'রো। এই বলিয়া, আসনটি করিয়া দেখাইলেন, এবং ধ্যানের স্থানটিও বলিয়া দিলেন।

আমি। ধ্যান কি? ধ্যান কাহাকে বলে? আমি তো কিছুই জানি না। কি ধ্যান করব?

গোঁসাই। আচ্ছা, আসন ক'রে ব'সে ব'সে নাম ক'রো, আর চোখ্ বুজে দৃষ্টিটি এখানে স্থির রেখো। পরে আপনি সব জানতে পারবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—চোখ্ বুজে আবার ওখানে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌ব কি প্রকারে?

গোঁসাই। চোখ্ বোজা থাক্‌বে, মনটিকে ঐস্থানে স্থির রাখ্‌বে।

আমি। কিছু না পেয়ে শুধু শুধু মন একটা স্থানে স্থির থাক্‌বে?

গোঁসাই। অভ্যাস কর্‌লেই কিছুকাল পরে নানারকম জ্যোতি ও রূপাদি দেখ্‌তে পাবে। মনটিকে একটা স্থানে এখন স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর। পরে তোমার পক্ষে যা যা প্রয়োজন জান্‌তে পার্‌বে।

ঐ প্রকার আসনে বসা অভ্যাস হ'লে কি উপকার হয় জানিতে চাহিলাম। গোঁসাই বলিলেন—অম্ল, উদরী, শোথ, বাত, পৈত্তিকাদি এই আসনে বস্‌লে দূর হয়; আরও অনেক উপকার হয়। অভ্যাস কর্‌লে ক্রমে জান্‌বে।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত।

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার।

বড় দাদার আজ একখানি পত্র লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। আশ্রমে প্রবেশমাত্রই শ্রীধর ও লাল-প্রভৃতি সকলে বলিলেন—'গোঁসাই খুব অসুস্থ। জ্বরে মাথা ধরায় প্রায় বেহুঁস্ অবস্থায় শয্যাগত আছেন। আজ দেখা হইবে না। আমি কিছু না বলিয়া, বাহিরে আমগাছের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে মনে গোঁসাইকে স্মরণ করিয়া দর্শনের প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। গোঁসাই ভিতর বাড়ীতে কোঠাঘরে ছিলেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ, মা ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী মাত্র নিকটে ছিলেন। আমার খবর কেহই গোঁসাইকে দেন নাই। অথচ মা ঠাকুরাণী অকস্মাৎ দরজা খুলিয়া শ্রীধরকে বলিলেন—'শ্রীধর, গোঁসাই বল্‌লেন—

'কুলদা বাহিরে অপেক্ষা করছে; তাকে ডেকে দাও।' আমি খবরটি পাইয়াই কোঠাঘরে গেলাম; গোঁসাই বিছানাহইতে উঠিয়া বসিলেন। বাম হস্তে নিজের 'কপাটি' (কপালটি টিপিয়া ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্য এসেছ?'

আমি দাদার পত্রখানা পড়িয়া শুনাইলাম। মোট কথা এই লিখিয়াছেন—"মহাত্মা ল্যাঙ্গা বাবা আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। এক দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি দূরহইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম 'বাবা, আমার বড় অবিশ্বাস। দয়া করিয়া আমাকে বিশ্বাস দিন।' ল্যাঙ্গা-বাবা তাঁর মাথার জটাগুলি সম্মুখের দিকে কপালের উপর দিয়া ফেলিয়া, তাহার ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে খুব সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া, আমাকে বলিলেন—'আচ্ছা, বাচ্চা, আব্ হো গিয়া। তুমহারা বিশ্বাস বন গিয়া। চলা যাও।' আমি অমনি বাবাজীকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঐদিনহইতে ভগবানের নাম পাওয়ার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করিতে লাগিল। আমি তো কত শত নামই জানি; কিন্তু তাহাতে কিছুই হইবে না, মনে হইল। কেহ আসিয়া যদি আমাকে 'গাছ গাছ' বলিয়াও জপ করিতে বলেন, তাহাই ভগবানের উদ্দেশ্যে জপ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব, মনে হইতে লাগিল। এই সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়া অযাচিতভাবে নাম দিলেন। ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করিয়া, উহা আমি গ্রহণ করিলাম। এখন নাম জপ করিতে গিয়া আমি বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। এ রাজ্য ছাড়িয়া অন্য একটা রাজ্যে প্রবেশ করি, আর আনন্দে ডুবিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ি। ইহা কি নামেরই গুণ, না ল্যাঙ্গা বাবার কৃপারই ফল, জানি না।" ইত্যাদি। পত্রখানি শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন—সুন্দর অবস্থা! শুনে বড় আনন্দ হ'লো। গতবারে তুমি তাঁকে বড় ভাল চিঠি লেখ নাই। ঐ চিঠি আমি তোমাকে যে ভাবে লিখ্‌তে ব'লেছিলাম সেরূপ হয় নাই। ঐ সময়ে তোমার মন যেরকম ছিল তাতে ঐরূপ না লিখে পার না, তা ঠিক। যাক্, এখন গিয়ে তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখ। তিনি যে সাধন করছেন তাই করুন, তাতেই তাঁর মঙ্গল হবে। ল্যাঙ্গা বাবা একজন খুব উঁচু দরের সিদ্ধপুরুষ; তাঁর দৃষ্টির ফল অবশ্যই পাবেন। বিশ্বাস লাভ হ'লেই অনেকটা হ'য়ে গেল। বিশ্বাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়। শেষ অবস্থায় শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তির আবশ্যকতা বোধ হ'লে তখন অন্যের কাছে যেতেই হবে। কিন্তু সে অবস্থাও ত সহজ নয়।

গোস্বামী মহাশয়ের শিরঃপীড়ার ক্লেশ দেখিয়া আমি উঠিতে উদ্‌যোগ করিলাম। আমার কান্না পাইতে লাগিল। বলিলাম—'ভিতরে দারুণ দুরবস্থা! এতকাল আপনার কাছে ছিলাম; এখন কোথায় কি অবস্থায় গিয়া পড়িব! কখন্ কি ক'রে ফেল্‌ব!'

গোঁসাই আমার কথা শেষ না হইতেই বলিতে লাগিলেন—তুমি ত এখন গর্ভস্থ সন্তান! তোমার আর চিন্তার কি আছে? মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান, সন্তান নড়াচড়া কর্‌লে অমনি বুঝ্‌তে পারেন, গুরুও সেইপ্রকার শিষ্যের সমস্ত অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্ব্বদা জান্‌তে পারেন। সন্তান যতকাল ভূমিষ্ঠ না হয়, ততকাল তার কোন ক্ষমতাই ত থাকে না। মা যা কিছু আহার করেন তারই একটু একটু রস নাড়ীর ভিতর দিয়ে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়; শুধু তাতেই গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি হ'তে থাকে। সেইরূপ গুরু যা কিছু লাভ করেন, শিষ্য শুধু তারই অংশ প্রয়োজনমত পেয়ে থাকে। গুরুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যেরও উন্নতি। তার পর, ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেও মা-ই তাকে আহার দেন; প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগাড় করে, মা-ই তাকে লালন পালন করেন। যেপর্য্যন্ত তার চলাফেরার খাওয়া দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জন্মে, ততকাল মা তাকে চোখের আড় করেন না, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। কিন্তু শিষ্য সিদ্ধ অবস্থা লাভ কর্‌লেও সদ্‌গুরু তাকে ছাড়েন না, গুরু তাকে তখনও শিশুর মত কোলে নিয়ে থাকেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে গুরু শিষ্যের সুবিধা দেখেন।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—সংসারে যে সব মেয়ের সন্তান হয় তাদের গর্ভস্থ সন্তান আপন আপন মা'র গর্ভে থেকে সকলেই প্রয়োজনমত মা'র ভুক্ত বস্তুর অংশ পায়। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেও সকল মা-ই যত্নের সহিত সন্তানের প্রতিপালন করেন। এখন তোমার মা'র গর্ভে না জন্মালে কোন ছেলে আর বাঁচ্‌বে না, তার অসুবিধা হবে, অকল্যাণ ঘট্‌বে—এরূপ যদি মনে কর, তা ঠিক হবে না। মা যদি তেমন হন, তোমাদের মা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ যত্নে সন্তানকে লালন-পালন করতে পারেন। তা হ'লে তোমাদের অপেক্ষাও ভালই হওয়ার কথা। মা'র শুশ্রূষায়ই সন্তানের বৃদ্ধি। মা'র গর্ভে জন্মে খুব ভাল শুশ্রূষা পেলে, সন্তান খুব ভাল হবে না কেন? সকলেরই যে এক মা হবে, এমন কিছু নয়।

ভিন্ন ভিন্ন মা'র গর্ভে সন্তান জন্মে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক—ভগবানেরও এই ইচ্ছা। তুমি ফয়জাবাদে যাও, বেশ উপকার পাবে। মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের দর্শনও মিলবে। সকলকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রো। সাম্প্রদায়িকভাব রেখো না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—গুরুতে তেমন নিষ্ঠা না জন্মান পর্য্যন্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা ভাল ?

গোঁসাই। অন্য কি ? অন্য ভেবে অন্যের সঙ্গ করবে না। এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে—এই ভেবে সঙ্গ করলে, সকলের সঙ্গেই উপকার পাবে। রক্তাধারে রক্ত থাকে ; তাই ব'লে কি শরীরের অন্য স্থানে রক্ত নাই ? রক্তের আধার—মূল স্থানই—রক্তাধার। সেইস্থানহ'তে রক্ত সঞ্চারিত হ'য়ে, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়্‌ছে। সমস্ত শরীরে যে রক্ত তাহা ঐ রক্তাধারেরই রক্ত। কিন্তু এ ঠিক্ যে, রক্তাধারে রক্ত না থাক্‌লে শরীরের কোথাও রক্ত থাক্‌তে পারে না। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশক্তি। সঙ্কীর্ণভাব কিছু নয়। সঙ্কীর্ণভাবে বড় অনিষ্ট হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সঙ্কীর্ণ ভাব নয় ?

গোঁসাই। না, ওকে সঙ্কীর্ণ ভাব বলে না। যে রক্তাধারটি ভাল ক'রে জানে সে ইহাও জানে যে, এক রক্তাধারেরই রক্ত নানা পথ দিয়ে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়্‌ছে। সে সর্ব্বত্র একই বস্তু দেখে।

গোঁসাই একটু থামিয়া আবার বলিলেন—

ওখানে গিয়ে সাধনটি গোপনে ক'রো। আর দাদাকে খুব উৎসাহ দিও। আপনাপন সাধন ভজনে নিরুৎসাহ কাহাকেও করতে নাই। ওরূপ করা বড় দোষ। যিনি যে পথেই চলুন না কেন, উৎসাহই দিতে হয় ; কারুকে এই সাধন গ্রহণ করতে অনুরোধ ক'রো না। তোমার দাদাকেও প্রয়োজনমত ভগবানই এর ভিতরে আন্‌বেন।

আমি। সমস্ত সাধনই কি গোপনে করতে হবে ?

গোঁসাই। যত দূর পারা যায়। এসব গোপনেরই জিনিস। খুব সাবধানে থেকো।

গোঁসাই এক হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক সময় আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা

কহিলেন। দারুণ জ্বরে, অসহ্য শিরঃপীড়ায়, আশ্চর্য্য স্থিরভাব দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। বাসায় আসিয়া ঠিক করিলাম, শীঘ্রই বাড়ী যাইব।

স্বপ্ন।—সাধন পাইতে মেজ দাদার ব্যস্ততা।

বাড়ীতে আসিয়া তিন দিন থাকিলাম। একটি স্বপ্ন দেখিলাম—যেন মেজ দাদার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনি অন্তরে দুঃসহ কোনও যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলিয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'শান্তি কিসে হয়, বল্‌তে পারিস্?' আমি বলিলাম—'গোঁসাইয়ের আশ্রয় নিলে শান্তি হয়। তিনি দীক্ষা দিলে সমস্ত যন্ত্রণার মূল কাটিয়া যায়।' মেজ দাদা গোঁসাইয়ের আশ্রয় লইতে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'তিনি কি আমার মত লোককে সাধন দিবেন?' আমি বলিলাম—'তিনি বড় দয়াল; প্রার্থী হ'লে নিশ্চয়ই দিবেন।' এইটুকু বলার পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

৮ই পৌষ, শনিবার।

মুঙ্গের যাইতে আদেশ।

আগামী কল্য পশ্চিমে যাইব। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমতি লইতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। গোঁসাই অসুস্থ। শুনিলাম, তৎকালে কোঠাঘরে ধ্যানস্থ আছেন।

১২ই পৌষ, বুধবার।

আমি গিয়া দরজার বাহিরে প্রণাম করিতেই, তিনি চোখ্ মেলিয়া চাহিলেন। নিজ আসনের একপাশ দেখাইয়া বলিলেন—'এখানে ব'সো'। আমার সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় মেঝেতেই বসিলাম কিন্তু তিনি বারংবার জেদ্ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, আসনের একধারে অন্য একখানা আসন নিয়া বসিলাম। তিনি আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন, কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না। এ সময়ে আর কথাবার্ত্তা বলাও ঠিক নয় ভাবিয়া, আমি বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিলাম। প্রণাম করামাত্র ধ্যানভঙ্গ হইল। আমাকে বলিলেন—কি? কবে যাবে স্থির ক'রেছ?

আমি। আজ রাত্রে।

গোঁসাই। তা হ'লে এখানেই এসে থাক না? দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন খুব নিকটে; এখান থেকে যাবার সুবিধা হবে।

আমি। একেবারেই টিকিট্ করিয়া যাইব। এখানহইতে সে সুবিধা নাই।

গোঁসাই। এখানথেকে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে না হয় টিকিট্ কর্‌বে, সময় যথেষ্ট পাবে; তাতে আর অসুবিধা কি?

আমি। আর কখনও ওরাস্তায় চলি নাই; তাই একেবারে সোজা টিকিট্ করিয়া যাওয়াই সুবিধা মনে করি।

গোঁসাই। তোমার আশঙ্কা যখন হ'চ্ছে, তখন তাই কর। একটু তাড়াতাড়ি ফুল্‌বেড়ে যেতে চেষ্টা ক'রো;—ট্রেণ 'মিস্' হ'তে পারে। কল্‌কাতা গিয়ে বেশী দিন থেকো না; একদিন বিশ্রাম ক'রো; না হ'লে রাস্তায় অসুবিধা হ'তে পারে। তোমার মেজ্‌দা বুঝি মুঙ্গেরে আছেন? মুঙ্গের বড় সুন্দর স্থান। এখন কিছুকাল গিয়ে তাঁরই কাছে থাক; সেখানেই এখন তোমার থাকা প্রয়োজন। বেশ থাকবে, উপকার পাবে। পরে ফয়জাবাদ যেও। উৎসাহের সহিত সাধন ভজন ক'রো; তা হ'লে সব বুঝ্‌তে পারবে। কোনও চিন্তা ক'রো না। ভয় কি?

আমি এই সময়ে একশিশি জলে গোঁসাইয়ের পদাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া চরণামৃত করিয়া লইলাম। চরণামৃত দিতে দিতেই গোঁসাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। গোঁসাইকে সমাধিস্থ দেখিয়া, আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ফুলবেড়ে (ঢাকা) ষ্টেশনে রওনা হইলাম। নবাবপুরপর্য্যন্ত পৌঁছিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল; ট্রেণ 'মিস্' হইল! গোঁসাইয়ের কথামত কাজ করিলে আর এ দুর্ভোগ ঘটিত না।

একটি মেমের মহত্ত্ব।

১৪ই পৌষ, শুক্রবার।

শেষ রাত্রিতে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে একটি মেমের আশ্চর্য্য দয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম। ষ্টীমার সারাদিন পদ্মানদীর উপর দিয়া চলিয়া, সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দ পৌঁছিবে। সহসা পথিমধ্যে একটি অসহায়া নীচজাতীয়া অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না বৃদ্ধার বিষম ওলাউঠা হইল। জাহাজের কর্ত্তারা তাহাকে চড়ার উপরে ফেলিয়া যাইতে পরামর্শ স্থির করিল। বাঙ্গালী বাবু ভ্রাতারা অবিলম্বে সংক্রামক রোগীকে সরাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একটি মেম তখন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া, রোগিনীকে কোলে তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া

গেলেন। দাস্তবমিজড়িত ময়লা কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া, আপন মূল্যবান্ বস্ত্রাদি তাহার ব্যবহারে দিয়া, স্বহস্তেই সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। জাহাজের কর্ত্তাদের নানাপ্রকারে বুঝাইয়া, তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্কল্পহইতে বিরত করিলেন। মেমের সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধাদির ফলে রোগিণী ক্রমে অনেকটা সুস্থ হইল। দেশীয় লোকের যে অবস্থায় সহানুভূতি হইল না, উচ্চবংশীয়া, অবস্থাপন্না খাসবিলাতী মেমের সেস্থলে এরূপ অসামান্য দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মেমটির সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমি উহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। রোগিণীর সেবা করিতে করিতে মেম আমাকে বলিলেন—'ভাই, তুমি যীশুখ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস কর?' আমি বলিলাম—'হাঁ, তিনি মহাপুরুষ, মুক্তি দিতে পারেন। তাঁহার উপরে আমার খুবই উচ্চ ভাব আছে।' মেম বলিলেন—'তুমি যাহাকে উচ্চভাব বলিতেছ, তাহা অপেক্ষা নীচ ভাব যীশুখ্রীষ্টের উপরে কখনও মানুষের হওয়া সম্ভব কি? তুমি তাঁকে মহাপুরুষ বল।' যীশুখ্রীষ্টের প্রতি মেমের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু তবু আমি তাঁহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিলাম। মেমটি বিশেষ কোনও তর্ক না করিয়া কহিলেন—'ভাই, সত্য বুঝিবার জন্য বহুকাল আমি তর্ক করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়াছি; কিছুই বুঝি নাই; শান্তিও পাই নাই। সত্যবস্তু কখনও শুধু তর্কের দ্বারা নিরূপিত হয় না। অসত্যকেও তর্কের দ্বারা সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সত্যকে জানা যায়। যীশুকে বিশ্বাস কর। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারিবে।' মেমের এই কথা কয়টি আমার খুব ভাল লাগিল।

সতীশের প্রতি গোঁসাইয়ের কৃপা।

১০ই পৌষ,
শনিবার।

প্রত্যূষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'গোঁড়া' ব্রাহ্ম ছিলেন, কিছুকালযাবৎ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। অল্পদিনের ভিতরেই গোস্বামী মহাশয়ের উপরে ইঁহাদের অসাধারণ নির্ভর ও ভক্তি জন্মিয়াছে, আলাপে জানিলাম। সতীশের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা তাঁহারই মুখে শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইলাম। সতীশ বলিলেন—'ভাই, যৌবনের প্রারম্ভহইতেই রিপুর উত্তেজনায় পড়িয়া কত কাণ্ডই না করিয়াছি! সাধন গ্রহণ করিয়া ভাবিলাম, এবারে সকল উৎপাতহইতে নিষ্কৃতি পাইলাম'। কিন্তু কাজে তাহার কিছুই হইল না, বরং ওসব আরও বহুগুণ বৃদ্ধিই পাইল। গোস্বামী মহাশয়ের

উপরে আমার ভয়ানক অভিমান আসিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন সাধন করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ অদম্য উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িলাম। তখন 'সাধন আর করিব না', 'গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাইব না' এইপ্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে অন্য ঘরহইতে গোঁসাই পুনঃ পুনঃ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে যাইবামাত্র তিনি আমাকে খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—"সতীশ! আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দেও তো'। আমি, নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া, অভিমানের সহিত একটু তেজ করিয়া বলিলাম—'না, তা আমি পারবো না।' গোঁসাই একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—'রাগ্ করছ কেন? মাথাটা আমার জ্ব'লে যাচ্ছে, একটু তেল দিয়ে দেও না, এসো।' আমি এক গণ্ডূষ তেল লইয়া গোঁসাইয়ের মাথায় দিতে লাগিলাম। মাথায় তেল দেওয়া গোঁসাইয়ের কোন কালে অভ্যাস নাই; অথচ, আমাকে বলিতে লাগিলেন—'দেও, দেও। আমার মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে আমার যে একটা কি অবস্থা হইল জানি না—শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, আজপর্য্যন্ত যতগুলি স্ত্রীলোকের উপর আমার কুভাব হইয়াছে, একটি একটি করিয়া তাহারা কামোন্মত্তা হইয়া আমার দিকে আসিতেছে এবং পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। ভয়ে ও লজ্জায় আমি জড়সড় হইতে লাগিলাম। তখন গোঁসাই বলিতে লাগিলেন—'দেও, বেশ ক'রে দেও; যতটা তেল আছে সবটাই বেশ ক'রে ধীরে ধীরে ব'সিয়ে দেও।' স্ত্রীলোকগুলি কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া কোথায় যে গেল তাহা লক্ষ্য করিবারও অবসর পাইলাম না। একটা কেমন যেন নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম। সকলে চলিয়া গেলে পরে গোঁসাই বলিলেন—'সবটা তেল শুষে গেছে? তা হ'লে যাও।' জাগ্রত অবস্থায় এইপ্রকার অদ্ভুত স্বপ্নবৎ ব্যাপার দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তেলের দিকে বা গোঁসাইয়ের মাথার দিকে মনোযোগ একেবারেই তখন ছিল না। গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া আমার চমক্ ভাঙ্গিল। তখন মাথার দিকে চাহিয়া দেখি—একবিন্দুও তেল নাই। সেইদিনহইতেই কিন্তু আমার কামভাব একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কখনও যে ছিল তাহাও এখন কল্পনা করিতে পারি না। এই ঘটনা মনে পড়িলেই আমার কান্না পায়। কেবল ইহাই মনে হয়, আমার যন্ত্রণা দেখিয়া দয়া করিয়া গোঁসাই আমার সমস্ত কুভাবগুলি নিজেই মাথা পাতিয়া নিলেন।

আদেশ-লঙ্ঘনে দুর্ভোগ।

দুই দিন কলিকাতায় থাকিয়া হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া মুঙ্গেরের টিকিট্ করিলাম। অমনই গাড়ীর বাঁশী বাজিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গাড়ীর সম্মুখে গেলাম। গাড়ীর দরজা পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। ট্রেণ 'ফেল' হইলাম বুঝিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটি ভদ্রলোক আমার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন—'উঠুন, শীঘ্র উঠে পড়ুন; দরজা খুলে দিচ্ছি।' আমি অমনই চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিলাম। রাত্রি ১২টার সময়ে মুঙ্গের পৌছিলাম।

১৮ই পৌষ।

একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া মেজ দাদার বাসায় চলিলাম। উপস্থিত হইয়া জানিলাম—'মেজ দাদা অন্যবাসায় উঠিয়া গিয়াছেন। সহরে একঘণ্টা কাল ঘুরিয়াও মেজ দাদার নূতন বাসার কোনও খোঁজ খবর পাইলাম না। এক্কাওয়ালা বিরক্ত হইয়া আমাকে জোর করিয়া পথের মধ্যে একটা স্থানে নামাইয়া দিল। তাহাকে আমি একটি পয়সাও দিলাম না। মোট গাঁঠ্রী ও বিছানা ইত্যাদি লইয়া বড় রাস্তার উপরে, সেই অন্ধকার রাত্রিতে অর্দ্ধঘণ্টা কাল একটা স্থানে বসিয়া রহিলাম। গুরুদেবের কথামত একদিন মাত্র কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া আসিলে এই দুর্ভোগ হইত না, মেজ দাদাকে পুরাতন বাসাতেই পাইতাম, পরে বুঝিলাম। যাহা হউক, রাত্রি ২টার সময়ে বিপন্ন হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার অপরীসীম কৃপার গুণেই হউক, অথবা আকস্মিক ঘটনাবশতঃই হউক, এই সময়ে একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, —'ক্যা বাবু! হিয়াঁ কাহে বৈঠা হ্যায়্? মুজ্রা চাহি?' আমি মেজ দাদার নাম ও পরিচয় দিয়া তাহাকে বলিলাম—'আমাকে তাঁহার নূতন বাসায় পৌছাইয়া দিতে পার?' মুটে বলিল—'বাবু কো হাম্ পচান্তা হ্যায়্। চলিয়ে!' অতঃপর আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া মেজ দাদার বাসায় পৌছিলাম। মজুরকে পয়সা দেওয়ার সময়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, টাকার থ'লেটি নাই! বুকের উপরে আঁটা কোটের পকেটে ৮টি টাকা ছিল; উহার উপরে দুইটি জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও থ'লেটি কি করিয়া যে হারাইয়া, গেল বুঝিলাম না! মনে হইল, এক্কাওয়ালার উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করায় গুরুদেবই কৃপা করিয়া আমাকে এই দণ্ড দিলেন। সমস্তটি রাস্তায় অন্য একটা শক্তির খেলা হইয়া গেল, দেখিয়া গোঁসাইয়ের উপরে আমার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যে ভাবে তিনি তাঁহার চরণে এই চিত্তটিকে টানিয়া লইতেছেন, ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি।

১ম স্বপ্ন—কষ্টহারিণীর ঘাটের সংলগ্ন গুপ্ত পথের রহস্য।

২০শে পৌষ, বৃহস্পতিবার; ১২৯৫।

গত কল্য বিকালবেলা মেজ দাদা আমাকে কষ্টহারিণীর ঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে এমন সুন্দর স্থান চক্ষে না দেখিলে আমি কল্পনাও করিতে পারিতাম না। ঘাটটি যেন গঙ্গার মধ্যেই রহিয়াছে। ঘাটের দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে কলকল রবে নির্ম্মল জলরাশি বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বিশাল গঙ্গার অপর পারে কেবল কাল মেঘের মত পাহাড়-শ্রেণী দেখা যায়। ঘাটে বসিয়া এত ভাল লাগিল যে রাত্রিটি ওখানেই কাটাইতে ইচ্ছা হইল। স্নেহ-বশতঃ মেজ দাদা আমার সে সঙ্কল্পে সম্মতি দিলেন না। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে বাসায় আসিলাম।

শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—'বেলাবসানে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম; ঘাটের ধারে বহুকালের একটি পুরান পাকা পথ গঙ্গার ভিতর দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে, উপর হইতে দেখিলাম। নদীর তলা দিয়া রাস্তা; উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। আমি ধীরে ধীরে ঐ পথ ধরিয়া চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অন্ধকারে কিছুই আর দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্র সূর্য্যের আলো ওখানে প্রবেশ করে না। হাতে একটি মশাল লইয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তা ভয়ঙ্কর দুর্গম; জল কাদায় আমার উরুপর্য্যন্ত বসিয়া যাইতে লাগিল। নানাপ্রকার ধ্বনি ও ভয়ানক গণ্ডগোল শুনিতে লাগিলাম। সম্মুখে কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতেছে, মনে হইল। বোধ হইল বিস্তৃত গঙ্গার এক-চতুর্থাংশ পথ আসিয়াছি। রাস্তার ক্লেশে ও বিভীষিকার আতঙ্কে আমার শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। দুঃখিত মনে কষ্টহারিণীর ঘাটে আসিয়া বসিলাম। এই সময়ে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিতে পাইলাম। তিনিও ঐ পথে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"তুই এখানে কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাস্তাটি কোথায় শেষ হয়েছে? আপনার সঙ্গে গিয়া দেখ্‌ব।" ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন—"তুই তা পার্‌বি কেন? বেশী দূরে এ পথে যাওয়া যায় না—বন্ধ; আর ভয়ও আছে।" আমি বলিলাম—"এ পথ বন্ধ হ'ল কেন? কে বন্ধ করেছে?" ব্রহ্মচারী—"এই পথটি সোজা গঙ্গার মধ্যপর্য্যন্ত। তার পর ওদিকে গিয়েছে।" পথটি কোথায় গিয়েছে সমস্ত জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় তুলিয়া নিয়া ঘাটের সোজা গঙ্গার মধ্যস্থলে গেলেন।

পরে, পশ্চিমোত্তর কোণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, নৌকা থামাইয়া বলিলেন—"কয়েকটি মহর্ষি এবং প্রধান প্রধান যোগী পাহাড়ের পাশে গঙ্গার নীচে এইস্থানে একটি আশ্রম করিয়া রহিয়াছেন। আশ্রমটি খুব নিভৃত, বহুস্থান লইয়া বিস্তৃত। মহাপুরুষদের কয়েকজন শিষ্যমাত্র সঙ্গে আছেন। এই আশ্রমটির সহিত ঐ গঙ্গারধারের পথটির যোগ আছে। এখানহইতে ভিতরে ভিতরে একটি গুপ্ত পথ গিয়া ঐ স্থানে ঐ পথে মিশিয়াছে। পাছে কেহ সেই গুপ্ত পথ দিয়া আশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তারা বড় রাস্তার স্থানে স্থানে কাদা জল দিয়া বিষম দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বিষধর সর্পের আবাসও হইয়াছে। ঐ বড় রাস্তা ধরিয়া, এই কারণে, কাহারও আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার যো নাই।"

আমি। "আশ্রমে প্রবেশের কি অন্য পথ নাই?"

ব্রহ্মচারী। আরও দু'টি পথ আছে, তা জেনে তোর লাভ কি? ওপথে প্রবেশ করিতে তোর এখনও ঢের দেরী।

আমি। আপনি দয়া ক'রে একটি পথ আমাকে দেখা'য়ে দিন। আমি এখন প্রবেশের চেষ্টা করব না; পথটা শুধু জানা থাকুক্।

আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, নৌকাহইতে নামিয়া, গঙ্গার উত্তর পারে ঘাটের বিপরীত দিকে পাহাড়ে লইয়া চলিলেন; বলিলেন—"এই যে সুন্দর পাথরগুলি দেখিতেছিস্, ইহার নীচ দিয়া উঁহাদের আশ্রমের দিকে একটি রাস্তা আছে। চল্, সেই পথে প্রবেশের দ্বার তোকে দেখাইয়া দি।" এই বলিয়া, কতকদূর অগ্রসর হইয়া, ৮।৯ ফুট লম্বা, অর্দ্ধ হস্তেরও কম প্রশস্ত, একটি ফাটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে পাথরের চটাঙ্গের ভিতর দিয়া ফাঁক্ দেখ্‌ছিস্ এই একটি পথ।" আমি উহার ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কোনও স্থান অত্যন্ত গভীর অন্ধকারময়, কোন কোন স্থানে জ্বলন্ত কয়লার মত অগ্নি জ্বলিতেছে; আবার কোন কোন স্থানে অনবরত ধূম নির্গত হইতেছে। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"এই পথটি সহজে কাহারও নজরে পড়ে না। দিনের বেলায় সামান্য সামান্য ধোঁয়া উঠিতেই মাত্র দেখা যায়। যতই রাত্রি অধিক হয়, এই সমস্তটা চটাঙ্গের ফাঁক্ অগ্নিময় হইয়া যায়। বহুদূরহইতেও এই অগ্নি লোকের চক্ষে পড়ে। তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই আগুনের ভিতর দিয়া আশ্রমে গিয়া প্রবেশ কর্!"

আমি সেই অগ্নি দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম—'এর ভিতরে আমি যাইতে পারিব না। অন্য পথ বলিয়া দিন।' ব্রহ্মচারী আমার এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বটে? পথের না বড় খোঁজ্ নিচ্ছিলি, যা এখান হ'তে চলে যা?" এই বলিয়া তিনি আর

তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া গঙ্গার পারে যাইয়া নৌকায় চড়িলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। নৌকা যেদিকে যাইতে লাগিল, তীরে তীরে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম। ব্রহ্মচারী চীৎকার করিয়া বলিলেন, " এখন চলে যা, চলে যা। "

এই শব্দ শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি পরিষ্কার যেন চক্ষে ভাসিতে লাগিল। সকাল বেলায় উঠিয়া মেজ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—' কষ্টহারিণীর ঘাটের নিকটে কি কোন পুরাতন গুপ্ত রাস্তা আছে ? ' মেজ দাদা বলিলেন—" হাঁ, নবাবী আমলের একটি পথ আছে। তা বহুকাল একেবারে বন্ধ। " আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। পথটি দেখিতে বিকাল বেলা মেজ দাদার সঙ্গে কষ্টহারিণীর ঘাটে গেলাম। দেখিয়া কতকক্ষণ একেবারে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কষ্টহারিণীর ঘাটের প্রায় ৫০।৬০ হাত দক্ষিণে এই পথটি রহিয়াছে। ক্রমশঃ নীচু হইয়া রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার ভিতরে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। জল এ সময়ে কম বলিয়া, রাস্তাটির উপরকার প্রকাণ্ড খিলান ক্রমশঃ যে লম্বাভাবে গঙ্গার গর্ভে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ঘাটহইতে বেশ স্পষ্টই দেখা যায় ; কিন্তু এই খিলান রাস্তা কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। শুনিলাম, কিছুকাল পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ' ডিয়ার ' সাহেব বহু অর্থব্যয়ে এই পথটি খুলিতে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন। নানাপ্রকার ভয় ও বিভীষিকা দর্শন করিয়া এবং বহুবিধ বাজনার আওয়াজ শুনিয়া, মুজুরেরা নাকি কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে। বড় বড় বিষধর সর্প উহার ভিতরে আছে, মনে করিয়া সাহেবও অসম্ভব সঙ্কল্পে ক্ষান্ত হন। অনেকেই বলেন যে, নবাবদের দুঃসময়ে পলাইবার জন্য ইহা গুপ্ত পথ ছিল ; আবার কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন যে খিলানের অন্দরে আবরণের ভিতরে থাকিয়া নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে বেগমদের স্নানের জন্য কোনও নবাব একটি নিভৃত ও গুপ্ত ঘাট করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না।

পীরপাহাড় ও সীতাকুণ্ড।

এই স্বপ্নদর্শনের পরহইতে মেজ দাদার সঙ্গে প্রায়ই কষ্টহারিণীর ঘাটে যাইতেছি।

২৩শে পৌষ, রবিবার।

সন্ধ্যার পরে ঘাটের বিপরীত দিকে, গঙ্গার অপর পারে, পাহাড়ের উপরে, একটা চঞ্চল অগ্নি নিত্যই দেখিতেছি। অগ্নিটি স্থির নয় ; মনে হয় যেন ৮।১০ হাত স্থান ব্যাপিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। সহরের বাবুদিগকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন—' এ অগ্নি অধিক রাত্রে, অন্ধকার-পক্ষে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা বহুকালযাবৎ এই অগ্নি দেখিয়া আসিতেছি। কিসের অগ্নি, কোথায় অগ্নি, তাহা

আমরা জানি না।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বপ্নে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠিক ঐ পাহাড়ের যে স্থানে ফাটা চটাঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, এই অগ্নি ঠিক সেই স্থানেই দেখিতেছি!

মেজ দাদার সঙ্গে এক দিন পীরপাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মুঙ্গেরহইতে পীর-পাহাড় বেশী দূরে নয়। পীরপাহাড়ে উঠিয়া একটি কবর দেখিলাম। একটি মুসলমান ফকির ওখানে নমাজ পড়িতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে কবরটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন—'বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কোনও একটি ফকির ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ পরিবার ও বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসেন। এখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া, তিনি কঠোর সাধন ভজন করিয়া পীর হন। দেহত্যাগ করিলে এখানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। সেই অবধি তাঁহারই নামে এই পাহাড়কে পীরপাহাড় বলে। পীর সাহেব অদ্ভুতশক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।' স্থানটি দেখিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল পীর সাহেবের কবরের পার্শ্বে বসিয়া নাম করিলাম। গুরুদেব একবার কথাপ্রসঙ্গে এই পীর সাহেবের প্রভাব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'একদিন পীরপাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ চারিদিক্ অন্ধকার ক'রে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি এল। বিষম বিপদ্! চেয়ে দেখি কোথায়ও মাথা রাখ্‌বার একটু স্থান নাই। কি আর কর্‌বো? পীর সাহেবের কবরের পার্শ্বে স্থির হ'য়ে বসে রইলাম। ফকির সাহেবের অদ্ভুত প্রভাব! বৃষ্টিতে আমার চার দিক্ ভেসে গেল, কিন্তু আমার শরীরে এক ফোঁটা জলও পড়্‌লো না।' পীরপাহাড়ের কথা গুরুদেবের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ফকির সাহেবের কবর প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিলাম। বড়ই ভাল লাগিল। এস্থানে ভগবানের নাম করিয়া একটু বিশেষ অনুভূতি হইল। গুরুদেবকে একান্ত মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—যেন এইরূপ নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার সুযোগ তিনি ঘটাইয়া দেন।

পীরপাহাড়হইতে সীতাকুণ্ড অধিক দূর নয়। আমরা সীতাকুণ্ডে গেলাম। শুনিলাম সীতাদেবী এই কুণ্ডে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়াছিলেন বলিয়া কুণ্ডটির নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আন্দাজ ১০।১২ ফুট হইবে। কত গভীর বুঝিলাম না। স্থানে স্থানে জলের নীচে প্রস্তর দেখা যায়। অবিশ্রান্ত অত্যুষ্ণ ফুটন্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিতেছে, হাতে স্পর্শ করিবার যো নাই। কুণ্ডহইতে অতিরিক্ত জল নিকাশের জন্য একটি বাঁধান নালা আছে। কেহ কুণ্ডে হঠাৎ পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু অবধারিত।

এইজন্য সেই চতুষ্কোণ কুণ্ডের চারি ধারে লোহার ‘রেলিং’ (বেড়া) রহিয়াছে। রামকুণ্ড ও ভরতকুণ্ড সীতাকুণ্ডের কয়েক হাত তফাতে। এসব কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হওয়ার পরই আমার পিতৃপুরুষদিগকে অকস্মাৎ মনে পড়িল। তাঁহারা যেন আমার হাতহইতে এই কুণ্ডের জল পাইবার প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এই রকম একটা ভাবে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহা কি স্থান প্রভাব না অন্য কিছু জানি না। শ্রাদ্ধতর্পণাদি আমি চিরদিনই কুসংস্কার বলিয়া মনে করি; কিন্তু আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। রামকুণ্ডে ও ভরতকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক, কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ডের নালায় গিয়া স্নান করিলাম। স্নানে বড় আরাম বোধ হইল। পিতৃপুরুষদের স্মরণ করিয়া ২।৪ গণ্ডূষ জল দিতেই হুহু করিয়া আমার কান্না আসিয়া পড়িল। ভিতরে একটা অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যুগ-যুগান্তহইতে সরলবিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ অসংখ্য লোকের যে ভাবপ্রভাবে এ স্থানের অধঃ ঊর্দ্ধ ও চতুঃসীমা পরিব্যাপ্ত, আজ বোধ হয় তাহাতেই আমার চিত্তকে এমন অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই স্থানে গুরুদেবের কৃপার বিশেষ নিদর্শনও পাইলাম।

স্বপ্নের সাফল্য। মুঙ্গের আগমনের সার্থকতা। মেজ দাদার সাধনপ্রার্থনা ও গোঁসাইয়ের সম্মতি।

মুঙ্গেরে আসিয়া বড়ই আরামে দিন যাইতেছে। আজ মেজ দাদা আমাকে কথায় কথায় কহিলেন—‘প্রাণে একটা শান্তি কিছুতেই আসিতেছে না। কি করিলে প্রাণে শান্তি হয়?’ আমি অমনই বলিলাম—‘গোঁসাইয়ের আশ্রয় নিলে শান্তি হয়। তিনি যে সাধন দেন তাহা গ্রহণ করিয়া সেইমত করিতে পারিলে, অন্তরে কখনও অশান্তি আসে না।’ মেজ দাদা বলিলেন—‘তিনি কি আমার মত লোককে দীক্ষা দিবেন?’ আমি বলিলাম—‘আপনি ভাল করিয়া একখানি পত্র তাঁহাকে লিখিয়া দিন। নিশ্চয়ই তিনি সাধন দিবেন।’

আমার কথামত মেজ দাদা গোঁসাইকে পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে উত্তর আসিল। গোঁসাই লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু!

আপনার পত্র পাইলাম। আপনাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যেপর্য্যন্ত দেখা না হয়, মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ জানাইবেন। কুলদাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গোঁসাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই মেজ দাদার আশা পূর্ণ হইবে, গোঁসাইয়ের এইপ্রকার আশ্বাসবাণী পাইয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নটি আমার এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ফয়জাবাদে যাওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত করিয়া গোঁসাই আমাকে তখন মুঙ্গেরে পাঠাইলেন কেন, তাহারও তাৎপর্য্য এতদিনে বুঝিলাম। এখন তো দেখিতেছি দীক্ষাগ্রহণের পরহইতেই জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গুরুদেব যেন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমার সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা করিতেছেন। ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অক্ষমতা নিবন্ধন বিস্ময়বশতঃই আমার এরূপ সংস্কার জন্মিতেছে—না, যথার্থই এসব ব্যাপারে গুরুদেবের কোনও হাত আছে, পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। চিত্ত কিন্তু গুরুদেবের দিকে আপনা আপনিই টানে।

মুঙ্গেরে আসিয়া জল-বায়ুর গুণে শরীর একটু সুস্থ আছে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি; সাধন ভজনেও উৎসাহ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষরাত্রে উঠিয়া প্রাণায়াম কুম্ভক করি। অতি প্রত্যূষে হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসি; বেলা ৭॥ টা পর্য্যন্ত ত্রাটক্ সাধন করিয়া, মেজ দাদার সঙ্গে চা পান করি। পরে ৯॥ টা পর্য্যন্ত আবার নাম সাধন করিয়া কাটাই। ১০॥ টার মধ্যে আমাদের স্নানাহার সব শেষ হইয়া যায়। তৎপরে স্থিরভাবে আসনে অপরাহ্ণ ৪॥ টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকি। স্কুলের কাজ সারিয়া মেজ দাদা বাসায় ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দিন শেষ হইয়া যায়। সন্ধ্যার পর রাত ৯॥ টা পর্য্যন্ত বিশেষ আর কোনও কাজ হয় না। আহারান্তে নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন করি। এইভাবে আমার সময় কাটিতেছে।

২য় স্বপ্ন।—ফুলগাছের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

পৌষসংক্রান্তি, ১২৯৫।

এই দুই বৎসরের মধ্যে আমি কোনও বৃক্ষের ডালা, পাতা, ফুল বা ফল ছিঁড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। জীবন্ত বৃক্ষের আমাদেরই মত অনুভব-শক্তি আছে—গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ইহা শুনিয়া আমারও তদবধি ঐবিষয়ে একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। গাছের ডালা পাতা কাহাকেও ছিঁড়িতে দেখিলে ভাল লাগে না; বড়ই কষ্ট হয়। এমন কি, মেয়েরা যেখানে রান্নার জন্য তরকারী কুটেন সে স্থানেও থাকিতে পারি না; দেখিলে প্রাণে লাগে। মেজ দাদা কতকগুলি ফুলগাছ বারেন্দার ছাদে আমার কোঠার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদিন সকালে বিকালে এই গাছগুলিকে

আমি নিজ হাতে জল দেই। চাকরাণী জল দিতে চায়; কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর বারেন্দার ছাদ আমাদেরই ছাদের একেবারে সংলগ্ন; উভয় বাড়ীর এক ছাদ বলিলেই হয়; মধ্যে সামান্য ১॥ হাত উচ্চ একটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক্ করা আছে। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টার শ্রীযুক্ত অধর বাবু পাশের বাড়ীতে থাকেন। তিনিও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ আনিয়া আমাদের ছাদের লাইন্ ধরিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুই ছাদের ফুলগাছের শোভা দেখিয়া বড়ই অহ্লাদ হয়। রাত্রি ৩ টার সময়ে নাম করিতে করিতে এক দিন নিদ্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—আমাদের ফুলগাছে আমি জল দিতেছি; অধর বাবুর ছাদের ৩ টি ফুলগাছ অকস্মাৎ নড়িয়া উঠিল এবং আমাকে ডাকিয়া খুব কাতরভাবে বলিল—'ওহে! আমাদের দিকেও একবার তাকাও। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তোমার কষ্ট হয় না? জলপিপাসায় আমাদের যে প্রাণ যায়। তোমার হাতে একটু জল চাই। না হ'লে আমরা আর বাঁচিব না।' স্বপ্ন দেখিয়াই জাগিলাম। মনটি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। নাম করিয়া কোন মতে ভোর পর্য্যন্ত কাটাইলাম। সকাল বেলা দেখি, সেই গাছ কয়টি বেশ সতেজ। ভাবিলাম 'এলোমেলো স্বপ্ন অনেক সময়েই তো দেখা যায়, ইহাও বোধ হয় তাহাই।' যাহা হউক মনের ভিতরে একটা খট্‌কা লাগায় অধর বাবুর চাকরাণীকে সকলগুলি গাছেই খুব প্রচুর পরিমাণে জল দিতে বলিলাম। চাকরাণী তাহাই করিতে লাগিল। অপর বাড়ীর ছাদে যাইয়া নিজের হাতে জল দিতে আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইল। স্বপ্ন দেখার পরহইতে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া আমি ঐ গাছ কয়টি দেখিয়া আসিতেছি। আজ চতুর্থ দিন, সকালে উঠিয়া দেখিলাম, আশ্চর্য্য ব্যাপার—এক রাত্রিতে সেই ৩ টি তাজা গাছই একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে! এ কি অদ্ভুত ঘটনা, বুঝিতেছি না। কোন পারলৌকিক আত্মা আমার হাতে জলপ্রত্যাশায় এই ফুলগাছ কয়টি আশ্রয় করিয়া ছিলেন কি না জানি না। গাছ কয়টির অবস্থা দেখিয়া অনুতাপে আমার অন্তর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি গাছ ৩ টির জীবনী-শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া ৩ গণ্ডূষ জল উর্দ্ধদিকে ছিটাইয়া দিলাম ইহাতে আমার প্রাণের জ্বালার কতক উপশম হইল।

৩য় স্বপ্ন। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যাত্রা। গুরুনিষ্ঠার উপদেশ।

৮ই মাঘ, ১২৯৫; রবিবার।

আজ অধিকরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বহুজনসমাকীর্ণ একটি বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। নদীর পারে, বাজারের ধারে, অসংখ্য নানা রঙ্গের ছোট বড় নৌকা দেখিতে পাইলাম। গোস্বামী মহাশয় একখানা প্রকাণ্ড বজরায় উঠিয়া সমস্ত শিষ্যবর্গকে তাহাতে তুলিয়া লইলেন। গঙ্গাসাগরে যাওয়াই আমাদের

উদ্দেশ্য; গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বকার বিশেষ বন্ধু কোনও একজন মহাত্মা আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার নৌকায় এস না? খুব আরামে যাবে। আমিও তো গঙ্গাসাগরেই যাইতেছি।' আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলাম না। তিনি শীঘ্র যাইবেন বলিয়া ছোট নদীর সরল পথে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। গোস্বামী মহাশয় সুবিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের অনুকূল স্রোতে বজরাখানা ছাড়িয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাতাসও আমাদের সহায় হইল। গোঁসাই, 'পাল'টি তুলিয়া দিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রকাণ্ড বজরাখানা শোঁ শোঁ করিয়া চলিল। গোঁসাইয়ের কথামত আমরা সকলেই এক একখানা বৈঠা হাতে লইয়া, নৌকা বাহিতে লাগিলাম। কিন্তু অতি দ্রুতগামী নৌকায় বৈঠা ফেলিয়া চাপ দিবার আর অবসর ঘটিল না—বৈঠা জল স্পর্শ করিতে না করিতে নৌকা কোথায় ছুটিয়া যাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় তখন খুব উৎসাহ দিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বৈঠা তোলা ফেলা মাত্রই সার, ইহা বুঝিয়া আমরাও অবশেষে হাত গুটাইলাম। নদীর তীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গসাগরের নিকটবর্ত্তী একটি চড়ায় পৌঁছিলাম। নৌকা সেখানে লাগান হইল। চড়ায় নামিয়া সকলে আনন্দের সহিত স্নানাহার করিলাম।

এই সময়ে দেখি সেই মহাত্মাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোজাসুজি শীঘ্র আসিবেন ভাবিয়া যে নদীপথ ধরিয়া আসিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে তাহাতে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। প্রতিকূল স্রোতে ও উল্টা ঝট্‌কা বাতাসে তাঁহার নৌকাখানি বিষম বিপন্ন হইয়াছিল। গত্যন্তর না দেখিয়া, প্রাণপণে 'দাঁড়' টানিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি আসিয়া আমাদের বজরা ধরিলেন; এবং তাঁহার সেই ছোট 'ডিঙ্গী' নৌকাটি উহাতেই বাঁধিয়া দিলেন। 'এখন নিশ্চিন্ত হইলাম,' বলিয়া পরে তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। এদিকে গোসাইয়ের আদেশে আমাদের বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

আমি মহাত্মাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভগবান্‌কে লাভ করার সহজ উপায় কি?' সাধু বলিলেন—"ভগবানের যথার্থ নামে নিয়ত তাঁহাকে ডাকলেই সহজে তাঁকে লাভ করা যায়।"

আমি। ভগবানের আবার যথার্থ নাম নকল নাম আছে নাকি?

সাধু। যে নামে ডে'কে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ ক'রেছে তাঁর মুখে সেই নামই ভগবানের যথার্থ নাম।

আমি। বস্তু যত দিন অজ্ঞাত ছিল, তার একটা নাম হইবে কি প্রকারে? আগে বস্তু, পরে তো নাম?

সাধু। কোন এক সময়ে ভগবানেরই বিশেষ কৃপায় এক শ্রেণীর লোক জন্মেছিলেন, যাঁরা তাঁরই কৃপায় তাঁকে লাভ ক'রেছিলেন। তাঁরা, সাধারণের জন্য, ভগবান্‌কে লাভ করার যে সকল উপায় নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন, আমাদের মাত্র তাই অবলম্বন। সহজে ভগবান্‌কে লাভ করতে হ'লে সে সকল প্রণালী অনুসরণ ব্যতীত আর উপায় নাই।

আমি। আমার এখন কি কর্ত্তব্য, ব'লে দিন। গুরুকরণ তো আমার হ'য়েছে; প্রণালীও পেয়েছি।

সাধু। "তোমার আর চিন্তা কি? সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছ। তাঁর উপদেশ মত চল্‌লেই সহজে ভগবান্‌কে লাভ করবে। তোমার গুরুদেবের কিছুই অজ্ঞাত নাই।"

স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! মহাত্মারাও এই ভাবে স্বপ্নযোগে দয়া করিয়া গুরুনিষ্ঠার উপদেশ দেন। জানি না কবে অবিচারে গুরুর আদেশ-পালনে আমার মতি হইবে।

কষ্টহারিণী ও মুঙ্গের নামের সার্থকতা।

১১ই মাঘ, বুধবার।

প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহ্নে আহারান্তে কষ্টহারিণীর ঘাটে যাই। সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া নাম করি। ঘাটটি বড়ই মনোরম। একটু সময় বসিলেই গঙ্গার হাওয়ায় ও স্থানের প্রভাবে দেহমনের সমস্ত জ্বালাই যেন একেবারে নিবিয়া যায়, চিত্ত বিনা চেষ্টাতে আপনা আপনিই স্থির জমাট হইয়া পড়ে। গঙ্গার উপরে এমন সুন্দর ভজনস্থান আর কোথাও আছে কি না জানি না। ঘাটটি ঠিক যেন গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে। দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে গঙ্গার দৃশ্য অতি চমৎকার! সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট ভজনালয় ঘাটের উপরেই রহিয়াছে। এ সব কুটীরে সর্ব্বদাই সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটের উপরে কষ্টহারিণী প্রতিষ্ঠিতা। ইঁহারই নামে এই ঘাটের নাম কষ্টহারিণী হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও উদাসীনেরা এই স্থানে নির্ব্বিবাদে আপন আপন আসনে ভজনে নিবিষ্ট হইয়া আছেন। এই স্থানে আসিলে আর বাসায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এপর্য্যন্ত যে সব স্থান দেখিয়াছি তন্মধ্যে এই স্থানটি সাধন ভজনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। সাধু-সজ্জনদের ভজনগুণে এই স্থানে ভগবচ্ছক্তির এমনই একটি আশ্চর্য্য প্রভাব জাগ্রত রহিয়াছে যে ঘাটে উপস্থিত হইলে যথার্থই অন্তরের সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত হইয়া যায়। 'কষ্টহারিণী ঘাট' এই নামটি সার্থক বলিয়া অনুভূত হয়।

শুনিতে পাইলাম প্রাচীনকালে এখানে 'মঙ্গু' ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া সহরের নামও মুঙ্গের হইয়াছে।

৪র্থ স্বপ্ন।—গুরুর আদেশ পালনে সঙ্কোচ।

১৭ই মাঘ, ১২৯৫।

আজ ভোর রাত্রিতে আবার একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। সহস্র গুরুভ্রাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে একটি বাঁধান ঘাটে সমবেত হইয়াছি। সকলেই আপনার মনে স্নান করিতেছেন। আমি ঘাটের সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ সময়ে দেখি, গুরুদেব একদিক্‌হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে শন্ শন্ করিয়া আসিতেছেন। উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদেরই মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ধরিতেছেন; তাঁহাদিগকে ধরিয়া কি বলিতেছেন বা কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিলাম না। গুরুদেব ক্রমে যতই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, আমার ততই ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমাকেও ধরেন। অকস্মাৎ দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে সকলকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া আমাকেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'শীঘ্র ন্যাংটা হও, তোমার সর্ব্বাঙ্গে আমি একবার হাত বুলা'য়ে দি। একটা দুর্লভ অবস্থা লাভ কর্‌বে।' গুরুদেব এই কথা বলামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, উপস্থ চঞ্চল হইল। হঠাৎ দুর্দ্দম কামের উত্তেজনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন গুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম—'আমাকে দু'মিনিট কাল একটু অবসর দিন, আমি স্থির হ'য়ে নি।' গোঁসাই পুনঃ পুনঃ ন্যাংটা হইতে বলিয়াও যখন দেখিলেন কথামত কাজ করিতে পারিলাম না, সঙ্কোচ করিতেছি, তখন বলিলেন—'এবার আর হ'লো না। তিন দিন পরে আমি আবার আস্‌ব।' এই বলিয়াই অমনি অদৃশ্য হইলেন।

আমিও জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্নটি দেখিয়া মন অত্যন্ত অস্থির হইল।

মুঙ্গেরের বিশেষত্ব।

প্রায় দুইমাস কাল মুঙ্গেরে বাস করিলাম, অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায় গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহের কন্যা সন্তোষিণীর মৃত্যু এই মুঙ্গেরে হয়। শুনিয়াছিলাম তখন তিনি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। "শোকোপহার" নামক একখানি পুস্তকে তিনি সেই সময়ের সমস্ত মানসিক অবস্থা বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছিলেন।

এই মুঙ্গেরেই একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। 'আশাবতীর উপাখ্যানে'-ও গোস্বামী মহাশয় তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এই স্থানের মহাতীর্থ কষ্টহারিণী যথার্থই যেন মানসিক সকল কষ্ট গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত করিয়া শান্তি প্রদান করেন। ঘাটের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। পশ্চাদ্দিকে কেল্লাটিও যেন একখানা সুন্দর ছবি মনে হয়।

দু'মাস কাল এখানে থাকিয়া সাধন ভজনে বিশেষ উপকার অনুভব করিলাম।

ভাগলপুরে অবস্থান।

ফাল্গুন ও চৈত্র, ১২৯৫।

বি, এল পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধার জন্য মেজ দাদা মুঙ্গেরহইতে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হইলেন। আমি ভাগলপুরে আসিলাম, ভাগলপুরে এ অঞ্চলের স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার মদীয় ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় রহিলাম। ভাগলপুরও বড় ভাল লাগিল। মথুর বাবুর থাকিবার বাটীটি আরও মনোরম। এই বাড়ী বর্দ্ধমানের মহারাজার, সুবিস্তৃত-স্থানব্যাপী। খঞ্জরপুরে ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত। এইজন্য বাড়ীটির নাম 'পুলিনপুরী' হইয়াছে। 'পুলিন-পুরীর' সম্মুখস্থ রোয়াক্ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনই আনন্দদায়ক। গঙ্গার উপরেই আমাদের থাকিবার ঘর হইল। কিছুদিন এখানে থাকিয়া খুব সাধন ভজন ও সময়ে সময়ে সৎসঙ্গ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে এখানেও আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল; বেদনাও অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।

অযোধ্যায় গমন। সাধুসঙ্গ।

বৈশাখ হইতে এক মাস, ১২৯৬।

সকলের পরামর্শ মতে আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া বৈশাখের প্রারম্ভে ফয়জাবাদে বড় দাদার নিকটে চলিয়া আসিলাম। অযোধ্যার ৫।৬ মাইল অন্তরে ফয়জাবাদে বড় দাদা শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী হাসপাতালে আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন। প্রকাণ্ড হাসপাতাল ভূমির অন্তর্গত কম্পাউণ্ডের এক পাশে সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ীতে দাদার বাসভবন। দাদার সঙ্গে আমি পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। হাসপাতালের কাজ বাদে অবশিষ্ট সময় দাদা ধর্ম্মালোচনা লইয়াই থাকেন। দাদার সঙ্গীরা সকলেই উচ্চপদস্থ ও ইংরাজী ধরণে সুশিক্ষিত হইলেও,

সজ্জনাশ্রিত বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মগতপ্রাণ। ইঁহারা ধর্ম্মপ্রবন্ধে বড়ই আনন্দ ও প্রাণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বড় দাদা কয়েকদিন ধরিয়া আমার রোগের অবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ঔষধাদিতে এ ব্যাধির উপশম অসম্ভব বুঝিয়া, সদাচারে স্বভাবের উপরেই থাকিতে পরামর্শ দিলেন। বেদনা একটু কম থাকিলে, সকালে বিকালে আমি রাস্তায় একটু বেড়াইয়া থাকি। অযোধ্যা ফয়জাবাদে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্ত নাই। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—মহাপুরুষেরা ছদ্মবেশে সর্ব্বত্রই বিচরণ করেন। কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি তীর্থে অনেক সময়েই তাঁরা থাকেন। তাঁদের চেনা শক্ত। মুটে মজুরের বেশেও তাঁরা ঘুরে বেড়ান। গুরুদেবের একথা স্মরণ করিয়া, প্রত্যহ দু'বেলা আমি পথে পথে ঘুরি; এবং দু'পাশে ও সম্মুখে যাহাদের দেখিতে পাই, মনে মনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের কৃপায় ক্রমে এ সময়ে কয়েকটি মহাত্মার দর্শন পাইলাম। অযাচিতভাবে তাঁহাদের অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়া, অযোধ্যায় আগমন আমার সার্থক মনে হইতেছে। এখানে সাধন ভজন করিতে খুব একটা ইচ্ছা হয়—মনটি যেন সর্ব্বদাই উদাস উদাস থাকে। এস্থানের সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে, গুরুর প্রতিই চিত্তের আকর্ষণ ও নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়, দেখিতেছি।

কলিকাতায় গোঁসাইদর্শন। সাধুমহাত্মাদের সঙ্গবিবরণ।

কয়েক মাস এখানে থাকার পর গুরুদেবকে দেখিতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। এ সময়ে ভগবৎকৃপায়, পারিবারিক কোনও বিশেষ প্রয়োজনে দাদাও আমাকে বাড়ী পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। আমি বাড়ী রওনা হইলাম। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায়ই আছেন। গুরুদেবের সঙ্গলাভের লোভে কয়েকদিন কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ঝামাপুকুরে মেজ দাদার বাসায় রহিলাম।

শ্রাবণ মাস, ১২৯৬।

অদ্য অপরাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন-মানসে বাহির হইলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটের উপরে ছোট একখানি দোতালা বাড়ীতে তিনি রহিয়াছেন। শ্রীধর, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়-প্রভৃতি শিষ্যগণ এবং গোস্বামী পরিবার সঙ্গে আছেন।

গোঁসাইয়ের কাছে পৌঁছিয়া দেখি, লোকে ঘর পরিপূর্ণ; ভক্তিভাজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ গোঁসাইয়ের

সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। শিবনাথ বাবু তাঁর একটি অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,—ষট্‌চক্রভেদী মহাত্মারা যে অবস্থায় থাকেন, শিবনাথ বাবু উপাসনাকালে কখনও কখনও সহস্রারে অবস্থান ক'রে তাহা ভোগ করেন। এটি বড় সহজ নয়।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া, ডাকিয়া সম্মুখে নিয়া বসাইলেন; এবং বলিলেন—কি ? তুমি অযোধ্যা থেকে এলে ? ওখানে সময়ে সময়ে ভাল ভাল সাধু মহাত্মার দর্শন পেয়েছ ত ?

আমি।—হাঁ, কয়েকজন মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম।

গোঁসাই।—তাঁদের সম্বন্ধে যা যা তোমার জানা শোনা আছে বল।

আমি সকলের সাক্ষাতে বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলাম।

ল্যাঙ্গা বাবা।

ফয়জাবাদে আমি কয়েক মাস ছিলাম। এইসময়মধ্যে ৩৪ টি মহাত্মার দর্শন পাইয়াছি। আমার অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে দাদার পত্রে ল্যাঙ্গা বাবার কথা শুনিয়া আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনি তখন বলিয়াছিলেন—"ইনি একজন খুব শক্তিশালী সিদ্ধ পুরুষ।" ফয়জাবাদে যাইয়া আমি প্রথমেই এই মহাত্মাকে দর্শন করি। 'গুপ্তার ঘাট' হইতে ১॥ কি ২ মাইল অন্তরে, সরযূর পারে, জনমানব শূন্য সুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে ইনি থাকেন। রাশীকৃত মাটী পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত করিয়া দোলমঞ্চের ন্যায় ৩ টি থাক্ করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ থাক্ সমতলভূমিহইতে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ হইবে। তাহারই উপরে মুক্ত আকাশের নীচে ল্যাঙ্গা বাবার আসন। এইস্থানহইতে বহুদূর পর্য্যন্ত গাছ পালার কোনও সম্পর্ক নাই। চতুর্দ্দিকে ঘাসের ময়দান মাত্র দেখা যায়। গুপ্তার ঘাট বা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের নিকটহইতে ঐ দিকে তাকাইলে মোটা থামের উপরে বাবাজীকে একটি পক্ষীর ন্যায় দেখা যায়। উহার প্রায় দুই দিকেই সরযূ নদী; অপর দু'দিকে 'ধূ ধূ' প্রকাণ্ড মাঠ। এই মাঠ সরযূর চড়াও হইতে পারে। একটি সরু খাল সরযূর একদিক্‌হইতে আসিয়া, ল্যাঙ্গা বাবার আসনস্থান বেষ্টনপূর্ব্বক অপর দিকে গিয়া আবার সরযূতেই মিশিয়াছে। উহাতে জল খুব অল্প থাকে। শুনিলাম—একবার এই খালের স্রোত বৃদ্ধি হওয়ায়, উহা প্রশস্ত হইয়া ক্রমে ল্যাঙ্গা বাবার আসনস্থানের নিকটবর্ত্তী হয়। তখন বাবাজী বারংবার খালটিকে বলিলেন—

"মায়ি, ইধার মৎ আও।" কিন্তু খালটি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'হাঁ! য়্যাসা? আচ্ছা, বন্ধ হো যাও।' সেইহইতেই নাকি খালটি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহরের লোকে সকলেই বলে, 'বাবাজী সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার বাক্যেই খালের ঐ দশা ঘটিয়াছে।'

শীত ও গ্রীষ্ম ফয়জাবাদে অত্যন্ত বেশী। পৌষ মাঘ মাসে কোঠাঘরের ভিতরেও শীতের সময়ে আগুন তাপিতে হয়; আবার গ্রীষ্মের সময়ে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা ৯ টার পরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না; ৫ মিনিট রৌদ্রে থাকিলেই মনে হয় যেন শরীর পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া গেল। ল্যাঙ্গা বাবা 'ধূ ধূ' ময়দানের মধ্যে অনাবৃত স্থলে দারুণ শীত গ্রীষ্মে কিছুমাত্র অবলম্বন না করিয়া কি প্রকারে উলঙ্গাবস্থায় অহর্নিশ থাকেন, ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। লোকালয়হইতে এত তফাতেই বা কেন আসন করিলেন, জানিতে কৌতুহল জন্মিল। এক দিন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার জীবনের অনেক কথা বলিলেন। শুনিলাম, তিনি বহুকাল তীর্থপর্য্যটন করিয়া, অবশেষে ফয়জাবাদে গুপ্তার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। লোকালয়হইতে দূরে থাকা তাঁহার নিয়ম বলিয়া এ ময়দানেই গিয়া তিনি আসন করিয়া বসেন। একদিন গভীর রাত্রে সম্মুখে ধুনি রাখিয়া নাম করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে জ্বলন্ত আগুনের উপরে পড়িয়া যান, তাহাতে শরীরের কয়েকটি স্থান সাংঘাতিকরূপে দগ্ধ হইয়া যায়। বাবাজী পোড়া ঘায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাতর-ভাবে রামজীকে ডাকিয়া বলেন—'হা রে রামজি, তোহার লিয়ে মে এৎনা কিয়া, আওর তু মেরা এহি হাল কিয়া!' বাবাজী এইকথা বলামাত্র দেখিতে পাইলেন আকাশপথে ভীষণাকার একটা কি যেন শোঁ শোঁ শব্দে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি বাবাজীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং বাবাজীকে সবলে ধরিয়া জ্বলন্ত আগুনের উপরে ফেলিয়া ঘষিতে লাগিল; অগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইলে পর, ধুনির বিভূতি তুলিয়া বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিল। অতঃপর সেই শক্তিশালী নভশ্চর বলিল—'ইহাই রহ; আসন কভি মৎ ছোড়্‌না। কোহি উপাধি পরশ নেহি করেগা। সিদ্ধ বন্ যাও।' বাবাজী সেইহইতে আসন ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। এজন্য বাবাজীর উপর ভয়ঙ্কর পরীক্ষাও গিয়াছে।

গোঁসাই বলিলেন—সে কিরকম?

আমি। বাবাজী যে ময়দানে থাকেন, ফয়জাবাদের ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ তাহারই এক পাশে। বিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গোলন্দাজ সেনাদের গোলা-

বাজী সেই মাঠেই হইয়া থাকে। গোলাগুলি ছুঁড়িবার পূর্ব্বে ময়দানের সমীপবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে নোটিশ দেওয়া হয়। দু'চার দিনের জন্য তখন সকলকেই অন্যত্র সরিয়া যাইতে হয়। একবার এইরূপ গোলাবাজীর পূর্ব্বে নোটিশ পড়িল। সকলে বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গেল; কিন্তু ল্যাঙ্গা বাবা আসন ছাড়িলেন না। সরকারী তরফ হইতে তাঁহাকে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পুনঃপুনঃ বলা হইল। বাবাজী বলিলেন—'বাচ্চা লোক, খেলা কর্। আসন হামারা সিদ্ধ্ হ্যায়্, ছোড়্নে নেহি সেক্‌তে। কুছ্ হোগা নেহি; তুম-সব খেলা কর্।" শুনিলাম অতঃপর সরকারহইতে অনেক ভয়ও প্রদর্শন করা হইল; কিন্তু বাবাজী, আসন ছাড়িলেন না। পরে হুকুম হইল—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবাজী না সরিলে তাঁহার মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী হইবেন না। যথাকালে গোলাগুলি ছোঁড়া আরম্ভ হইল—সমগ্র ময়দানটা অগ্নিময় হইয়া গেল, বাবাজী আপন আসনে স্থিরভাবে ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া রহিলেন। কর্‌নেল্ ক্রলী কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দুরবীক্ষণদ্বারা এক একবার দেখিতে লাগিলেন বাবাজী জীবিত আছেন কি না। অসংখ্য গোলাগুলি ছোঁড়া হইতে লাগিল, এদিকে বাবাজী শুধু নিজের বামহস্তখানা ঢালেরমত সম্মুখে ধরিয়া রহিলেন! গোলাগুলি সমস্ত বাবাজীর দক্ষিণে বামে ও মস্তকের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বাবাজীর কিছুতেই কিছু হইল না। ইহা দেখিয়া কর্‌নেল্ ক্রলী স্তম্ভিত হইলেন। পরে সব শেষ হইয়া গেলে, তিনি বাবাজীর নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া বলিলেন—'বাবা, অলৌকিক শক্তির পরিচয় আজ তুমি যাহা দেখাইলে, এজীবনে তাহা ভুলিব না। আমি যত বার লক্ষ্য করিয়াছি তত বারই তোমাকে একই অবস্থায় স্থির থাকিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।' শুনিলাম, অলৌকিক ঘটনা সরকারের যে পুস্তকে লেখা থাকে তন্মধ্যে এই ঘটনাগুলি সাহেব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গোঁসাই।—ল্যাঙ্গা বাবা মহাশক্তিশালী পুরুষ; কামানের গোলায় তাঁর কি কর্‌বে? আজকাল ওরকম শক্তিশালী লোক বড় দেখা যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ওভাবে ল্যাঙ্গা বাবার নিকটে কে এসেছিলেন? কে এসে তাঁহাকে সিদ্ধ করে গেলেন?

গোঁসাই। ভক্তরাজ মহাবীর এসেছিলেন। তাঁরই 'বরে' ল্যাঙ্গাবাবা সিদ্ধ হন।

প্রশ্ন। মহাবীর এলেন কেন?

গোঁসাই। রামের নামে দীর্ঘনিশ্বাস! রামভক্ত মহাবীর কি স্থির থাক্‌তে পারেন? বাবাজী তোমাকে কিছু বল্‌লেন?

আমি। বাবাজীকে দর্শন করিতে আমি প্রায়ই যাইতাম; সাধারণতঃ বিশ্বাস ভক্তি লাভ হউক এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতাম। আশীর্ব্বাদ চাহিলে বাবাজী চমকিয়া উঠিতেন; মাথায় হাত বুলা'য়ে খুব স্নেহের সহিত বল্‌তেন—"আরে তোম্ তো ভগবান্‌কা আশ্রয় লিয়া হ্যায়্। গুরুজী তোম্‌রা বড়া দয়াল, বড়া দয়াল! মালিক তো ওহি হ্যায়্। বিশ্বাস ভক্তি দেনেওয়ালা ওহি হ্যায়্। পূরা বন্ যায়েগা। আনন্দ্ কর্, আনন্দ্ কর্।"

বাবাজীর শরীরের চর্ম্ম হাতীর চামড়ার মত দৃঢ় ও খস্‌খসে। দেখিতে কুস্তিগীর পালোয়ানের মত বীরপুরুষ।

পতিতদাস বাবাজী।

ফয়জাবাদে যাইয়াই দাদার মুখে শুনিলাম—বহুকালের একটি প্রাচীন মহাপুরুষ অযোধ্যার পথে কোনও একটি নির্জ্জন কুটীরে আছেন; কিন্তু তাঁহার দেখা পাওয়া বড় কঠিন। পূর্ব্বে কখনও কখনও একক্রমে ছয় মাস কাল তিনি একাসনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ থাকিতেন; অপর ছয় মাসের মধ্যে কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাধারণে তাঁহার দর্শন পাইত। আজ কাল তিনি তিন মাস অন্তর তিন মাস সমাধিতে থাকেন। আমি লোকপরম্পরায় জানিলাম বাবাজী এখন সমাধিতে নাই; সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে ব্যস্ত হইলাম। দাদা আমাকে বাবাজীর দর্শনে যাইতে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে লাগিলেন; কারণ বাবাজীর ভজনকুটীরের দ্বার প্রায়ই বন্ধ থাকে এবং নিজ হইতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক না হইলে সচরাচর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। যাহা হউক, অতঃপর আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া দাদা আমাকে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং আমি উৎসুকচিত্তে বাবাজীর দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলাম। ফয়জাবাদহইতে অযোধ্যা যাইতে প্রকাণ্ড ময়দানের সম্মুখে রাস্তাটি দুই দিকে গিয়াছে। একটি দক্ষিণে দেওকালীর দিকে, অপরটি বামে রাণুপালীর দিকে। এই রাণুপালীর রাস্তার বামপার্শ্বেই বাবাজীর আশ্রম।

আমি ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি বাবাজীর ভজনকুটীরের দ্বার বন্ধ। বাবাজীকে উদ্দেশ করিয়া বাহিরহইতে আমি একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মাথা তুলিতেই দেখি বাবাজী দরজা খুলিয়াছেন। আমাকে খুব সস্নেহে ডাকিয়া বলিলেন—'আও বাচ্চা, আও, ইহাঁ বৈঠো। থোড়া আগাড়ী হামারা মালুম পড়া, তোম্ ইহাঁ আওগে, তব্‌সে হাম্‌ভি তোমারা ওয়াস্তে বৈঠা রহা।' বাবাজী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া

রহিলেন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এক একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ! ধন্ত হো গিয়া! ধন্ত হো গিয়া! দুর্লভ সদ্‌গুরুকা আশ্রয় পায়া! ধন্ত হো গিয়া!" বাবাজীর উচ্ছ্বাস একটু কমিলে আমি বলিলাম—'বাবা, আমার কল্যাণ কিসে হইবে?' বাবাজী খুব উল্লাসের সহিত আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—'আউর্ ক্যা বাচ্চা? সব্ তো পূরণ হো গিয়া। ওহি কালাকো ধ্যান কর্। খুব আনন্দ্ কর্।' অনেকক্ষণ বাবাজীর নিকটে বসিয়া ছিলাম। তিনি অবিশ্রান্ত কেবল কাঁদিলেন, আর থামিয়া থামিয়া ঐ একই কথা বলিতে লাগিলেন। বাবাজীর শরীরটি খুব প্রাচীন, বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর; আকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ; বর্ণ গৌর, মুখটি গোলাপের মত লাল; দাড়ি গোঁফ্ চুল সমস্ত সাদা; হাতপায়ের নখগুলি লম্বা হইয়া বঁড়শীর মত বাঁকিয়া গিয়াছে। কথায় কথায় টস্ টস্ করিয়া চক্ষের জল পড়ে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

গোঁসাই বলিলেন,—"পতিতদাস বাবাজী তান্ত্রিক সাধন ক'রে সিদ্ধ। ইনি মহাপ্রেমিক। তান্ত্রিক সাধন ক'রেও, দেখ, লোক কেমন প্রেমিক হয়! এ সব লোকের দর্শন সহজ নয়। রঙ্গমহলে হনুমান্ গৌরীতে কোন সাধুর দর্শন পেয়েছ?"

গোপালদাস বাবা।

একদিন অকস্মাৎ একটি সাধু আসিয়া দাদাকে বলিলেন, "বাবু সাহেব, রঙ্গমহলে একটি সাধু কাণের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন। আপনাকে জানাইলাম; এখন তাঁহাকে দেখা না দেখা আপনার ইচ্ছা। সাধুর টাকা পয়সা নাই। আপনার 'ভিজিট্' বা অযোধ্যা যাওয়া আসার গাড়ীভাড়া তিনি দিতে পারিবেন না।" দাদা এ কথা শুনামাত্র সাধুর নিকট যাইতে অস্থির হইলেন; অমনি একখানা গাড়ী আনাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা রওনা হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌঁছিলাম, এবং রঙ্গমহলে অনেকগুলি কামরা ঘুরিয়া আমরা একটা অন্ধকার কুঠুরীতে প্রবেশ করিলাম। ঐ ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী মাটীর নীচে একটি গোফা হইতে একজন বৃদ্ধ সাধু বাহির হইয়া আসিলেন। কাণের ভিতরে তাঁহার অনেক ময়লা জমিয়াছিল; দাদা তাহা সাফ্ করিয়া দিতে যন্ত্রণার উপশম হইল।

বাবাজীকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। শরীর অতিশয় কৃশ, মনে হয় যেন অস্থির উপর চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে। চর্ম্মের রং অস্বাভাবিক সাদা—ঠিক দুধের মত। মুখশ্রী

কিন্তু বেশ পুষ্ট, খুব উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ। সর্ব্বদা ঈষৎ হাসি মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম বাবাজীর বয়ঃক্রম দেড়শতেরও অধিক। কত কাল যাবৎ যে তিনি, ঐ অন্ধকার গোফাতে আছেন, রঙ্গমহলের বৃদ্ধ সাধুরাও তাহা জানেন না। তিনি সমস্ত দিবসে একবার মাত্র, শেষ রাত্রিতে, শৌচার্থ বাহির হন। রঙ্গমহলের সাধুদের বৎসরে একবার দর্শন ঘটিয়া উঠে না। সর্ব্বদাই তিনি এ গোফার মধ্যে অবস্থান করেন।

আসিবার সময়ে বাবাজীকে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিলাম। বাবাজী করজোড়ে গদগদ ভাবে কহিলেন, "রামজী বড়া দয়াল, বড়া দয়াল! উন্‌হিকা নাম লেকে উন্‌হিকা স্থানমে পড়া রহা হ্যায়। আব্ যো করে রামজী। বাচ্চা, বহুৎ ভাগ্‌মে রামজীকা আশ্রয় পায়া। আব্ নাম করো, আওর্ আনন্দ্ করো।"

তুলসীদাস বাবা।

আমি আবার বলিতে লাগিলাম—অযোধ্যাতে সরযূর তীরে একটি মন্দিরে বাবা তুলসীদাস থাকেন। অযোধ্যার বর্ত্তমান সাধুদের মধ্যে ইনি খুব প্রসিদ্ধ। দর্শন করিতে যাইয়া দেখি, বাবাজী নামজপে মগ্ন হইয়া আছেন। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে বহু লোক স্থিরভাবে বসিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু বাবাজীর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এক একবার যেন তন্দ্রাহইতে চমকিয়া উঠিয়া সকলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিতেছেন, আবার ঢলিয়া পড়িতেছেন। বাবাজী দাদাকে দেখিয়া খুব আদর করিয়া সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং খুব প্রসন্ন মুখে 'আনন্দ্ হ্যায়?' জিজ্ঞাসা করিয়া আবার জপে মগ্ন হইলেন। বাবাজী মালা জপ করেন; কিন্তু মালার সঙ্গে মাত্র করেরই সম্বন্ধ, মনে হইল; মনটি যেন কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। বাবাজী কাহাকেও নাকি কোনও উপদেশ দেন না। শুধু 'নাম কর, নাম কর' এইমাত্র বলেন।

অন্ধ বাবাজী।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কোথাও কাহাকে দেখ্‌লে?

আমি। ফয়জাবাদে বেগমগঞ্জে গোপনে একটি মহাত্মা আছেন—জেল-দারোগা নন্দ বাবু আমাকে জানাইলেন। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাধু বাবার নিকটে লইয়া গেলেন। এই সাধুটিও খুব বৃদ্ধ; পূর্ব্বে তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য-সংক্রান্ত কোন বিষম অনর্থের সূচনা দেখিয়া ইনি পলায়ন করেন। পথে কোনও আকস্মিক বিপদে ইহার দুইটি চক্ষুই নষ্ট হয়। একটি ভদ্রলোকের কৃপায় পরে ইনি অযোধ্যাতে আসেন, তাঁহারই আশ্রয়ে

থাকিয়া বহু কাল সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম ইনি অগাধ পণ্ডিত। বহু শাস্ত্র পুরাণ-দর্শনাদি ইঁহার কণ্ঠস্থ। বাবাজী আমাকে বলিলেন—'কঠোর সাধন ও তীব্র বৈরাগ্য না হ'লে কিছুই হয় না। চর্ম্মচক্ষু না থাকিলে কোনও ক্ষতি নাই। সাধন প্রভাবে দেবদেবীদর্শন, চিত্রদর্শন, জ্যোতির্দর্শনাদি সমস্তই হয়। সদাচারে থাকিয়া গুরুর আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রণালী অনুসারে কেহ সাধন ভজন করিলে, গুরুর কৃপায় ইহলোক পরলোক তাহার এক হইয়া যায়।' দর্শনবিজ্ঞানদ্বারা বাবাজী এসকল কথার প্রমাণ দিতে লাগিলেন।

গোঁসাই বলিলেন—অযোধ্যাতে হনুমান্ গৌরী বড়ই জাগ্রত স্থান। ওখানে প্রায়ই মহাপুরুষেরা আসেন। কিন্তু তাঁরা আপনাহ'তে পরিচয় না দিলে কেউ তাঁদের ধরতে ছুঁতে পারে না। গুপ্তার ঘাট আর হনুমান্ গৌরী এই দুটি স্থানই এখন পর্য্যন্ত ঠিক আছে। প্রাচীন অযোধ্যার আর সবই সরযূ গ্রাস করেছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরে আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া, এইরূপে তাঁহার সঙ্গলাভ প্রত্যহ করিতে লাগিলাম।

যোগজীবন ও শান্তিসুধার পরিণয়োৎসব।

গত কয়েক মাস আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে ছিলাম না। সুতরাং তৎকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপের বিবরণ আমার এ ডায়েরীতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও গেণ্ডারিয়ায় কিছুকাল থাকিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে যাহা যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এস্থানে লিখিয়া রাখিতেছি। যদি কখনও গোস্বামী মহাশয়ের নিজমুখে ঐ সকল বিষয় শুনিতে পাই, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া যাইব।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পুত্র ও কন্যা শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর পরিণয় কার্য্য শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্রের সহিত ১২৯৫ সনের ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার সম্পন্ন করিয়াছেন। আধুনিক ভাবের সুশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন কোন বর্দ্ধিষ্ট পরিবারে উঁহাদের বিবাহ দেওয়া গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না কিন্তু স্বীয় গুরু পরমহংসজীর আদেশে তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বহু আত্মীয় স্বজন ও নিজ পরিবারবর্গের ঘোর প্রতিবাদ এবং আপত্তি সত্ত্বেও এ কার্য্য আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। জামাতা পূর্ব্বেই

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারেই এই বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোঁসাইজীর ভক্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন, 'এখন আর অন্যমতে বিবাহ দেওয়া কেন? হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানে ঋষিদের গন্ধ আছে, অতএব হিন্দুমতে বিবাহ দিলে হয় না?' গোস্বামী মহাশয় তাহাতে বলিলেন, "ভাল কথা," কিন্তু দুই দিন পরেই তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি বুঝে দেখ্‌লাম যে হিন্দুমতে ইহাদের বিবাহ হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণের একটি সংস্কারও যোগজীবনের হয় নাই; জগদ্বন্ধুও নানারূপ অনাচার ক'রেছে। ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া কঠিন, আর তাহার সময়ই বা কোথায়? তোমরা কিছু মনে ক'র না। ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে, রেজেষ্ট্রী ক'রে ইহাদের বিবাহ দিতে হবে।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় যথাক্রমে গোঁসাইজীর পুত্র ও কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন; বিবাহস্থলে গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; গার্হস্থ্য ধর্ম্মসম্পর্কে তিনি যেসকল অপূর্ব্ব সারগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি একবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালনের আদেশ করিলেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে এতদুপলক্ষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবর বাবার এবং অপর কয়েকজন সিদ্ধপুরুষের আগমন হইয়াছিল। বিবাহের পরদিন বিবাহ রেজেষ্ট্রী হয়। এই বিবাহে সাধু সজ্জনের সমাগমে কয়েক দিন আনন্দোৎসব চলিয়াছিল, এবং তাহাতে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের কয়েকটি লোকবিস্ময়কর যোগৈশ্বর্য্য অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা প্রমাণ সহিত ভবিষ্যতে লিখিতে আমার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীধরের পাগলামী ও ঠাকুরের শাসন।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অবস্থানকালে কিছুদিন শ্রীধরের পাগলামী অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে সময়ে গেণ্ডারিয়াবাসী সকলেই তাঁহার লোকাচারবিরুদ্ধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, গর্হিত অনুষ্ঠানে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছিলেন। অহর্নিশি উদ্বেগগ্রস্ত কতিপয় অসহিষ্ণু লোক শ্রীধরের উৎপাত একেবারে শান্ত করিতে বিষম ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। গোস্বামী মহাশয় সেসকল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিদারুণ চক্রান্ত স্বতঃই জানিতে

পারিয়া, উহাহইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিতে ভক্ত শ্রীধরের উপরে ভয়ঙ্কর কঠোর শাসন করিয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীধরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য, গেণ্ডারিয়ার সকলকে উঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে এবং আহার না দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীধর, কখনও বা অনাহারে, কখনও বা স্নেহময়ী শ্রীযুক্তা যোগমায়া ঠাকুরাণীর গোপনে প্রদত্ত দুই এক মুষ্টি অন্ন আহারে, গাছতলায় পড়িয়া থাকিয়া, কোন প্রকারে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। দণ্ড অতিশয় তীব্র হওয়াতে শ্রীধর বাঁচিয়া গেলেন। শ্রীধরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণের দয়া হইল। তাঁহারাই শেষে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া এ যাত্রা শ্রীধরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ধূলটোৎসব।

(আমার অনবধানতা প্রযুক্ত নিম্নলিখিত ঘটনাটি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারি নাই।)

একরামপুরের বাসায় একদিন গোস্বামী মহাশয় কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'এবার ধূলট উৎসব করিলে হয়।' গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেই ধূলট উৎসবের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি মাঘী-সপ্তমীতে শান্তিপুরে প্রতি বৎসর প্রায় একমাস কাল এই উৎসব হইয়া থাকে। দোলের সময়ে ফাগ যে ভাবে ব্যবহার হয় এই উৎসবে সংকীর্ত্তনকালে রাস্তার ধূলিরাশি সেইরূপে উড়ান হয় বলিয়া ইহার নাম 'ধূলট' হইয়াছে।

কয়েকদিন পরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের একদিন নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ভোজনান্তে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় মহাশয় বলিলেন 'ঠাকুর যখন ধূলটের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এই উৎসব করাই চাই। ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সকলে কিছু কিছু করিয়া দিন।' তখনই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল এবং গোস্বামী মহাশয়কে জানান হইল যে এবার ধূলট করা হইবে। এই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে অন্ধ বাবাজী আসিয়া ঢাকাতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের আবাসেই অবস্থান পূর্ব্বক সুমধুর গান-বাজনার মাধুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী পদাবলী গান করিতে করিতে আশ্চর্য্য প্রকারে নিজেই খোল ও করতাল একসঙ্গে বাজাইয়া থাকেন। মাটীতে একখানা করতাল চিৎ করিয়া রাখিয়া অপর খানা বাহুতে ঝুলাইয়া দেন, পরে খোলের তালের সঙ্গে সঙ্গে বাহু নাড়ার কৌশলে করতালও তালে তালে বাজিতে থাকে। ধূলট উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বহইতেই অন্ধ বাবাজীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তন গানে আশ্রমে সর্ব্বদাই আনন্দোচ্ছ্বাস চলিতে লাগিল।

. এদিকে মাঘী-সপ্তমী তিথি আসিয়া পড়িল। বেলা প্রায় আটটার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু বিধু বাবু এবং প্রসন্ন মজুমদার-প্রভৃতি বাসার অপর পার্শ্বের কদমতলায় * গোঁসাইকে সম্মুখে রাখিয়া গান আরম্ভ করিলেন—

হরি বল্‌ব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম
কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম।—ইত্যাদি

গোস্বামী মহাশয় রাস্তায় পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়াই দুই হস্তে ধূলি লইয়া 'জয় সীতানাথ' 'জয় সীতানাথ' বলিতে বলিতে উহা চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শক্তি সংযুক্ত ধূলির সংস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেরই ভিতরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ভাবোন্মত্ত অবস্থায় হুঙ্কার, গর্জ্জন ও ধূলি উৎক্ষেপন পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গোঁসাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে কয়েকদল কীর্ত্তন অকস্মাৎ আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিল। তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি সংকীর্ত্তন-কোলাহলে মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয় উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া চলিলেন কিন্তু ভাবাধিক্য হেতু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে উচ্ছ্বাস আনন্দের এক হুলস্থূল কাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রবল ভাবের প্রঘূর্ণ তুফান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অপূর্ব্ব ধূলিরাশির সংস্পর্শে দর্শক মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোক পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, মুটে মজুর, ব্যবসাদার প্রভৃতি যিনি যে অবস্থায় ছিলেন রাস্তার উভয় পার্শ্বে ভাবাবেশে তিনি সেই অবস্থায়ই মন্ত্র-মুগ্ধবৎ রহিয়া গেলেন। কোন কোন অট্টালিকার উপরে মহিলারা দিশাহারা হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, শিশুগুলিও স্থানে স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই মহাসংকীর্ত্তন এতই ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল যে পাঁচ সাত মিনিটের পথ শ্রীবিহারীলালজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইতে তিন ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। এই প্রকারে সংকীর্ত্তন সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙ্গলাবাজার, পাটুয়াটুলি, শাঁখারিবাজার এবং লক্ষ্মীবাজার ঘুরিয়া অপরাহ্ন তিনটার সময়ে একরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বাটীর দ্বারে অন্ধ বাবাজী আসিয়া গান ধরিলেন—'নগর ভ্রমণ ক'রে আমার গৌর এলো ঘরে, আমার

* কথিত আছে যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীযুক্ত বলভদ্র ঠাকুর ঐ স্থানে একটি কদম গাছের তলায় তাঁহার আসন স্থাপন করিয়া কিছুকাল সাধন ভজন করেন। সময়ে ঐ পুরাতন কদম্ব বৃক্ষ নষ্ট হইলে সেই স্থানেই অন্য একটি কদম্ব বৃক্ষ জন্মিল। এই ভাবে অদ্যাপি বলভদ্রের আসন-স্থান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

নিতাই এলো ঘরে—' এই সময়ে উদ্দীপিত ভাবের অভিনব উচ্ছ্বাসে সকলেই পুনরায় উন্মত্তবৎ হইলেন এই ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া গেল। ক্রমে সংকীর্ত্তন থামিলে জনসমূহ ঢুলু ঢুলু অবস্থায় শান্ত ভাব ধারণ করিল।

এই বিচিত্র ভাবোন্মাদকারী ধূলটোৎসবের নগর-সংকীর্ত্তনে ঢাকাবাসীরা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিল। একটি অল্পবয়স্ক বালক ১০।১২ ঘণ্টাকাল সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় থাকায় তাহার পিতামাতা উহার জীবনাশায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা গোঁসাইয়ের নিকটে আসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় তখন তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া স্পর্শ মাত্রে ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া চলিয়া আসিলেন। আর একটি জগন্নাথ স্কুলের ১৪।১৫ বৎসরের ছাত্র ধূলটোৎসবের সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশে এতই মাতিয়া গেল যে ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত সে থাকিয়া থাকিয়া রাস্তায় রাস্তায় 'আমার কৃষ্ণ কই' 'আমার কৃষ্ণ কই' বলিয়া কাঁদিয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত থাকিত। ছেলেটির নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার মিত্র। বাড়ী বিক্রমপুর। উহার আত্মীয় স্বজনগণ, দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া কাতর ভাবে উহার প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোঁসাই বলিলেন—"ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকটে থাকিলে এই ছেলেটির ভাবের আদর হইত। সে যাক্; হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে একটি ভদ্রলোকের কুলবধূর হরিসংকীর্ত্তনে এই প্রকার ভাব হ'য়েছিল। বাড়ীর সকলেই তাতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন কোন যাজনিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট বউটিকে খাওয়াইয়া দিন ভাব ছুটিয়া যাইবে। গৃহস্বামী ঐ প্রকার করাতে বউটির ভাবাবেশ ছুটিয়া গেল।"

শুনিলাম অশ্বিনী সম্বন্ধেও নাকি ঐ প্রকার করায় তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এই মহাসংকীর্ত্তনে প্রধান গায়ক ও বাদক ছিলেন। কি শক্তি প্রভাবে তিনি অবিশ্রামে উৎসাহের সহিত ছয় ঘণ্টাকাল গান বাজনা করিয়াছিলেন জানিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই কুঞ্জ বাবুকে একদিবস গোস্বামী মহাশয় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—'সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন ক'রে মহাপ্রভু যে সুখ অনুভব ক'রেছিলেন আজ ইহার স্পর্শে আমি সেই সুখ লাভ করিলাম।'

লালের যোগৈশ্বর্য্যে গুরুভ্রাতৃগণের মুগ্ধতা।

শান্তিপুরনিবাসী বালক সাধক লালবিহারী বসুর জাতিস্মরত্ব ও ধর্ম্মজীবনের আশ্চর্য্য উৎকর্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গে উঁহার প্রবীণতা ও যোগৈশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। গুরুভ্রাতারা অনেকে উঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিও যেন দৃষ্টি করিতে তেমন অবসর পাইতেছেন না। গোস্বামী মহাশয় সাধনসিদ্ধ, আর লাল নিত্য-সিদ্ধ—এইপ্রকার সংস্কারও কাহারও কাহারও মনে জন্মিয়াছে। লালের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিপত্তি গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় কাহারও কাহারও গুরুনিষ্ঠার খর্ব্বতা ও শোচনীয় পরিণামের সূত্রপাত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পুনরাগমন।

কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে আমার বেদনারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং সেখানে আর অধিককাল বিলম্ব না করিয়া আবার ভাগলপুরে চলিয়া আসিলাম।

অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ, ১২৯৬।

খঞ্জরপুর পুলিনপুরীতে ঠিক গঙ্গার উপরে আমার থাকার ঘর। যতকাল রোগ আরোগ্য না হইবে এই স্থানেই থাকিব, সঙ্কল্প করিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়া হওয়াতে এত কালের ডায়েরী লেখার উৎসাহ একেবারে নিবিয়া গেল। আমার কুৎসিত জীবনের চিত্র আঁকিয়া কোন লাভই নাই; বরং যিনি তাহা দেখিবেন তাঁহার অপকারের আশঙ্কা আছে। যদি গুরুদেবের দুর্লভ সঙ্গ কখনও আমার আবার লাভ হয়, তখন প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সেই তীর্থস্বরূপ পাবন-লীলা ডায়েরীতে লিখিয়া কৃতার্থ হইব। আজ হইতে আমার ডায়েরী লেখা বন্ধ করিলাম।

বহুদিন পরে ডায়েরী লেখার প্রবৃত্তি।

আজ বহুকাল হইল নিয়মিতরূপে ডায়েরী লেখা বন্ধ করিয়াছি। এই এক বৎসরে কত প্রকার অবস্থা আসিল গেল, ভাবিলে স্বপ্ন মনে হয়। গুরুদেব ও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় ডায়েরী লিখিতে আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

মাঘ মাসের প্রথম ভাগ, ১২৯৬।

এখন তাহা স্মরণ করিয়া কষ্ট হয়। আমার কলুষপূর্ণ জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা যে কি, তাহা আমি জানি না। তবে মনে হয় আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আলোচনায় আমারই হয় ত কোনকালে কল্যাণ হইবে। সময়ে সময়ে স্বভাবের বিশেষ বিকৃতি ও চরিত্রের চঞ্চলতা দেখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

চারিদিকেও দেখিতেছি যাঁহারা পরম পবিত্র নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া এক সময়ে দেশমান্য ছিলেন, অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারাও কালক্রমে অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গত জীবনের তুলনায় আমার এ জীবন কি ছার! অতি তুচ্ছ ভাবিয়া যে সকল সামান্য প্রলোভনকে সাধারণ লোকেও অগ্রাহ্য করে, দেখিতেছি মহাতেজস্বী পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরাও বিধির চক্রে পড়িয়া তাহাতে ঘুরপাক খাইতেছেন। সুতরাং আমার আর ভরসা কি? যতই ভাল হই না কেন, পতিত হওয়া খুবই সহজ; অথচ পতিত হইলে আবার স্বস্থানে আসা সহজ নয়। আমি নিশ্চয় জানি, যতদিন আমার গুরুদেবের মমতাপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তি আমার অন্তরে জাগরূক থাকিবে, তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আমার স্মৃতিতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন আমার পতন নাই; মহাত্মাদের বাক্যে অবিশ্বাস ও গুরুদেবের কৃপা-বিস্মৃতিই আমার অধঃপতনের হেতু হইবে। নিজেকে বড় মনে করিয়া যখন সকলকেই তুচ্ছ করিব, তখন আর আমার উন্নতি কি প্রকারে হইবে? কিছুকালযাবৎ এই সব চিন্তায় আমি বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। কিন্তু এইরূপ দুর্গতি ও অবনতি ঘটিলে, হয় ত এই ডায়েরীই আমার চেতনা সম্পাদন ও সদ্গতির হেতু হইবে। আমার নিজ জীবনের যথার্থ ঘটনা তো আর আমি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিব না। এই মলিন আবর্জ্জনাময় জীবন-পঙ্কে আমার দয়াল গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টিতে সময়ে সময়ে যে মনোহর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, এই ডায়েরীই তাহা এক সময়ে আমার চক্ষের সমক্ষে আনিয়া ধরিবে। দুর্দ্দিনে গুরুদেবের স্মৃতি এই ডায়েরীই আবার ফুটাইয়া তুলিবে, এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, আবার ডায়েরী লিখিতে সংকল্প করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া, বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, এবারে আবার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎসঙ্গলাভ। গঙ্গামাহাত্ম্য ও তর্পণে আস্থা।

ভাগলপুরে আসিয়াও আমার রোগের যন্ত্রণা কমিল না। মনে একটা ধারণা জন্মিল, আর অধিক দিন বাঁচিব না। সংসারে আসা আমার বৃথা হইল; আকাঙ্ক্ষামত ভগবানের নাম করিতে পারিলাম না। এইরূপ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় আমার বিষম অশান্তি হইতে লাগিল। আমি তখন নির্দ্দিষ্ট একটা নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া সারাদিন কাটাইতে লাগিলাম।

গুরুদেবের কৃপায় ভজনানন্দী সৎসঙ্গীও আমার সহজেই লাভ হইল। শুনিয়াছিলাম ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী মহাশয় গুরুদেবের নিকটে সন্ন্যাসের কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী

উদাসীর মত পদব্রজে বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, কিছুকাল হয় তিনি এই ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; পথে পথে তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া জনসাধারণের প্রাণে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। ভাগলপুরের হরিসভায় হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে স্বামীজীর অসাধারণ ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সকলেই তখন স্বামীজীকে ভাগলপুরে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল খুব আদর যত্ন করিয়া স্বামীজীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

ইংরাজীশিক্ষিত লোকের ভগবানের নামে মহাভাব হয়, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, ভাগলপুরের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহারা স্বামীজীকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া স্বামীজীর নাম সহরের সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এক দিবসের অধিককাল স্বামীজীর কোথাও থাকিবার নিয়ম নাই; তাঁহার উপরে গুরুদেবের এটি বিশেষ আদেশ। কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তনের লোভে মত্ত হইয়া স্বামীজী ঐ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিলেন; "আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার বিধিনিষেধ কি?" এইরূপ ধারণায় স্বামীজী গুরুবাক্য উড়াইয়া দিয়া উকিল বাবুর বাড়ীতে আসন করিলেন। এক দিকে প্রত্যহ হরিসঙ্কীর্ত্তনে ভাবাবেশের উচ্ছ্বাসে যেমনই তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনই কুসংসর্গে পড়িয়া, মাংস ও উচ্ছিষ্টাদির সংস্রবে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, ভিতরে ভিতরে দিন দিন মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন।

অতঃপর এক দিন স্বামীজী অৰ্দ্ধক্ষিপ্ত অবস্থায় হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন— "ভাই, আমাকে রক্ষা কর। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সন্ন্যাসভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আমাকে যে অবস্থা কৃপা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমার ছুটিয়া গিয়াছে। হায়, হায়! আমি একটি নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নিত্য আমার নিকটে নূতন নূতন দৃশ্য প্রকাশিত হইত। দর্শনের দিক্ আমার এতই পরিষ্কার হইয়াছিল যে, সারা দিনে আধ ঘণ্টা সময়ও দর্শনের একটা কিছু না পাইলে অস্থির হইতাম। সঙ্কীর্ত্তনে এই দর্শন আরও পরিস্ফুট হইত; সুতরাং কোথায় সঙ্কীর্ত্তন? কোথায় সংকীর্ত্তন? বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'নিয়ত নাম করিও, এই নামেই সব হবে।' কিন্তু ইষ্টনাম অপেক্ষাও আমার সংকীর্ত্তনের ঝোঁক বেশী হইল। এই সঙ্কীর্ত্তনের লোভেই গুরুবাক্য ও সন্ন্যাসের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া উকিল বাবুর বাড়ীতে আসন করিলাম। কীর্ত্তনে নিত্য নূতন দর্শন হইবে এই লোভে গুরুদেবের একটিমাত্র আদেশ লঙ্ঘনেই আমি বিপন্ন হইয়াছি। একটি আদেশ লঙ্ঘনেই সঙ্গে সঙ্গে দশটি নিয়মে শিথিলতা আসিয়া পড়িল।

পরে, অনাচারে স্বেচ্ছাচারে সবই ক্রমে হারাইয়াছি। কিছু দিন যাইতে না যাইতে আমার সঙ্কীর্ত্তনের সে ভাব ভক্তিও শুকাইয়া গেল। এখন কীর্ত্তনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছি; আমার সে ভাব নাই, আমার প্রতি এখন আর কাহারও শ্রদ্ধা নাই, বরং সাধারণের অবজ্ঞাই জন্মিতেছে। আমি এখন উকিল বাবুর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হইয়া দিন কাটাইতেছি। আমার উপায় কর।"

স্বামীজী পঠদ্দশায় ঢাকা কলেজে মথুর বাবুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মথুর বাবুকে স্বামীজী অকপটে স্বীয় দুরবস্থার কথা বলায়, তিনি দয়া করিয়া, স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে রাখিবার জন্য নিজের ছেলেদের মাষ্টার নিযুক্ত করিলেন। বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা; আহারাদির ব্যবস্থা আমাদেরই সঙ্গে হইল। সকালে সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা করিয়া ছেলেদের পড়াইয়া, অবশিষ্ট সময় স্বামীজী নিয়মিতরূপে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা মাসান্তে স্বামীজীর বেতনের টাকা কয়টি তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইতে লাগিলাম। নিয়মে চলিয়া কঠোর সাধন ভজনে কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী স্বীয় দুরবস্থা শোধরাইয়া লইলেন। এখন স্বামীজীর সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাই।

মথুর বাবুর কেরাণী শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণু যতি আমাদেরই বাসায় থাকেন। যতিবংশ বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রকৃতিটি স্বভাবতঃই সাত্ত্বিক। আফিসের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া, তিনি অবশিষ্ট সময় শুধু ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন। ত্রিসন্ধ্যাদি ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া এবং গঙ্গাস্নান, স্বপাকে আহার বহুকালহইতেই মহাবিষ্ণু বাবুর অভ্যস্ত। রাধাকৃষ্ণ বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসে। প্রায় প্রতিদিন রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেন। আফিসের কাজ করিতে করিতেও অহৈতুক ভাবোচ্ছ্বাসে কখনও কখনও অবশ হইয়া পড়েন; তখন আফিসের কাজ বন্ধ থাকে। এই মহাবিষ্ণু বাবু আমার সঙ্গে এক ঘরেই থাকেন। সুতরাং ভাগলপুরে আসিয়া, ভগবানের কৃপায়, আমার সৎসঙ্গীর অভাব রহিল না।

আমাদের বাসার পূর্ব্ব দিকে সুবিস্তৃত গঙ্গা—আজ কাল চড়া পড়াতে কিঞ্চিৎ অন্তরে সরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গার ঠিক উপরেই রহিয়াছি, বিশুদ্ধ বায়ু সতত সম্ভোগ করিতেছি, কিন্তু গঙ্গাজলে স্নান করি না। বদ্ধ জল স্থির সুতরাং অধিক নির্ম্মল—এই যুক্তি ধরিয়া আমি কূপোদকে স্নান করি। শ্রদ্ধেয় স্বামীজী ও মহাবিষ্ণু বাবু আমাকে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর কত মাহাত্ম্য বলেন! আমি তাহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। যাহা হউক, উঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিয়া, একসঙ্গে সকলে অমৃদয়ে, মাঘের

শীতে, গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলাম। কয়েক দিন গঙ্গাস্নান করিয়াই শরীরটি বেশ হাল্‌কা, ঝর্‌ঝ'রে বোধ হইতে লাগিল; দেখিলাম অরুণোদয়ে গঙ্গাস্নানে শরীরের সমস্ত গ্লানি ও অবসাদ দূর করে এবং মনটিকেও যেন স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে আসিয়া পড়ে; ভগবানের নাম সরসভাবে আপনা আপনি চলিতে থাকে। এসকল পরিষ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। এক দিন গঙ্গাস্নান করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার জাতি ও বংশগত সংস্কার আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মনে হইল, এই গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ 'উদ্ধার হইলাম' মনে করিয়া কত আনন্দই করিয়াছেন! পুরাকালে যোগী ঋষিগণ এই গঙ্গাজলে ভগবানের কতই আরাধনা উপাসনা করিয়াছেন! না জানি কি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা ইঁহাকে পতিত-পাবনী মোক্ষদায়িনী বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন। পরলোকে থাকিয়া, এই গঙ্গাজল পাইলে, এখনও তাঁহাদের কত আনন্দ হইবে! আমি তাঁহাদের উদ্দেশে আজ অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাজল দেই। ইহা ভাবিতেই আমার কান্না আসিয়া পড়িল। মনে হইল যেন কত যোগী ঋষি, দেব দেবী এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমাকে আজ আকাশে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমি দু'হাতে জল তুলিয়া তাঁহাদের স্মরণ করিয়া উৰ্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইল। দেব দেবী, ঋষি মুনি ও পিতৃপুরুষগণ আজ আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন—এই প্রকার কল্পনায় সারাদিন আমার উৎসাহ-আনন্দে কাটিয়া গেল। কল্পনা হইলেও এই আনন্দের লোভ আমি ছাড়িতে পারিলাম না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের সময়ে উঁহাদের উদ্দেশে জল দিতে লাগিলাম। পরে আর এক দিন মনে হইল—জলই যখন দিতেছি তখন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ধরিয়াই দেই না কেন? শাস্ত্রোক্ত প্রণালীমত উঁহাদের নাম ধরিয়া জল দিলেই তো উঁহাদের অধিক তৃপ্তি ও আনন্দ হইবে। এই ভাবিয়া, আমি নিত্যকর্ম্মের তর্পণপ্রণালী কণ্ঠস্থ করিলাম। সেই সময়হইতে আমি প্রত্যহ প্রণালীমত নিয়মিত তর্পণ করিয়া আসিতেছি।

তন্দ্রাবেশে চক্রশক্তির অনুভূতি।

রাত্রে আহারান্তে আজ স্বামীজীর সহিত একত্র এক বিছানায় শয়ন করিয়া গুরুদেবের প্রসঙ্গে তন্দ্রাবেশ হইল। দেখিলাম—স্বামীজী পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা আমার অধোদেশ টিপিয়া দিয়া বলিলেন—"এই স্থান মূলাধার; প্রাণায়ামদ্বারা এখানহইতে শক্তি আকর্ষণ করিয়া উৰ্দ্ধদিকে সহস্রারে লইয়া যাও; সমাধি হইবে।"

মাঘ মাস, ১২৯৬।

আমি তাঁহার কথামত ২।৪ বার প্রাণায়ামে দম দিতেই মূলাধার চক্র খিচিয়া উপরের দিকে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অমনই ঐ চক্রহইতে একটা শক্তি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া সর্ সর্ করিয়া উর্দ্ধদিকে চলিল। সে শক্তির দুর্ব্বার গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা, ধমনী যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। এসময়ে প্রাণায়াম থামাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একটা অদম্য শক্তি আমাকে অবশ করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রাণায়ামের দম চালাইতে লাগিল। দমে দমে শক্তি উর্দ্ধগামী হইয়া উপর উপর কয়েকটা চক্রের আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিল। মনে হইল যেন নাড়ী-ভুঁড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরের যা কিছু সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। 'উহু উহু' ছাড়া আমার তখন আর কোন বাক্য-স্ফুরণেরও শক্তি রহিল না। যাতনায় অস্থির হইয়া আমি ক্রমে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলাম। একটু পরেই এই শক্তি, পথ না পাইয়া, পাক ঘুরিয়া হঠাৎ নীচে আসিয়া পড়িল। এসময়ে খুবই আরাম বোধ হইল, কিন্তু এ অবস্থা মুহূর্ত্তকালমাত্র অনুভব করিলাম। পরক্ষণেই আবার সেই শক্তি আরও যেন অধিকতর প্রবলবেগে সর্ সর্ করিয়া উর্দ্ধদিকে ছুটিল। পুনঃপুনঃ, কিছুকাল ধরিয়া, এইভাবে শক্তির অধঃ উর্দ্ধ গতাগতিতে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ একবার মহাবেগে উত্থিত হইয়া, এই শক্তি স্বস্থানে গিয়া সহসা সম্পূর্ণ বিরাম লাভ করিল। তখন পরমানন্দ সাগরে আমি যেন একবারে ডুবিয়া গেলাম। ইহার পর আর কিছুই বলিবার নাই। কতক্ষণ যে এ অবস্থাটি স্থায়ী হইল জানি না। পরে, আবার এই শক্তি মূলাধারে নামিয়া আসামাত্র আমার জ্ঞান হইল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। অতিসংক্ষেপে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্রমটি মাত্র সঙ্কেতে লিখিয়া রাখিলাম। এই সময়ে হঠাৎ স্বামীজী জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"ভাই, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম ? গুরুজী যেন তোমার ভিতরে কি একটা প্রক্রিয়া করিতেছেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর, আক্ষেপ করিয়া, হাতের কব্জা নাড়িয়া তিনি বলিলেন—'আহা হা! সবটা হ'ল না, একটু র'য়ে গেল।'"

অপূর্ব্ব সূর্য্যমণ্ডল দর্শন।

এখন প্রত্যহ আমি রাত ৩ টার সময়ে উঠিয়া শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে, ৩॥ টা হইতে ভোর ৬ টা পর্য্যন্ত নাম, প্রাণায়াম ও কুম্ভক করি। স্নানের পর স্বামীজী ও বিষ্ণু বাবুর সহিত জলযোগ ও চা-পান করিয়া ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাগানে বসিয়া 'ত্রাটক'

সাধন করিয়া থাকি। আহারের পর বাসাহইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, গঙ্গাতীরের জনমানবশূন্য শিবমন্দিরে গিয়া প্রত্যহ বেলা ১২ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত নির্জ্জন সাধনে কাটাই। বিকাল বেলায় আমাদের বাসায় বহু ভদ্রলোকের সমাগম হয়। সন্ধ্যাপর্য্যন্ত মহাবিষ্ণু বাবু ও স্বামীজী তাঁহাদের লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। রাত্রে আহারান্তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গের বিরাম হয় না। মধ্যে মধ্যে আমরা রাত্রিতে বাগানে তমালতলায় যাইয়া বসি। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের ভিতরে সম্মুখে ধুনি রাখিয়া নাম করিতে করিতে বড়ই আরাম পাই। সারা দিনরাতই আমাদের যেন একটা ধর্ম্মোৎসব চলিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্নঘটনার পরহইতে সাধন ভজনে উৎসাহ আমার আরও বৃদ্ধি পাইল। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে গুরুদেবের রূপ মনে আসিয়া পড়িতে লাগিল। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'কল্পনা কখনও করবে না। নাম করতে করতে সত্যবস্তু আপনা আপনি প্রকাশিত হবে।' আমি কল্পনা কখনও করি না; অথচ একটুকু স্থির হইয়া নাম করিলেই অমনি অজ্ঞাতসারে গুরুদেবের রূপটি আপনা আপনি অন্তরে আসিয়া পড়ে। তখন উহাতে এতই আনন্দ পাই যে, কল্পনা হইলেও উহা আর ত্যাগ করিবার যো থাকে না।

ইতিমধ্যে এক দিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া, নাম করিতে করিতে স্বামীজীর সঙ্গে বাসায় আসিতেছি, মনটি গুরুদেবের মনোহর রূপে আবিষ্ট রহিয়াছে—অকস্মাৎ ললাটদেশে সুনীল আকাশে অসংখ্য বৈদ্যুতিক তেজোময় শুভ্র জ্যোতিঃ-সমন্বিত অপূর্ব্ব সূর্য্যমণ্ডল ঝক্ ঝক্ করিয়া উদিত হইল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র উহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে অবশাঙ্গ হইয়া বালির উপরে পড়িয়া গেলাম। * * * সাধন রাজ্যে কত কি আছে, জানি না। এসব দেখিয়া অবাক্ হইতেছি!

সাধনে অক্ষমতাহেতু কৌশলবুদ্ধি।

গঙ্গা-স্নানের গুণে অথবা দর্শনের লোভে সাধনে উৎসাহ আমার বৃদ্ধি পাইল। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিশ্রান্ত নাম করা গুরুদেবের আদেশ; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দেখিতেছি তাহা আমি পারিতেছি না। প্রত্যহ নিদ্রাহইতে উঠিয়া, শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিব বলিয়া দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া যাই; কিন্তু একটুকু সময় উহাতে লক্ষ্য স্থির হইতে না হইতেই দেখি অজ্ঞাতসারে মন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুনঃপুনঃ এই প্রকার চেষ্টায় হয়রান হইয়া পড়িতেছি। শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম করা কিছুতেই অভ্যাস করিতে পারিতেছি না। বহু

চেষ্টা করিয়াও যখন উহা পারিলাম না, তখন অন্য এক কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম। দিনে রাত্রে যতসংখ্যক শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে ততসংখ্যক নাম করিব সঙ্কল্প করিলাম। পরে গুরুদেব কৃপা করিয়া প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাথায় উহা বসাইয়া দিলেই আমার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা হইবে। এইরূপ বুদ্ধি করিয়া ২১৬০০ শত নাম করিতে লাগিলাম। যদি শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিই হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নামের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ৩০।৩২ হাজার নাম করিতে লাগিলাম। কর ও মালায় নাম জপ এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, নিদ্রিত অবস্থায়ও আপনা আপনিই আমার কর ঘুরিয়া আসে, অপরের মুখে শুনিতে পাই। সংখ্যা পূর্ণ করিতে গিয়া সারাদিনে কাহারও সঙ্গে এখন আর কথা বলিবারও অবসর পাই না। বাহিরে খুব স্থির থাকিলেও, সংখ্যাপূরণচেষ্টায় ভিতরে অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়ি। অনেক সময় এই জন্য মাথা গরম হইয়া যায়। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'আমাদের সাধনে শ্বাস প্রশ্বাসই নামের জপমালা।' যখন কিছুতেই তাহা আমি ধরিতে পারিলাম না, তখন সুবিধা বুঝিয়া বাহিরের মালা গ্রহণ না করিয়া আর কি করিব? জানি না, গুরুদেব আমার এই কৌশলপূর্ব্বক সাধারণপ্রণালীমত সাধনে অনুমোদন করিবেন কি না।

ত্রাটক সাধনে দর্শনের ক্রম।

ত্রাটক সাধন অনেক কাল করিয়া আসিতেছি। গতবৎসরহইতে এই সাধনের সময়ে নানাপ্রকার দর্শন আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার যাহা দর্শন হইয়াছে ক্রমানুসারে তাহা তুলিয়া এই স্থানে লিখিয়া যাইতেছি।

(১) সাধনসময়ে লক্ষ্যস্থলে ৪।৫ ইঞ্চি পরিমিত, ঘড়ীর স্প্রিংএর মত, বহুস্তরবিশিষ্ট গোলাকার, অতিশয় চঞ্চল, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ৪।৫ টি চক্র অবিচ্ছেদ গতিতে বামাবর্ত্তে এবং তাহাই আবার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। কিছুদিন দর্শন করিলাম।

(২) দৃষ্টি স্থির করিতে করিতে পরে দেখিলাম উক্ত চক্রগুলির আয়তন কমিয়া গেল। পরে, উহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটিমাত্র স্থির মণ্ডলাকারে পরিণত হইল, এবং ঐ মণ্ডল মধ্যে সরিষার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিন্দু প্রকাশিত হইল। উহার চতুষ্পার্শ্বে ৪ টি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ খণ্ডজ্যোতি ঝিকি মিকি করিতে লাগিল। মণ্ডলের মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব অবিরাম জ্যোতির্ব্বুদ্‌বুদ উদ্গিরণ করিতে লাগিল। প্রায় ৩।৪ মাস কাল সাধনসময়ে এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল।

(৩) মাঘ মাসের প্রথমহইতেই ঐ দর্শনটি অন্যপ্রকার হইয়া পড়িল। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ৬ ইঞ্চি পরিমিত একটা মণ্ডলের মধ্যস্থলে একটি শ্বেতোজ্জ্বল, তেজঃপূর্ণ বলয় প্রকাশ পাইল। অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ দ্বাদশটি শুভ্র জ্যোতিঃ সমন্বিত অঙ্গুরী মণ্ডলাভ্যন্তরে সমান অন্তরে থাকিয়া উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রায় ৩ মাস কাল এইরূপ দর্শন করিলাম।

(৪) উহাতে দৃষ্টি স্থির রাখিতে রাখিতে বর্ত্তমানে উহা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। চক্ষু কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটু স্থির ও পলকশূন্য হইলেই ৫।৬ ইঞ্চি পরিমিত, জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতোজ্জ্বল সমচতুর্ভুজ যন্ত্র, বৃত্তাকার মণ্ডলের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিছুক্ষণ উহাতে তীব্র দৃষ্টি রাখিলেই উহা একটি মটরের আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইয়া অধিকতর ঘন ও উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যেখানে সেখানে, যে কোন অবস্থায় দিনে ও রাত্রে যখন তখন এই জ্যোতি একটু দৃষ্টি স্থির রাখিবামাত্রই দর্শন হইতেছে।

ত্রাটক সাধনের প্রথম স্তরে ক্ষিতিতেই এপর্য্যন্ত দৃষ্টি স্থির করিয়া আসিতেছি। গুরুদেবের ব্যবস্থামত সেই সঙ্গে এখন ব্যোমে দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলাম।

তর্পণে ছায়ারূপদর্শন। কুকুরের কাণ্ড।

অতি প্রত্যূষে যখন গঙ্গাস্নানে যাই, পথে প্রত্যহই আমার মনে হয় যেন দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষগণ আমার হাতে গঙ্গাজল পাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। স্নান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে তাঁহাদের আহ্বানেই আমার কান্না পায়। পিতৃতর্পণ কালে প্রতিগণ্ডুষ জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জলের উপরে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতির চঞ্চল ছায়া দর্শন করি। দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ কালে এইরূপ ছায়া কল্পনা করিয়াও দৃষ্টিতে আনিতে পারি না। পিতৃতর্পণ শেষ হইয়া গেলে, মুহূর্ত্তকালও উহা আর থাকে না।

২০শে মাঘ, ১২৯৬।

আজ দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ শেষ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছি, ৭।৮ হাত অন্তরে গঙ্গার পাড়ে একটি প্রকাণ্ড কুকুর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। ভয়ঙ্কর শীতে অন্ধুদয়কালে কুকুরটি জলে নামিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতে লাগিল। স্বামীজী ও মহাবিষ্ণু বাবু উহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন; কুকুরটি তখন ক্ষীণকণ্ঠে অতি কাতরস্বরে এমন একটি ক্লেশসূচক শব্দ করিল যে, তাহা শুনিয়া উঁহারা আর তাহাকে বাধা দিলেন না। ভরা মাঘের ভোরের শীতে গঙ্গায় অবগাহনে মানুষ অবশ হইয়া পড়ে, আর

অনায়াসে কুকুরটি গলাপর্য্যন্ত ডুবাইয়া আমার দক্ষিণ দিকে জলমধ্যে প্রায় একহাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল; তৎপরে তর্পণের জল গঙ্গার স্রোতে পড়িয়া যেমন বহিয়া যাইতে লাগিল, কুকুরটি মুখব্যাদান করিয়া পুনঃপুনঃ আগ্রহের সহিত তাহাতেই ছোঁ মারিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া কুকুরটি উপরে উঠিল। আমিও তর্পণ শেষ করিয়া তখনই পাড়ে উঠিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন জনেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত বালির চড়ায় কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না! দ্রুতগামী অশ্বও এত অল্প সময়ে এই প্রকাণ্ড চড়া পার হইয়া অদৃশ্য হইতে পারে না। সমস্তদিন কুকুরটির কথা মনে হইতে লাগিল।

***

ভাগলপুরে সাধু পার্ব্বতী বাবু। ইষ্টদেবকে সুস্থ রাখাই সাধন ও সদাচারের উদ্দেশ্য।

ভাগলপুরের বারোয়ারীতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন সদাচারসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আছেন; সহরের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্-প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করে। স্বামীজী ও মহাবিষ্ণু বাবুর সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। পুরাকালে ঋষিদের তপোবনের যেপ্রকার বর্ণনা শুনিয়াছি, পার্ব্বতী বাবুর আশ্রমটি যেন তাহাই দেখিলাম। নিস্তব্ধ বাগানটি নানাপ্রকার ফলফুলে সুশোভিত; শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবিধপ্রকার বৃক্ষে পরিবৃত। উপস্থিত হওয়ামাত্রই ইচ্ছা হইল উহার যে কোন স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করি। বৃক্ষলতা সহিত সমস্ত আশ্রমটি যেন ভগবদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। লোকালয়ে এমন সুন্দর তপোবন কোথাও দেখি নাই। পার্ব্বতী বাবুর ভজনকুটীরখানা বিস্তৃত বাগানের এক প্রান্তে। পার্ব্বতী বাবুকে দেখিয়াও মনে হইল যেন একটি ঋষিকে দর্শন করিলাম। রক্তাভ গৌরবর্ণ তেজঃপুঞ্জ শরীরে তেজস্বিতা এবং পবিত্রতা যেন মাখা রহিয়াছে। তিনি বারমাস ত্রিশদিন অরুণোদয়ে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যা তর্পণাদি করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করেন, পরে শালগ্রাম ও পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া চণ্ডী, গীতা, উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন; ১১ টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন; অতঃপর এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামান্তে কুটীরের বারেন্দায় বসেন; এবং ভগবদ্‌ভাবে অভিভূত হইয়া সারাদিন ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করেন। রাত্রিতেও অতি অল্পসময় নিদ্রা যাইয়া, অবশিষ্ট নিশা ইষ্টস্মরণে কাটাইয়া দেন। আজ ৪২ বৎসর কাল তিনি এই নিয়মে আছেন; শুনিলাম, একটি দিনের জন্যও

নিয়মিত কার্য্যে তাঁহার বাধা হয় নাই। ষড়দর্শনে ইনি অগাধ পণ্ডিত; পুরাণ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে ইঁহার অসীম বিশ্বাস; আবার বাইবেল কোরাণাদিও ইনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইঁহাকে 'থিয়োসফিষ্ট' বলেন। 'থিয়োসফীর' সংবাদ-পত্রাদি ইঁহার আসনের ধারে স্তূপীকৃত রহিয়াছে দেখিলাম। আপন ভজনাচারে নিরত ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীদিগকে কিরূপে এমন শ্রদ্ধাভক্তি করেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। পার্ব্বতী বাবু ভক্ত কি জ্ঞানী, বুঝিলাম না। ভক্তির কথা বলিতে বলিতেও তিনি কান্দিয়া আকুল হন। আবার জ্ঞানের আলোচনা সময়ে স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া বসেন। সরল প্রাণে, বিনয়ের সহিত জাতিনির্ব্বিশেষে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করেন। পার্ব্বতী বাবুর সঙ্গ আমার বড়ই ভাল লাগিল। প্রতি সপ্তাহেই আমি দুই দিন করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলাম। পার্ব্বতী বাবুরও অসাধারণ স্নেহ আমার উপরে পড়িল। তিনি আমাকে উপনিষদের মর্ম্ম বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া অতি সংক্ষেপে সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতির মত, উপদেশ করিতে লাগিলেন।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের আলোচনায় আমার শাস্ত্র-সদাচারে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। তাহারই ফলে, প্রতিপদে প্রত্যেক ব্যাপারে আমি বিচার করিয়া চলিতে লাগিলাম। শুদ্ধাচারে থাকিয়া নিয়মনিষ্ঠাপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে সাধন ভজন করার ফল গুরুদেবের কৃপায় আশ্চর্য্য-রূপেই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে এই দর্শন শাস্ত্রের ব্যষ্টি, সমষ্টি ও ঘটপটাদির বিচার বিতর্কে আমার অন্তর ধীরে ধীরে শুষ্ক ও সংশয়পূর্ণ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের অসাধারণ কৃপার উপরেও আমার বিচার আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার প্রদত্ত অপ্রাকৃত সাধনরাজ্যে ভূমিকম্প উঠিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিল। নিজের স্মরণার্থে এসব অবস্থার আভাস লিখিয়া রাখিতেছি। দু' চার খানা পুরাণ পাঠ করিয়া ও দর্শন শাস্ত্রের একটু আধটু আলোচনা শুনিয়া, 'সাধন করার প্রয়োজন কি?' এই সন্দেহ জন্মিল। 'পুরুষকারের অনুষ্ঠান বা প্রারব্ধের ভোগ লইয়াই এই সমস্ত সংসার চলিতেছে' পুরাণাদিতেও ইহাই তো দেখিতেছি। কিন্তু পুরুষকারের দ্বারাই যদি প্রারব্ধের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে উহার ফলাফল যে বড়ই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। কারণ অসদনুষ্ঠানে দুর্ভোগ, সদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইলে, প্রারব্ধের কোন ভোগ নির্দ্দিষ্ট বা স্থির নিশ্চিত হইতে পারে না। আবার এই প্রারব্ধই যদি কার্য্যের প্রবৃত্তি বা তদনুষ্ঠানের হেতু হয় তাহা হইলে পুরুষকার তো সর্ব্বথাই অর্থশূন্য কথা হইয়া পড়ে। আবার পুরুষকার দ্বারা ভোগের সৃষ্টি হয় একথা স্বীকার না করিলে ভোগই বা আসিল কোথাহইতে? আর যদি প্রারব্ধই যাবতীয় কার্য্য ও ভোগাদির

হেতু হয়, তাহা হইলে সেই প্রারব্ধের অর্থ মূলতঃ ভগবদিচ্ছাব্যতীত আর কি বলিব? তাঁহারই ইচ্ছায় প্রারব্ধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কার্য্য ও ভোগ হইতেছে। জীবের প্রারব্ধব্যতীত একটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ইচ্ছা আর নাই। সুতরাং মনে হয় সমস্তই ভগবদিচ্ছায় হইতেছে; জীব শুধু দ্রষ্টা ও ভোক্তা মাত্র। তাহা হইলে সাধন ভজন আর করি কেন; নিয়ম নিষ্ঠায় এবং সদাচারে থাকিতে এত অশান্তি উদ্বেগই বা ভোগ করিতেছি কেন? গুরুদেব নিজেই বলিয়াছিলেন যে আমার আর কোন স্বাধীনতাই নাই, আমি তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান, শুধু তাহা হইলে যাহা আমার ভিতরে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাই আমি ভোগ করিতেছি। গর্ভস্থ সন্তানের দেহপুষ্টি ও জীবনধারণ কিছুই তাহার স্বীয় চেষ্টাসাধ্য নহে; উহা সাধারণ ভাবে গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে। সন্তানের অঙ্গসঞ্চালনে গর্ভধারিণীর ক্লেশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য; নিয়ম, সদাচার, সাধন ভজন এবং গুরুবাক্যের অনুষ্ঠানদ্বারা দেহ মন স্থির থাকে; সুতরাং গর্ভিণী তাহাতে শান্তিতে থাকেন; আর যেমন তেমন চলিতে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে দেহ ও মনের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভধারিণীর যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখিতেছি নিয়ম, সদাচারে থাকার এবং সাধন ভজন করার আর কোন প্রয়োজনই নাই; শুধু নিজে স্থির থাকিয়া আধার স্বরূপা জননীকে সুস্থ রাখাই এই সকলের উদ্দেশ্য। অনিয়মে স্বেচ্ছাচারে চলিয়া, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে হাত পা নাড়া চাড়া করিলে জননীর বিষম যন্ত্রণা হইবে, এই ভাবটি অন্তরে আসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সংস্কারও বদ্ধমূল হইল যে আমার প্রতি কার্য্য, প্রতি পদক্ষেপ শ্রীগুরুদেব অনুভব করিতেছেন। যতই নিয়মে ও সদাচারে থাকিব এবং সাধন ভজন করিব ততই তিনি সুস্থ থাকিবেন ও আনন্দ পাইবেন। নিজের উন্নতির জন্য সাধন ভজন নয়; গর্ভধারিণী জননীকে আরামে রাখাই নিয়ম নিষ্ঠা ও সাধন ভজনের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মই ধর্ম্ম।

মাঘ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ-হইতে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

আমার গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপাতে যেসকল কল্পনাতীত ভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া পরমোৎসাহে আমাকে তাহাতে নিযুক্ত করিতেছে, আমার ভ্রান্ত বুদ্ধিকে গুরুদেবের সেইভাবের অনুগামী করিয়া বিচারদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলাম, জ্ঞানের অঙ্কুর না জন্মিতে জন্মিতে তত্ত্বের নিরূপণ বা মীমাংসার প্রয়াস যদিও মূর্খতা বা বাচালতা বই আর কিছুই নয়, তথাপি

যে সকল এলো মেলো জল্পনা কল্পনাতে, আমি আমার গুরুদেবের ইচ্ছামত চলিতে দ্বিধা-শূন্য হইতেছি, সেই সকলের সহিত এই জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ হেতু এই স্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেছি ; এখন আমার মনে হইতেছে—কর্ম্মই সার। কর্ম্মই ধর্ম্ম ; কর্ম্ম না করিলে কিছুই হইবে না। কর্ম্মদ্বারাই জীবের বাসনা পূর্ণতৃপ্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই পরিণামে জীবের স্বরূপ অবস্থা লাভে মুক্তি হয়। এখন কোন্ প্রকার কর্ম্মদ্বারা কাহার বাসনা ক্ষয় হইবে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে ? কর্ম্মেতে বন্ধন হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশও ত দেখিয়াছি। শাস্ত্রবাক্য যখন অভ্রান্ত, তখন তাহার সঙ্গে আমার এই সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কোথায় ?

বাসনানুযায়ী কর্ম্মের ফলভোগেই যখন জীবের পূর্ণ তৃপ্তিতে স্বরূপতা প্রাপ্তি, তখন সেই বাসনানুরূপ কর্ম্মই তাহার পক্ষে কল্যাণকর বা স্বভাবধর্ম্ম। জীব বাসনানুরূপ ভোগের নিমিত্ত কেহ সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে সাধুকর্ম্মদ্বারা ভোগের পরিসমাপ্তিতে স্বরূপাবস্থা লাভ করিতেছে, আবার কেহ বা ভিন্নরূপ ভোগের কল্পনায় তদনুযায়ী রজস্তমঃ সহায়তায় ভোগের তৃপ্তিসাধনান্তে মূল অবস্থায় উপনীত হইতেছে। কোন্ জীব যে কি ভাবে কোন্ কর্ম্মদ্বারা আপন বাসনাক্ষয়জনিত মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সাধু কর্ম্মদ্বারা যেমন সত্ত্বগুণাশ্রয়ীর কল্যাণ হইতেছে, অসাধু বা অসৎ কর্ম্মদ্বারাও সেইপ্রকার রজস্তমোঽধিকৃত জীবের বাসনাক্ষয়ে উপকার হইতেছে। সন্ধ্যা বন্দনা, যাগ যজ্ঞ ও তপস্যাদি করিয়া যেমন এক জনের পরম মঙ্গল সাধিত হইতেছে, সেইপ্রকার হয় ত তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধানুষ্ঠানেও আবার অন্য কাহারও প্রভূত কল্যাণ ঘটিতেছে। কোনও জীবের মুক্তির জন্য যেমন কেবল সৎকর্ম্মই প্রয়োজন সেইপ্রকার কোন জীবের মুক্তির নিমিত্ত অসৎকর্ম্মেরও আবশ্যকতা থাকিতে পারে। গীতায় বলিয়াছেন—

"স্ব-ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"

বাসনানুযায়ী ভোগের জন্য যেসকল গুণকে অবলম্বন করিয়া জীব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম, জীবের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জীব সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইয়াও যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও তাহা কল্যাণকর ; কারণ, বাসনার আংশিক তৃপ্তিতে জীব তাহার স্বরূপ অবস্থার দিকেই কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইল ; কিন্তু স্বাভাবিক গুণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধানুষ্ঠান মহাসাত্ত্বিক হইলেও, তদ্দ্বারা জীবের কোন কল্যাণই নাই। উহাতে জীবের বাসনানুযায়ী ভোগের তৃপ্তি হয় না, মুক্তিও হয় না। লোকে যাহাকে অধর্ম্ম বলে, পাপ বলে, অপরাধ বলে, কেহ তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া স্বরূপ চৈতন্য লাভের পথে অগ্রসর

হইতে পারে ; আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সদ্ধর্ম্মে কালযাপন করিয়া, পূজা, বন্দনা ও পরোপকারাদি করিয়া, পরধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, তাহার স্বরূপ অবস্থাহইতে আরও দূরে যাইয়া, কর্ম্মরাশিতে আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। জীববিশেষের পক্ষে সাধারণ পাপও ধর্ম্ম হয়, আবার সাধারণ ধর্ম্মও পাপ হয়। সুতরাং পাপ পুণ্যের দিকে কোনরূপ সংস্কার না রাখিয়া শুধু অন্তর্নিহিত অদম্য বাসনানুরূপ কর্ম্ম করিয়া যাই, তাহাতেই ক্রমে বাসনার পূর্ণ তৃপ্তিতে অন্তর্দ্বন্দের নিবৃত্তি হইবে, মুক্তিলাভ ঘটিবে। বারদীর ব্রহ্মচারীকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া শুনিয়াছি ; তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বাসনানুযায়ী ভোগের নিবৃত্তি ঘটাইতে লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্যে কৌশলপূর্ব্বক নিয়োগ করিয়াছিলেন। অহর্নিশি তাহাতে যথেচ্ছ অনুরক্ত থাকিয়াও অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ঐ আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিয়াছিল। এইপ্রকার বহু দৃষ্টান্ত আরও রহিয়াছে। বাসনাহইতেই দেহের উৎপত্তি ; দেহ শুধু কর্ম্মেরই যন্ত্র ; কর্ম্মের জন্যই আসা। কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং এই কর্ম্মেই মুক্তি।

সংস্কার রহিত বুদ্ধিতে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া অবিশ্রাম কর্ম্ম করার প্রবৃত্তি জন্মিল ; তদনুসারে খুব কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। কি প্রকার কর্ম্মে আমার বাসনা স্ফূর্ত্তি পাইবে তাহা ধরিবার জন্য নানাপ্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করিলাম। মধ্যাহ্নে আফিসে যাইয়া কাজ শিখিতে লাগিলাম, অপরাহ্ণে মথুর বাবুর প্রকাণ্ড সংসারের সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলাবিধানে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে এত কর্ম্মের চাপ আমার উপরে পড়িল যে, সারাদিনে আমার আর তিলার্দ্ধ অবসর রহিল না। প্রাতে ও রাত্রে নামজপের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতে লাগিলাম। অবিশ্রান্ত অপরিমিত শ্রমে আমার বেদনারোগ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে শরীরের অতিরিক্ত অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ম্মের স্পৃহাও কমিতে লাগিল ; যে সকল কর্ম্মে আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা, প্রাণে উৎসাহ আনন্দ ছিল, তাহাতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ ভাব, বিরক্তি ও ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। আমি আফিসে যাওয়া বন্ধ করিলাম, সংসারের যাবতীয় কর্ম্মেও উদাসীন হইয়া পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একটি সাধুর নিষ্কাম অনুষ্ঠান দেখিয়া আমার ভিতরে কর্ম্মসম্বন্ধে আর এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল।

পাগলা সাধুর নিষ্কাম কর্ম্ম।

আমাদের বাসার সম্মুখে গঙ্গার পারে বালুর চড়ায় একটি লোক সারাদিন পড়িয়া থাকে। সকলে তাহাকে 'পাগলা' বলিয়া ডাকে। পাগলা কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকে, কখনও উত্তপ্ত বালুর উপরে শুইয়া থাকে, আবার কখনও বা আপন মনে চড়ার উপরে

দৌড়াদৌড়ি করে। পাগলা কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রে গঙ্গাতীরে শিবমন্দিরে গিয়া পড়িয়া থাকে।

একদিন দেখি পাগলা একটি গাছের কাটা ডাল কোথাহইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। বালুর চড়াতে গঙ্গাহইতে ২।৩ মিনটের পথ ব্যবধানে উহা পুতিয়া রাখিয়াছে; এবং বড় একটা ঘড়া ভরিয়া গঙ্গাহইতে জল আনিয়া ক্রমাগত উহার গোড়ায় ঢালিতেছে। প্রাতঃকালহইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাগলার এ কার্য্যের বিরাম নাই। এক একবার দম নিতে একটু বসিতেছে, আবার অমনই যেন পিছনে কাহারও তাড়া খাইয়া ঘড়া কাঁধে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে এবং গঙ্গাহইতে জল আনিয়া ডালের গোড়ায় ঢালিতেছে। সূর্য্যোদয়হইতে সূর্য্যাস্ত-পর্য্যন্ত তিন দিন এই ভাবে কঠোর শ্রম করিয়া, পাগলা যখন দেখিল ডালটি আর বাঁচিল না, শুকাইয়া গিয়াছে, তখন ঘড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, পাগলা একদিকে ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইল। পাগলাকে আর চড়ায় দেখিতে পাই না; কোথায় যে গেল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। পাগলা আমার পানে বড়ই স্নেহভাবে তাকাইত! পাগলার ঐ কাটা ডালটির গোড়ায় জল ঢালা যেন বড়ই জরুরি কাজ, এই প্রকার ভাব দেখাইত। পাগলা যে একজন ভাল সাধু, তাহার কয়েকটি নিঃস্বার্থ কার্য্যে তাহার নিদর্শন পাইয়াছিলাম। চাউল, ছোলা বা ভুট্টা ইত্যাদি সে যাহা কিছু পাইত, পাখীদের ছড়াইয়া দিত; শামুক ঝিনুক প্রভৃতি যাহা তরঙ্গাঘাতে পাড়ে উঠিয়া আসিত, পাগলা তাহা খুঁজিয়া নিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিত—ইত্যাদি। পাগলার উপরোক্ত কার্য্যটি দেখিয়া আমার ভিতরে কর্ম্মসম্বন্ধে আর এক সমস্যা উপস্থিত হইল।

নিষ্কাম কর্ম্মই ধর্ম্ম।

মনে হইল—গুণত্রয়ের ক্রিয়া ভূত সংযোগে সম্পাদিত হওয়ার নামই কর্ম্ম, এই কর্ম্মে ভোগাকাঙ্ক্ষা হইলে বা বাসনা জড়িত হইলেই তাহা সকাম; আর, ভোগলালসা পরিশূন্য বা বাসনা বর্জ্জিত হইলেই উহা নিষ্কাম হয়। জীব বাসনাকে গুণে মিলিত করিয়া গুণদ্বারা ভূত সম্পাদিত সকামকর্ম্মদ্বারা জীবের স্বরূপ অবস্থা লাভ বড়ই কঠিন ব্যাপার, সামান্য সুখের চেষ্টায় কত দুঃখ পাইতে হয়, কিঞ্চিৎ ভোগের পথে কত দুর্যোগ ঘটে—জীব ইহা দেখিয়া, যদি ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আসক্তি পরিশূন্য গুণত্রয়দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পাদিত হইবে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম; এই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীব অন্তর্ম্মুখী হইয়া স্বরূপ অবস্থার দিকে উন্নত হইতে থাকিবে।

এইভাবে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মকেই আমি মুক্তি লাভের সহজ উপায় স্থির করিলাম। যে কার্য্যে আমার কোন প্রকার স্বার্থ বা আসক্তি নাই, বরং দারুণ বিরক্তি, উৎসাহের সহিত তাহা করিতে লাগিলাম। মথুর বাবুর বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার আমার নিজের উপরে লইলাম। তাঁহার সেই মাতৃহীন কচি কচি ছেলে মেয়েগুলিকে দু'বেলা মৎস্যাদি-দ্বারা নিজ হাতে আহার করাইতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নে আফিসের কাজে মহাবিষ্ণু বাবুর সাহায্য করিতে লাগিলাম। বাগানে মালীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সব কাজ-কর্ম্মের তদারক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অপরাহ্ণে প্রত্যহ বহুসংখ্যক স্কুলের ছেলেদের 'জিমন্যাষ্টিক্‌স্' শিক্ষা দিতে লাগিলাম। কিছুকাল এইপ্রকার করার পর আমার বারংবার মনে উদয় হইতে লাগিল, যদি আমি নিষ্কাম কার্য্যই করি তাহা হইলে ইহাতে এত উৎসাহ কেন ? উৎসাহের মূলে, বাসনা ক্ষয় করা, কর্ম্ম শেষ করা, মুক্তির পথ পরিষ্কার করা, এইপ্রকার সংস্কার অন্তরে রহিয়াছে পরিষ্কার বুঝিলাম। নিষ্কাম কর্ম্ম করিব সঙ্কল্পে যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহাও সকাম অর্থাৎ মূলে নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য রাখিয়া, নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের প্রতি চেষ্টায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছি, এই সংস্কার ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে। সুতরাং সংস্কারবর্জ্জিত না হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম করিব কিরূপে ? সদসৎ, ভাল মন্দ বুদ্ধি থাকিতে কখনও সংস্কার ত্যাগ হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে এসকল বিচারবুদ্ধি কি প্রকারে লোপ পাইবে ? মনে হয়—সদাচারে বহুকাল থাকিয়া যদি তাহা প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে, স্নানাহার ও মল মূত্র ত্যাগের মত, সঙ্কল্পশূন্য স্বাভাবিক অভ্যস্ত ক্রিয়া বলিয়া, উহা কথঞ্চিৎ নিষ্কাম হইতে পারে।

এসকল ভাবিয়া আমি পূর্ব্ববৎ আবার ঘড়ী ধরিয়া দৈনিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। উদ্দেশ্য এসকল কার্য্য অভ্যস্ত হইলেই একমত নিষ্কাম হইবে।

জ্যোতির্দর্শন।

অবিচলিত একাগ্রতার সহিত অনিমেষ সাধন করিতে করিতে গুরুদেবের কৃপায়, ধীরে ধীরে, এক একটি অদ্ভুত দর্শন খুলিয়া যাইতে লাগিল। যথাক্রমে তাহা লিখিয়া যাইতেছি—

(১) প্রথমে কিছুদিন স্থির, শ্বেত প্রভাপরিমণ্ডিত, বহু খণ্ড ঘননীল জ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে সংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে, দ্রুতগতিতে, ধীর তরঙ্গে প্রতিফলিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ময়ূরপুচ্ছের কেন্দ্রহইতে দ্বিতীয় স্তর কতকটা এই জ্যোতির বর্ণের অনুরূপ।

(২) ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা অন্যপ্রকার হইল। বলয়াকার শ্বেত প্রভা পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল, গাঢ় নীল জ্যোতি ঘন আবর্ত্তে ঘূর্ণন ও কম্পন সহকারে চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিব্যাপ্ত মণ্ডল ৩।৪ ইঞ্চি পরিমিত দেখিতে লাগিলাম।

(৩) কিছু দিন পরে ধীরে ধীরে উহাও পরিবর্ত্তিত হইল। পীতাভ শ্বেত জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যে, অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ জ্যোতি দেখিতে লাগিলাম। নিকটে এই জ্যোতি নখপরিমিত খণ্ডাকারে উজ্জ্বল মণিবৎ স্থিরভাবে প্রকাশিত; আবার, দূরত্ব অনুসারে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আকারে কম্পনসহকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষের অমুদ্রিত মুদ্রিত সকলপ্রকার অবস্থায়, স্থানে অস্থানে যেখানে সেখানে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভিতরহইতে ময়ূরপুচ্ছের চতুর্থ স্তরের সহিত এই বর্ণের কতক উপমা হইতে পারে।

(৪) তৎপরে ক্রমে ক্রমে শ্বেতমণ্ডলটি বিলুপ্ত হইয়া গেল। নিয়ত মটরের মত আকৃতি-বিশিষ্ট, হরিৎ ও নীল মিশ্রিত, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি নিকটে ও দূরে একই আকারে নিশ্চলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মিশ্রিত বলিয়া, ময়ূরপুচ্ছের রঙ্গের কোনও স্তরের সহিত ইহার সাদৃশ্য বুঝা গেল না।

(৫) এখন কদাচিৎ বিদ্যুতের মত চঞ্চল, অত্যদ্ভুত দীপ্তিসম্পন্ন গাঢ় নীল জ্যোতি, ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। এই জ্যোতির তুলনা নাই। প্রকাশে যেমনই আনন্দে দিশাহারা হইতেছি, অন্তর্দ্ধানে তেমনই চিত্তে হাহাকার উঠিতেছে।

কর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম।

আমার কোন কর্ম্মেই ভাল লাগিতেছে না। নিয়ত আসনে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। লোকে যাহাকে সৎ কার্য্য, পুণ্য কার্য্য বলে, আত্মার কল্যাণের পক্ষে তাহাও যেন অন্তরায় মনে হইতেছে। প্রবৃত্তির অনুকূল বিচারবুদ্ধিতে এখন আমাকে সমস্ত কর্ম্মেই নিবৃত্ত করিতেছে। মনে হইতেছে, সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মবিরোধী। জীবাত্মার স্বরূপাবস্থায় ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকাই ধর্ম্ম। চিৎকণা বা জীবাত্মার ক্রমবিকাশের গতিই কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্ম সর্ব্বদাই জীবের বহির্ম্মুখ অবস্থা। ইহার পরিণাম চিৎকণের স্বরূপাবস্থা-হইতে স্খলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলহইতে স্থূল-তরে পরিণতি। যে স্থলে জীবাত্মার কর্ম্মের সমাপ্তি তথায় তাহার বিকাশেরও নিবৃত্তি। সুতরাং দৈহিক স্থূল কর্ম্মহইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম মানসিক কর্ম্মেরও বিরতি ঘটিলে জীবের দেহাত্মবুদ্ধির বা স্থূলতাপ্রাপ্তির

মূল বিলয়ান্তে সূক্ষ্ম মানসরূপেরও অবসান হইবে। তৎপরে জীব যতই সূক্ষ্মতর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় বা স্থির হইতে থাকিবে, ততই বাসনাবর্জ্জিত স্বরূপাবস্থার দিকে উপনীত হইবে। এজন্য যাবতীয় কর্ম্মের মূল বাসনাকেও ত্যাগ করিয়া—'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা না কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।' নিবৃত্তিই যথার্থ ধর্ম্ম, যাবতীয় কর্ম্মই জীবাত্মার বিকাশক্রম বলিয়া ধর্ম্মবিরোধী।

* * * * *

গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা। ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের আলোচনায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাকে একেবারে উদাসীন করিয়া তুলিল। আমার এখন মনে হইতেছে, কর্ম্ম করা মহা অনর্থ। কিছুদিনযাবৎ আমি বাহিরের যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ করিয়াছি। নিত্য আবশ্যকীয় অভ্যস্ত আহার নিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সময় নির্জ্জনে বসিয়া বিধিমত ইষ্ট নাম সাধনে পুনঃপুনঃ মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতেছি। ঐপ্রকার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের রূপ আপনা আপনি চিত্তে উদিত হইতেছে। আমার দেহে গুরুর দেহ, আমার প্রকৃতিতে গুরুর প্রকৃতি, এই প্রকার ধারণা নাম স্মরণের সময়ে প্রবলবেগে অন্তরে আসিয়া পড়ে। আমার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আপাদমস্তক সর্ব্বাবয়ব যেন শ্রীগুরুদেবেরই কলেবর; তিনি আমাকে আচ্ছাদন করিয়া যেন এই দেহে রহিয়াছেন। নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার অভাবনীয় ধারণা চিত্তে উদয় হয়। আমি সাধনকালে তফাৎ থাকিয়া, নিজের ভিতরে নিজেকে না পাইয়া গুরুদেবকেই দর্শন করি। ইহাতে আমার এতই আনন্দ হয় যে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। নামরূপী সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুদেবকে নিজের ভিতরে তন্ময়ভাবে ধ্যান করিতে করিতে আমার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়; সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে; অবিরামধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে। গুরুদেবের পরম সুন্দর মনোহর রূপের স্মৃতিমাত্রে আমার ভিতরে যে কি হয় তাহা আর বলিতে পারি না।

শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনায় সাধনরাজ্যে একপ্রকার যুগপ্রলয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। জ্যোতির্দর্শন কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। নূতন উৎসাহে, নূতন ভাবে, আবার যখন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, বিলুপ্তপ্রায় সবুজ আলো, শ্বেত আলোর সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই মিশ্রিত আলোকদ্বয় খণ্ড খণ্ড জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়া পড়িল। ২রা ফাল্গুন অপরাহ্ণে, শ্বেত জ্যোতির মধ্যে নখপরিমাণ নিবিড় কালবর্ণ একটি আকৃতি দর্শন করিলাম। ৩রা ফাল্গুন তারিখেও নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত

ঐরূপ দর্শন হইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে যেমন শ্বেত জ্যোতি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল, কালরূপটিও তেমনই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। কালরূপটি দেখিয়া মনে করিলাম বুঝি বা কৃষ্ণরূপই প্রকাশ পাইবেন; কারণ উঁহার মাথায় চূড়ার মত দেখিতে লাগিলাম। হাত পা ও আকৃতির গঠন দেখিয়া পরিষ্কার মনে হইল কৃষ্ণই প্রকাশিত হইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কাল আকৃতি কৃষ্ণ নয়। পূর্ব্বে যেরূপ দাঁড়ান ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা উপবিষ্ট। পূর্ব্বে যাহা কৃশ ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা স্থূল। মাথায় চূড়া নয়, উহা জমাট চুল; আকৃতি ও গঠনে ঠিক গুরুদেবেরই অনুরূপ। তবে খুব পরিষ্কার নয়, অস্পষ্ট। এই রূপের উপরে অনিমেষ দৃষ্টি করিয়া ও মন স্থির রাখিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি আকৃতির বর্ণ ক্রমেই ঘন হইতেছে। স্থানে অস্থানে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণে চোখ বুজা ও মেলা অবস্থায় এই রূপ একই প্রকার। আমার চক্ষে যেন এই রূপ লাগিয়া রহিয়াছে। নামেতে রূপের স্ফূর্ত্তি, রূপেতে নামের স্মৃতি, এই এক অদ্ভুত যোগাযোগ দেখিতেছি। এই দর্শন খুলিয়া দিয়া, অহর্নিশ ঠাকুর আমাকে বিমল আনন্দে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। জানি না, এই সুখ আমার কত দিন!

দর্শনবিষয়ে বিচার।

প্রকৃতি যাহার সংশয়পূর্ণ, প্রত্যক্ষবিষয়েও তাহার নানাপ্রকার বিচার বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমি যাহা পরিষ্কার দেখিতেছি, তাহাও ভালরূপে বাজাইয়া লইতে ইচ্ছা হইল। দর্শনের ক্রম অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। কালবর্ণ যে আকৃতিটি প্রায় সর্ব্বদাই চক্ষে রহিয়াছে, ইহা কি? কোথায় ইহা দর্শন হয়? আর এই দর্শনে আমার আত্মার কি কল্যাণ হইতেছে? দেখিতেছি, অসীম আকাশের দিকে যখন তাকাই, অস্পষ্ট অতি বৃহৎ কালছায়া নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটু সময় উহার দিকে দৃষ্টি স্থির করিলেই দেখিতে দেখিতে উহা ছোট হইয়া পড়ে। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র নিবিড় কালবর্ণ, মনুষ্যাকৃতিতে পরিণত হয়। আর সীমাবদ্ধস্থানে দৃষ্টি স্থির করিলে, উহার বিস্তৃতি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া নখপরিমিত আয়তন ধারণ করে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি করিলে, প্রথমে সুস্পষ্ট জ্যোতি দর্শন হয়। এই জ্যোতির সম্মুখে বা ভিতরে রূপের প্রকাশ। জ্যোতিটি কোন একটি বস্তুর উপরেই দর্শন হয়। কিন্তু রূপটি জ্যোতিঃসংলগ্ন অবস্থায় শূন্যেই রহিয়াছে, দেখিতে পাই। এখন এই রূপ বাহিরে কি ভিতরে দর্শন হইতেছে অনুসন্ধান করিয়া, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কারণ চক্ষু যখন মেলিয়া রাখি, তখনও যেমন বাহিরে ইহা পরিষ্কার দেখি, চক্ষু যখন

বুজিয়া থাকি, তখনও ঠিক সেই প্রকারই দৃষ্টিতে পড়ে। চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় বলিয়া ইহার আশ্রয় কি, তাহা ধরিতে পারিতেছি না। নিয়ত কোন বস্তু বা জ্যোতির উপরে রূপের প্রকাশ হইলে বস্তু বা জ্যোতিই রূপের আধার বুঝিতাম। কিন্তু তাহা নয়। একবার ভাবিলাম বুঝি বায়ুই রূপের আশ্রয়। কিন্তু দেখিতেছি তাহা নয়। কারণ বায়ু ত নিয়তই চঞ্চল, কিন্তু ঝড় তুফানেও রূপটি স্থির। জ্যোতি সম্বন্ধেও এই প্রকার। যদিও একটা বস্তুর উপরই জ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়, তথাপি ঐ বস্তুতে জ্যোতি আবদ্ধ নয়। কারণ বস্তু চঞ্চল হইলেও জ্যোতি স্থির থাকে। প্রবল ঝড়ে যখন বৃক্ষের ডালা ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, অথবা নদীতে যখন প্রবল তরঙ্গ ও স্রোত বহিয়া যায়, তখনও কম্পিত বৃক্ষডালে এবং চঞ্চল জলে জ্যোতি একই স্থানে একই অবস্থায় অচঞ্চল ও স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিতে পাই। সুতরাং স্থান বা বায়ু জ্যোতি এবং রূপের আধার নয়, বুঝিতেছি।

চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় কেন? বাহিরে একটা বস্তু দর্শন হইলে, চক্ষের দোষে বা ঐ সংস্কারবশতঃ চক্ষু বুজিয়াও তাহা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তু যখন দৃশ্যের আশ্রয় নয়, তখন বাহিরে উহা দর্শন হয় কি প্রকারে বলিব; তবে বাহিরেই হউক, আর ভিতরেই হউক, উহা যে দেখিতেছি সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। ইহা এতই ঘন ও সুস্পষ্ট যে পুস্তক পড়িতে পারি না; কোনও ক্ষুদ্র বস্তু পরিষ্কার দেখিতে পারি না; দৃষ্টি স্থির হইলেই জ্যোতি ও রূপে বস্তুটিকে আবরণ করিয়া ফেলে। চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় বলিয়া, এই দর্শন কোথায় কি ভাবে হইতেছে নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। দর্শনটি যে আমার কল্পনা নয় বা কোন সংস্কারের ফল নয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই।

অনাদরে রূপের অন্তর্দ্ধান।

কিছুকালযাবৎ দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি দর্শনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই দর্শনে আমার আত্মার কি যথার্থ কল্যাণ হইতেছে, না তাহা অনন্ত উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাইতেছে? এ সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে আমার আপনা আপনি বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতেছি রূপটির প্রতি আমার অত্যন্ত আকর্ষণ। ক্ষণকাল উহা দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ি। রূপটিকে আরও পরিষ্কার-রূপে দর্শন করিবার জন্যই যেন এখন সাধন ভজন করিতেছি। এরূপ অন্তরের অবস্থা আমার কেন হইল? সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরম আনন্দময়, অনন্ত, পরব্রহ্ম যাহার লক্ষ্য, সে এখন

নখপরিমিত একটি জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যাকৃতি রূপের ছটায় দিশাহারা হইয়া পড়িল ! সুতরাং দুর্দ্দশার আর বাকী কি আছে ? আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধনরাজ্যে এসকল দৃশ্য যদি নির্দ্দিষ্টই থাকে তাহা হইলে ইহাতে এত অনুরাগ বা আকর্ষণের কারণ কি ? যে কেহ নিয়ম প্রণালী মত সাধন ভজন করিলেই ত তাহার এসব দর্শন হইবে। আর যদি গুরুদেবের কৃপায় ইহা আমার একটা সঞ্চারী অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল দেখিয়া যাওয়া ভিন্ন ইহার সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ ; আজ যিনি দয়া করিয়া এই অবস্থা দিয়াছেন, কালই আবার তিনি আমার কোনও ত্রুটি দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। যে বস্তু আমার স্বোপার্জ্জিত বা নিজস্ব নয় তাহা লইয়া আমি মমতায় আবদ্ধ হইতেছি কেন ? তার পর এই সব দ্বিভুজ চতুর্ভুজ বা অন্য কোনরূপ দর্শনকে ত কোন কালে কেহ ধর্ম্ম বলে নাই। সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, দয়া, সন্তোষাদিকেই অবিরোধে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবাত্মার এই সকল সদ্‌বৃত্তি যদি প্রস্ফুটিত হইয়া না উঠিল, তবে এ সকল অলৌকিক ছবি দেখিয়া আমার কি হইবে ? সাধনপথে দু'চার পা চলিয়াই যদি এক বিন্দু জ্যোতির সৌন্দর্য্যে বা একটি রূপের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া পড়ি, এবং তাহাতে অনন্ত উন্নতির পথ অন্ধকার করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া উহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে ত আমার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। গুরুদেবের মধুর রূপখানি সুস্পষ্টরূপে নিয়ত আমার চক্ষের উপরে থাকিলে পরমানন্দে থাকিব, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু তাহাতেই বা আমার কি হইবে ? উহাকে কি ভগবদ্দর্শন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি ? তাহা হইলে আর এই রুগ্ন শরীরে প্রাণপণে সাধন ভজন করিয়া, এত নিয়ম সংযমে থাকিয়া ক্লেশভোগ করিতেছি কেন ? সামান্য রেলভাড়াটা জুটাইয়া নিয়া এখনই ত সাক্ষাৎ ভগবৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি। গুরুই ভগবান, বিন্দুই সিন্ধু, এসকল কথার অর্থ আমি বুঝি না। কোন্ অবস্থায় থাকিয়া মহাপুরুষেরা এসকল কথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দেন জানি না। তবে আমি কিন্তু নিজের অস্তিত্ব থাকিতে প্রত্যক্ষ সত্য অগ্রাহ্য করিয়া কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না।

পূর্ব্বোক্ত ভাব অন্তরে আসাতে দর্শনের প্রতি তেমন মনোযোগ না রাখিয়া নিয়মিতরূপে সাধন করিয়া যাইতে লাগিলাম। কিছুদিন দর্শনসম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিলাম। আজ সাধনকালে অকস্মাৎ রূপের কথা মনে পড়িল। ইতিমধ্যে কবে কখন রূপ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, মনোযোগ না থাকায় কিছুই ধরিতে পারি নাই। এখন সেই মধুর রূপের স্মৃতি প্রাণে উদয় হওয়ায়, উহার দর্শনের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছি ; ভিতর আমার দগ্ধ হইয়া

যাইতেছে। হায়, হায়, আমার এ কি হইল? অনাদরে কাহাকে আমি বিসর্জ্জন দিলাম? বোধ হয়, আমার প্রাণের ঠাকুর গুরুদেবই দয়া করিয়া প্রকাশিত হইতেছিলেন, আমার অনাদর ও অগ্রাহ্যভাব দেখিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। শুনিয়াছিলাম, 'এসব দর্শনের বস্তুকে ছেলেপিলের মত সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে হয়, আদরযত্ন করিতে হয়; না হ'লে থাকে না।' ঠাকুর! এবার তোমার দগ্ধপ্রাণ কাতর সন্তানকে ক্ষমা কর। সাধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বহুবার স্পর্দ্ধার সহিত তোমার কৃপাকে প্রলোভন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছি। হায়, হায়, এখন আমার গতি কি হইবে?

এতকাল দর্শনে চিত্ত আবিষ্ট থাকায়, সাধনকালে নামটি বড়ই রসাল হইয়া বাহির হইত। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সারবান্ একটা বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, অনুভব করিতাম। এখন আমার এই কিছুকালযাবৎ আর সেই অবস্থা নাই; এখন ক্লেশের সহিত নীরস ফাঁকা নাম করিতেছি। শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া ২।৪ মিনিটেই ফাঁপর হইয়া পড়িতেছি, মনটা সর্ব্বদাই উদ্‌ভ্রান্ত। একেবারে শূন্যে পড়িয়া, ধরাছোঁয়ার কিছুই না পাইয়া, ত্রাসে ও আতঙ্কে অস্থির হইতেছি। হায়, আমার এ কি হইল? এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না! গুরুদেব, প্রাণের ঠাকুর, দয়া কর।

লালের প্রভাব ও যোগৈশ্বর্য্য।

ফাল্গুনের কিঞ্চিদধিক ২য় সপ্তাহ পর্য্যন্ত, ১২৯৬।

আজ সকালবেলা আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, আর ভিতরের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি; স্বামীজী (হরিমোহন) লালকে লইয়া সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি অমনই সাধন ছাড়িয়া উঠিলাম। লালকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া আমার বিছানার পাশে লালের আসন পাতিয়া দিলাম। একটু বিশ্রামের পর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লাল, হঠাৎ তুমি এখন কোথা হ'তে কিভাবে এখানে এলে?' লাল বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে গোঁসাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। একদিন হঠাৎ তোমাদের কথা হ'ল; আর, দেখ্‌তে প্রাণটা অস্থির হ'য়ে পড়্‌ল। অমনই না ব'লে পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। রাস্তায় কাণপুরে মন্মথ বাবুর বাসায় মাত্র দু'দিন ছিলাম। রাস্তায় মধ্যে মধ্যে আমাকে কেহ কেহ গাড়িতেও তুলে নিয়ে ২।৫ ষ্টেশন এসেছেন।

আমি। তোমার সঙ্গে ত একটি ঘটি বা দ্বিতীয় আর একখানা বহির্ব্বাস পর্য্যন্ত নাই, মাত্র ঐ লেংটি ও কম্বলই দেখ্‌ছি। এতদূর এলে কি প্রকারে? রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই?

লাল। না, কষ্ট কি ? আমি তো বেশ এসেছি। কোন কষ্টই হয় নাই। গুরুদেব কি কারো কষ্ট দেখতে পারেন ?

নাবালক লাল কি প্রকারে সুদূর শ্রীবৃন্দাবনহইতে এতদূর পদব্রজে, শুধু ঐ লেংটি ও কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া, বিনাক্লেশে এখানে আসিলেন, ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

এই কয়েকমাসযাবৎ আমাদের বাসায় সাধন ভজনের একটা সুন্দর স্রোত চলিয়াছে। ভাগলপুরের বহু গণ্যমান্য লোক প্রত্যহ অপরাহ্নে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম্মার্থীদের সম্মিলনে নিত্যই যেন এ বাসায় উৎসব লাগিয়া আছে। সুগায়ক মহাবিষ্ণু বাবুর স্বরচিত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। লাল আসিয়া যেন ধর্ম্মস্রোতে একটা প্রচণ্ড তুফান তুলিয়া দিলেন। সংকীর্ত্তনে লালের মহাভাব, আসনে বসা অবস্থায় স্থির সমাধি ও অদ্ভুত বিকাশ এবং ধর্ম্মালোচনায় উঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতে লাগিলেন।

এক দিন আমরা লালকে লইয়া শ্রদ্ধেয় পার্ব্বতী বাবুর নিকটে গেলাম। পার্ব্বতী বাবু লালের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে লালের সম্মুখে সাংখ্য বেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম উপদেশ করিয়া, শেষকালে 'অহং ব্রহ্ম' এই মত স্থাপন করিলেন। লাল চুপ করিয়া সমস্ত শুনিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। পার্ব্বতী বাবু তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন লাল সাধারণ ভাবে লৌকিক ধর্ম্মের দু'চার কথা তুলিয়া, এত গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার একটি কথায়ও আমি প্রবেশ করিতে পারিলাম না। দেবব্রতী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভগবদুপাসক মহাত্মগণ একমাত্র গুরুর কৃপাতেই পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন—এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া, সংস্কৃত, পালী, তিব্বতী, আরবী ও অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রহইতে অনর্গল বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ মত, সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া, স্থাপন করিলেন। একমাত্র সদ্‌গুরুর এক পলকের দৃষ্টিসঞ্চারে, একটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে, অথবা এক মুহূর্ত্তের ইচ্ছাশক্তিতেই অনুগত শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, লাল ইহাই পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন। পার্ব্বতী বাবু শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে, স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাষ্টাঙ্গ হইয়া লালের পদতলে পড়িয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। কোথায় দাঁড়াইয়া আপনি এই পরমগুহ্যতত্ত্বের কথা বলিলেন, আমার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি তাহার ত্রিসীমায়ও যায় না। আপনি আমাকে একটু দয়া করুন।" ইহার পরহইতে পার্ব্বতী বাবু পুনঃপুনঃই লালের সঙ্গ

করিতে আমাদের বাসায় আসিতে লাগিলেন। ইহাতে ভাগলপুরে লালের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

১৩ই ফাল্গুন আমি একখানা পাতঞ্জল দর্শন পড়িতেছি, লাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি পড়িতেছ?"

আমি। পাতঞ্জল।

লাল। এ দুর্ব্বায়ু তোমার হ'ল কেন? ও সব প'ড়ে কি হবে? একটি 'লাইন'-ও বুঝ্‌বে না; বৃথা সময় নষ্ট! নাম কর না, সকল শাস্ত্র গুরুর কৃপায় নামের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রকাশ পাইবে।

আমি। লেখাপড়া মোটে না কর্‌লে শুধু গুরুর কৃপায়, গুরুর বরে সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যায়, এ কথা এ যুগে নাবালককেও ব'লো না।

লাল। এটি আমার কুসংস্কার নয়। গুরুর কৃপায় বাস্তবিকই সব জানা যায়। এটি আমি প্রত্যক্ষ ক'রে বল্‌ছি।

আমি আবার লালের কথায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিলাম। লাল তখন আমার হাত হইতে পাতঞ্জলখানা টানিয়া নিয়া, গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়, মধ্যে ও শেষ পৃষ্ঠায় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একবার একটু দৃষ্টি করিয়া পুস্তকখানা নিজ মস্তকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিলেন; পরে তখনই আবার উহা আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এই নেও। আমি তো মাত্র শিশুশিক্ষা—তৃতীয়ভাগপর্য্যন্ত পড়েছিলাম; আমার বর্ণজ্ঞানে এ গ্রন্থের উচ্চারণক্ষমতাও কুলায় না। ভাল, তুমি আমাকে এ গ্রন্থের যে কোন স্থানহইতে প্রশ্ন কর, যেখানে যে প্রকার আছে, আমি ঠিক সেইরূপই ব'লে দিচ্ছি।" আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থের নানাস্থানহইতে ৭।৮টি প্রশ্ন করিলাম। টীকাটিপ্পনীসহ যে বিষয়ে যেমনটি মীমাংসা গ্রন্থে আছে, অক্ষরে অক্ষরে লালের মুখে ঠিক সেইপ্রকার উত্তর পাইয়া, আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম; ভাবিলাম—'এ কি কাণ্ড!' কিছুক্ষণ পরে লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভাই, এ অদ্ভুত শক্তি তুমি কি প্রকারে লাভ করিলে?' লাল বলিলেন—"গুরুকৃপা! এক দিন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ (ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলাম। সুরেশ বাবু হঠাৎ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। আমি তাঁর বসার-ঘরেই ব'সে রইলাম। টেবিলের উপরে একখানা ইংরাজি মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ছিল। মনে হ'ল—লেখা-পড়া শিখি নাই। যদি শিখ্‌তাম, এ সব পুস্তকে কি কি বিষয়ের মীমাংসা আছে জান্‌তে

পার্‌তাম। এই ভাবিয়া, গ্রন্থখানাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ক'রে মাথার উপরে রাখ্‌লাম, আর গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগ্‌লাম। ঐ সময়ে হঠাৎ আমার মাথায় কেমন একটা অনুভব হ'তে লাগ্‌লো, তখন গ্রন্থের ভিতরে যা কিছু বিচার মীমাংসা আছে, সমস্ত আমার মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ কর্‌ল। ইহা কেন হ'ল, জানি না। সেদিন থেকে যে কোনও বিষয় আমার জান্‌তে ইচ্ছা হয়, আপনা আপনি তাহা ভিতরে এসে পড়ে। গুরুকৃপা ব্যতীত ইহার আর কি হেতু বলা যায়? এপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করায় নাকি ধর্ম্মজীবনের বিস্তর ক্ষতি হয়। কোনও আকাঙ্ক্ষা না ক'রে, হাবা হ'য়ে, গুরুদেবের দিকে তাকা'য়ে থাকাই ভাল। কিন্তু তা আর পারি কৈ? মহাশক্তিযুক্ত নাম পেয়েছ, নাম কর, গুরুদেবের কৃপায় মুহূর্ত্ত-মধ্যে অখিল শাস্ত্র ভিতরে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌তে পারে। এটি আমার কল্পনা নয়, সত্য বল্‌ছি।"

লাল গুরুদেবের সঙ্গ ছাড়িয়া অকস্মাৎ কেন পদব্রজে ভাগলপুরে আসিলেন তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। স্বামীজী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিধির পাকে, সঙ্গদোষে আচারভ্রষ্ট হইয়া এখন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইতেছেন। লাল ইহা জানিয়া বড়ই ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং অচিরে ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। লাল প্রত্যহই স্বামীজীকে সন্ন্যাসের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক গুরুদেবের আদেশমত চলিতে জেদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বামীজী লালের এসব কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। লাল তখন সহজে হইবে না বুঝিয়া কিঞ্চিৎ যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি প্রায় ১০ টার সময়ে ঘরের ভিতরে বসিয়া আমরা সকলে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, লাল পূর্ব্ববৎ স্বামীজীকে সন্ন্যাসের নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী উঁহার কথায় উপেক্ষাভাব দেখাইবামাত্র, লাল একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এসো না, এসো না, এসো না। কেন আস্‌ছ? চলে যাও! চলে যাও।" ঠিক এই সময়ে আমাদের সম্মুখ দিয়া, ভয়ঙ্কর শোঁ শোঁ শব্দে কি যেন একটা চলিয়া গেল। আমরা অবাক্! একটু পরে লাল যেন চমকিয়া উঠিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"হায়, হায়! এ কি হ'ল? একেবারে আত্ম-হত্যা! উঃ, কি ভয়ানক! এ যে আর দেখা যায় না!" এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন—"এখন আর আমার কাছে কেন? আমার কাছে এসে কি হবে? গুরুজীর কাছে যাও। আমার দ্বারা কোন কল্যাণই হবে না। আমার কাছে এসো না, এসো না। শুনছ না কেন? আচ্ছা, তবে এসো।" লাল এই কথা কয়টি

বলামাত্র শোঁ। শোঁ। শব্দে কি যেন একটা আসিয়া আমাদের ঘরের গঙ্গার দিকের জানালায় দুড়ুম করিয়া পড়িল। জানালা ও সার্শির কপাট ভিতর হইতে বন্ধ ছিল ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জানালাটি অকস্মাৎ খুলিয়া গেল এবং কাচের কপাটের তিনখানা সার্শি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল! আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম, অবাক্ হইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইতে লাগিলাম। লাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি? এ কি দেখ্‌ছি? জ্যান্ত মানুষটাকে চিতায় চড়া'ল! কি ভয়ঙ্কর! উঃ, কি ভয়ানক চিতা! ঐ দেখ, ঐ দেখ।" স্বামীজী তখন চীৎকার করিয়া বারেন্দায় গিয়া পড়িলেন ; "হায়, হায়—এ কি হ'ল? এ কি হ'ল?—জীবন্ত মানুষটাকে চিতায় জ্বালালে।" কয়েকবার এইরূপ বলিয়া, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে চৈতন্যলাভ করিয়াও তিনি চিতার কথা মনে করিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। লাল তখন এক একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন —'ধামরাই গ্রাম আজ উৎসন্ন হইল। হায়, হায়!'

স্বামীজী তখন বিনাবাক্যে নিজের গায়ের কম্বলখানা লালের গায়ে পরাইয়া দিয়া তাঁহার কৌপীনটি টানিয়া নিলেন ; পরে, আমাকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"ভাই, কিছু মনে ক'রো না, একটু পাগলামী করি।" এইমাত্র বলিয়া, বারেন্দার রোয়াক হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন, এবং উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া দৌড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টা। কিছু পরে লাল বলিলেন—"আর স্বামীজীর অনুসন্ধান নিও না। তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন।" তথাপি মথুর বাবু দু'দিন স্বামীজীর অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু কোনই খোঁজখবর পাইলেন না।

আমার ভগিনীপতি মথুর বাবু লালের অসাধারণ অবস্থা ও যোগৈশ্বর্য্যের অনেক কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি লালকে নিজের বাসায় পাইয়া সেসম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ করিতে লালের 'পিছু' লইলেন। লাল উঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, এক দিন মথুর বাবুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া নিলেন ; পরে আমার মৃত ভগিনীকে পরলোক হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া অনেক আশ্চর্য্য ও বিচিত্র গুহ্য কথা শুনাইলেন। কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কুচেষ্টায় আভিচারিক ক্রিয়াদ্বারা যে ভাবে অকালে আমার ভগিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, সে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া মথুর বাবু স্তম্ভিত হইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটিদ্বারা আরও যে সমস্ত এই শ্রেণীর সাংঘাতিক অনর্থের সৃষ্টি হইবে, তাহাও লাল পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। মথুর বাবু ব্যতীত যাহা এ সংসারে আর কেহই জানে না, এমন কতকগুলি গুহ্য বিষয় লালের মুখে শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন।

আমাদের বাসায় ভূত প্রেতের নানাপ্রকার গোলমাল দূর করিবার জন্য প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্ত্তন ও তুলসীসেবা এবং সাধুসজ্জনদিগকে বাসায় রাখিয়া তাঁহাদের সাধন ভজনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক, লাল এ বিষয় মথুর বাবুকে বিশেষ 'জেদ' করিয়া বলিলেন। মথুর বাবুও তাঁহার উপদেশ মত চলিতে সম্মত হইলেন।

পরে লাল এক দিন কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলেই বিষাদে মুহ্যমান হইলাম। অহর্নিশি আমাদের বাসাতে ধর্ম্মের যে বহ্নি প্রজ্বলিত থাকিয়া আমাদিগকে আলোক দিতেছিল, লাল চলিয়া গেলে আমাদের অন্তর শিথিল ও অবসন্ন হওয়ায় সেই বহ্নি ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

লাল ও স্বামীজী অকস্মাৎ চলিয়া গেলে পর, আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। বিষাদে সমস্তই যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। সাধন ভজনের উৎসাহ উদ্যম কিছুকাল-যাবৎ একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। নিয়মিত সাধন আর নাই। আসনে বসিলে অস্থিরতা আসিয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া আর নাম করিতে পারি না, ৩।৪ মিনিটেই হয়রান হইয়া পড়ি; মনে হয় যেন সাধ্যাতীত বোঝা লইয়া টানাটানি করিতেছি। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। গুরুদেবের দুর্লভ কৃপা স্পর্দ্ধার সহিত আমি অগ্রাহ্য করিয়াছি, ইহা মনে হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। এখন এই অপরাধেরই দণ্ড ভোগ করি; সাধন ভজন আর করিব কি? হাহাকারেই আমার অহর্নিশি কাটিয়া যাইতেছে। কয়েকদিনযাবৎ রোগের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহাও আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। শরীরে ও মনে এমন একটু কিছু নাই, যাহা ধরিয়া তিলমাত্র আরাম পাই। নৈরাশ্যে ও যন্ত্রণায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে। মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়াই এ সময়ে কতকটা স্থির হইতেছি। আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিবে জানিয়াই বোধ হয় ল্যাঙ্গা বাবা বলিয়াছিলেন—"বাচ্ছা, ঘাব্‌ড়াও মৎ। গুরুজী তোম্‌কো বহুৎ কৃপা করেঙ্গে। উন্‌হিকো উপর তোমারা সাচ্চা ভক্তি বন্ যায়েগা।" পতিতদাস বাবা বলিয়াছেন—"থোড়া রোজমে তোমারা গুরুভক্তি লাভ হোগা, ধন্য হোঁ যাওগে।" গুরুদেবও বলিয়াছিলেন—"ছেলে বয়সে সাধন পেলে; জীবনে কত উন্নতি লাভ কর্‌তে পার্‌বে। ধন্য হ'য়ে যাবে।"—ইত্যাদি। যদি এসব মহাপুরুষদের বাক্য সত্য হয়, যদি আজন্ম সত্যসঙ্কল্প সত্যবাদী গুরুদেবের বাক্যও অন্যথা না হয়, তবে আর আমার চিন্তা কি? রোগে আমাকে যতই ক্লিষ্ট ও অবসন্ন করুক্ না কেন, স্বেচ্ছাচারে আমি যতই ডুবিয়া যাই না কেন, পরিণামে আমার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

আমার প্রতি লালের উপদেশ।

১৭ই ফাল্গুন, ১২৯৬।

লাল আমাকে তিনটি কথা বলিয়া গেলেন—(১) ডায়েরী লেখা ছাড়িও না। ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (২) সাধন ছেড়ো না, খুব নাম কর ; তুমি সন্ন্যাসী হবে। (৩) গুরুদেবের কৃপাব্যতীত কিছুই হইবার যো নাই ; গুরুতে একনিষ্ঠ হও ; তাঁহার সঙ্গ করিতে চেষ্টা কর।

আমি তো কিছুকাল হইতে সাধন ভজন একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছি। অনাবশ্যক কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে দিন রাত কাটাইতেছি। নিজের কিসে কল্যাণ বুঝিয়াও তাহা করিতে পারিতেছি না। বাজে কাজে, বৃথা গল্পে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেছি। ভিতরে আমার হা হুতাশ ও জ্বালা, বাহিরে আমার কথা মিষ্ট হইবে কি প্রকারে ? বন্ধুরাও এখন আমার সঙ্গে উত্তপ্ত হইতেছেন। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি।

স্বপ্ন।—বাক্যসংযম।

২২শে ফাল্গুন, ১২৯৬।

আজ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলাম। গুরুদেবের সঙ্গপ্রত্যাশায় ছুটিয়াছি। ঝড় তুফানে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গুরুদেবের নিকটে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, গুরুদেব মৌনী। সস্নেহ দৃষ্টিতে যাহার পানে তাকাইতেছেন, সেই আনন্দে ডুবিয়া যাইতেছে। আমি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে হাসিগল্প তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলাম। গুরুদেব আমার দিকে একটু বিরক্তিভাবে তাকাইয়া বলিলেন—"উঃ, বাব্বা, তুমি এত কথা বল্‌তে পার !" কথাটি শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলাম গুরুদেব আমার বেশী কথা পছন্দ করেন না। অনাবশ্যক কথা আর কহিব না, স্থির করিলাম।

স্বপ্ন।—সন্ন্যাসের অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ।

বৈশাখ মাহা, ১২৯৭।

আমি ভজনসাধনশূন্য, স্বেচ্ছাচারী ও ভয়ঙ্কর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও, গুরুদেবের এই অনুশাসনবাক্য ভুলিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেই গুরুদেবের সেই দৃষ্টি, সেই কথা কয়েকটি মনে আসিয়া পড়ে ; আমি আর কিছু বলিতে পারি না। লাল চলিয়া যাওয়ার পরে, ৪।৫ দিন অন্তর অন্তরই স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। আমার সম্বন্ধে লালের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার ফলেই এইরূপ হইতেছে মনে করিয়াছিলাম ; সুতরাং তেমন গ্রাহ্যও করি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি—ওসব স্বপ্নে আমার ভিতরে এক তুমুল কাণ্ড চলিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে যেপ্রকার

কঠোর-বৈরাগ্যপূর্ণ, উদ্যমশীল, ভজনানন্দী সন্ন্যাসীরূপে দেখি, দিবসে উদয়াস্ত আমার সেই মূর্ত্তি যেন চোখে লাগিয়া থাকে, সর্ব্বদা উহাই ভাবিতে ভাল লাগে। ভিতরে যাহা নিয়ত ভাবিয়া আরাম পাই, বাহিরে সেই প্রকার হইতে না পারিলে ভাল লাগিবে কেন? কিছুকাল হাত পা গুটাইয়া ছিলাম; কিন্তু বেশীদিন পারিলাম না। প্রাণে জ্বালা আসিয়া পড়িল। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট আমার সন্ন্যাসের আকৃতি প্রকৃতির অনুযায়ী অবস্থা লাভ করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমি এবার কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলাম। দিবসে একাহার ধরিলাম। শয্যায় শয়ন ত্যাগ করিলাম। একখানি কম্বলমাত্র ব্যবহারে রাখিলাম। কোঠা ঘরে বাস ছাড়িয়া দিয়া পুলিনপুরীর প্রকাণ্ড বাগানে তমালতলায় আসন করিলাম; লেংটি পরিয়া, ধূনি জ্বালিয়া, তমালমূলে সারারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অসাধারণ স্থান প্রভাবেই বোধ হয়, আমার সাধনে স্পৃহা ও কঠোরতায় ব্যাকুলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই তমালতলা নাকি একটি সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থান ছিল। গাছটি বহুকালের এবং ছত্রাকার গোল। ঘনপত্রবিশিষ্ট সমস্তগুলি ডালই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। বৃক্ষের তলাটি বেশ পরিষ্কার, মণ্ডলাকারে ১৫।২০ জন লোক অনায়াসে বসিতে পারে। একটি মাত্র সরু পথ দিয়া বৃক্ষতলে যাইতে হয়, অন্য কোন দিক দিয়া যাওয়ার পথ নাই। গাছ-তলায় কেহ থাকিলে, বাহির হইতে কোন প্রকারে তাহাকে দেখা যায় না। এমন সুন্দর গাছ ইতিপূর্ব্বে আমি আর কোথাও দেখি নাই। তমালমূলে বসিলে চঞ্চল মন আপনা আপনি যেন জমাট হইয়া আসে। গুরুদেবের কৃপায় সাধনে আমার যে অপূর্ব্ব দর্শনলাভ হইয়াছিল তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম; সাধনে অশ্রদ্ধা, নামে অরুচি জন্মিয়াছিল। জীবনে আর কখনও এই সাধন করিতে পারিব, কল্পনাও করি নাই। কিন্তু গুরুদেব পুনঃপুনঃই আমাকে স্বপ্নযোগে তেজঃপুঞ্জ ভজনানন্দী সন্ন্যাসীর রূপ দর্শন করাইয়া, সাধন ভজন তপস্যায় আবার আমার প্রবল আগ্রহ জন্মাইলেন। আশ্চর্য্য গুরুদেবের কৌশল।

* * *

শরীর আমার দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। মনের উৎসাহে তমালতলায় রাত্রি যাপন ও অনিয়মিত জাগরণাদি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা করাতে অল্পকালের মধ্যেই জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালবৎ হইয়া পড়িলাম। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু, মনের অনিবার্য্য আবেগে কাহারও কথাতেই আমি কর্ণপাত করিলাম না। ভাবিলাম—গুরুদেবের কৃপায় যখন আমি বঞ্চিত হইয়াছি, দুর্ব্বুদ্ধি দাম্ভিকতায় যখন দুর্লভ

সাধনফল হারাইয়াছি, তখন এইবার নিজে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব; অকৃতকার্য্য হই, দেহ পাত করিব।

আমি মাসাধিক কাল অবাধে যথারীতি নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া চলিলাম। ভিতরে ভিতরে খুব ভরসা জন্মিল; রোগমুক্ত হইলে, নিজ চেষ্টায় সাধনবলে অনায়াসেই সন্ন্যাসের উপযোগিতা লাভ করিতে পারিব। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনে আমার অভিমান চূর্ণ হইল। বুঝিলাম সন্ন্যাসলাভের চেষ্টা আমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র! আমি বিষম অবস্থায় পড়িলাম।

আমার খুড়্‌তুত ভ্রাতা মনোমোহন আমা অপেক্ষা নয় দিনের বড়। একই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা একই সংসারে প্রতিপালিত। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মনোমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সত্যনিষ্ঠ উপাসনাশীল জীবনযাপনপূর্ব্বক, অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। তাহার দেহত্যাগের তিন দিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, মনোমোহন আমাকে আসিয়া বলিল—"ভাই, আমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় ত শীঘ্র এস; এবার আমি চল্লাম।" আশ্চর্য্য এই যে, ঘটনায়ও তাহাই হইল।

বহুকাল পরে গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ভাই মনোমোহন সন্ন্যাসিবেশে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। উঁহাকে দেখিয়া খুব উল্লসিত হইয়া বলিলাম—"বাঃ, তুমি সন্ন্যাসী হ'য়েছ? বেশ! আমিও সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাকব।" সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"সন্ন্যাস তো ভেক নয়; উহা যে অবস্থা; জিতকাম না হ'লে সিদ্ধিলাভ হয় না। যত সহজ ভাব্‌ছ, তত সহজ নয়।"

আমি। কামিনীসঙ্গেও আমার চিত্তবিকার হয় না। সন্ন্যাসের উপযোগিতা আমার স্বভাবেই আছে।

সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"বটে? আচ্ছা, একবার ল্যাংটা হও দেখি।"

আমি অমনই উলঙ্গ হইলাম। আমাকে দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"হ'য়েছে, হ'য়েছে; এবার কাপড় পর। এই উপযোগিতা নিয়ে সন্ন্যাসী হবে? এখন ঐ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। উপস্থ থাক্‌তে যথার্থ সন্ন্যাস হয় না। সাধন ভজনের প্রভাবে উপস্থকে সংযত ক'রে দেহেই লয় কর্‌তে হবে। না হ'লে হবে না। এখন সাধন কর, খুব নাম কর। গুরুর কৃপা হ'লে সবই হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি চল্লাম।"

আমি বলিলাম—"সন্ন্যাসের লক্ষণ যা বল্লে তোমার তা কতদূর হ'য়েছে, দেখ্‌তে চাই।"

সন্ন্যাসী ভ্রাতা অমনই উলঙ্গ হইল। তাহার পুরুষাঙ্গ নাই দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ কি, ভাই? এ যে স্ত্রীলোকের মত দেখ্ছি!" সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"না, তা না। কামভাব-দমনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের চঞ্চলতা নষ্ট হ'য়ে যায়; ক্রমে উহা সঙ্কুচিত হ'য়ে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে; পরে উল্টাভাবে ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান ক'রে মূলসহিত সমস্ত ভিতর দিকে টানিতে থাকে। তাহাতেই ঐ স্থানের আকার ঐপ্রকার হ'য়ে যায়। দেখ্তে উহা স্ত্রীচিহ্নের মতই দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা বাহিরে পুরুষাঙ্গেরই সম্পূর্ণ অভাব মাত্র। এটি তো সন্ন্যাসীর শুধু একটা বাহ্য লক্ষণ, কিছুই নয়। সন্ন্যাসীর অন্তরের অসাধরণ দুর্লভ অবস্থা একমাত্র গুরুপ্রসাদেই লাভ হয়।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ভ্রাতা অন্তর্হিত হইলেন; আমিও জাগিয়া উঠিলাম।

স্বপ্নটি দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। সন্ন্যাসীর এপ্রকার লক্ষণ আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। স্বপ্নটিকে আমি স্বপ্ন ভাবিয়া, অলীক বলিয়া, উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। উহার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়া আমার মনে ছাপ্ পড়িয়া গেল। স্বপ্ন-দৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে প্রাণে আগ্রহ জন্মিল। আমি খুব কৃচ্ছ্রতার সহিত সাধন করিতে লাগিলাম।

পাপপুরুষের আক্রমণ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১২৯৭।

মহাত্মাদের মুখে শুনিয়াছি, নিজেও বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উদ্যমসহকারে সাধন ভজন তপস্যা আরম্ভ করিলেই সেই সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে সাধকের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভয়ঙ্কর একটা পিশাচশক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। সাধকের আন্তরিক কাতরতা বা বাহিক দীনতার, কিঞ্চিন্মাত্র অভাব হইলে, অথবা নিয়ম নিষ্ঠার বেড়া অসতর্কতাবশতঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সামান্য শিথিল হইয়া পড়িলে ঐ নিদারুণ পিশাচ অমনই প্রবল বেগে সাধককে আক্রমণ করে এবং নানাপ্রকার দুর্দ্দমনীয় দুর্ম্মতি চিত্তে উদ্রিক্ত করিয়া কদাচারে ও ব্যভিচারে সাধককে অতি জঘন্য হীন অবস্থায় উপনীত করে।

অল্প কিছুকাল কঠোরতার পথে চলিয়া একটু সাধন করিতেই ভিতরে ভিতরে অভিমান জন্মিল—বুঝি আমি জিতকাম হইয়াছি। অন্তরে এই ভাবের উদয় হওয়াতেই দর্পহারী ভগবান্ আমার দর্প চূর্ণ করিতে অদ্ভুত উৎপাতের সৃষ্টি করিলেন। জনমানবশূন্য নির্জ্জন বাগান উপাসনার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উৎপাৎশূন্য মনে করিয়াছিলাম; তাই একান্ত

প্রাণে সাধন করিব আশায়, পুণ্য বৃক্ষ তমালতলে সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থলে, সংযমপূর্ব্বক সাধনের বলে অচিরেই আমি সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব, নিরাপদ অবস্থা লাভ করিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও অভিমানের মোহে অন্ধ হইয়া এখন আমি বিষম অন্ধ-কূপে পড়িয়াছি। এ আপদে আমার আর উপায় নাই।

নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়ার জন্য ভাগলপুর প্রসিদ্ধ। ইতর লোকদের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর দুষ্ক্রিয়ার প্রচলন অত্যন্ত অধিক। 'আভিচারিক' বিদ্যা সময়ে সময়ে প্রযুক্ত না হইলে উহার শক্তি নাকি হ্রাস পাইয়া যায়; এই জন্য, ঐ কার্য্যে যাহারা ওস্তাদ নিয়ত তাহারা লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত যজমান জুটিলে, দু'পয়সা রোজগারও হয়। কাহারও প্রতি সামান্য কারণে কাহারও বিদ্বেষাদি জন্মিলেই, ঐ সব লোকের দ্বারা একে অন্যকে জব্দ করিতে বাণমারা, ফুল ছোঁড়া, ধূলাপড়া ইত্যাদির চেষ্টা করে। এই উৎকট শক্তি পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে নাকি তাহার জীবননাশও ঘটিতে পারে।

আমাদের বাগানের সংলগ্ন উত্তর প্রান্তে একটি ভদ্রলোক আসিয়া একখানা বাসা ভাড়া লইয়া আছেন। লোকটি সাধুপ্রকৃতি ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিবাসী হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। কিছু দিন হয় তাঁহার একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী কন্যা এই আভিচারিক উৎপীড়নে বিপন্না হইয়াছেন। মেয়েটির একটি সুসন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু স্তন্যাভাবে অনাহারে মারা পড়িয়াছে। যুবতী আরও নানাপ্রকার উৎপাত ভোগ করিতেছেন। অসাধারণ রূপ লাবণ্যই উঁহার এই উৎকট বিপত্তির হেতু হইয়াছে। নির্জ্জন তমালতলায় অহর্নিশি আমি ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয়ই আমি একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ, এই রকম একটা কুসংস্কার এখানে অনেকেরই ভিতরে জন্মিয়াছে। আমার শুধু একটু কৃপাদৃষ্টিতেই মেয়েটির এই সব 'উপরি' উপদ্রবের শান্তি হইবে, এই প্রকার ধারণায় মেয়েটির পিতা জেদ করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পরে সেই সুন্দরী কন্যাকে নির্জ্জন ঘরে একাকী আমার হাতে অর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন! উদ্দেশ্য—মন খুলিয়া মেয়েটি তাঁহার সব দুঃখের কাহিনী আমাকে বলিবেন। শোকাতুরা সরলা যুবতী অতি কাতর ভাবে আমাকে কহিলেন—"আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। কোনও দুষ্ট লোকের কু দৃষ্টিতে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্বেই আমার একটি স্তন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; অপরটিতেও একটি ফোঁটা দুধ নাই। তাই, বুকের দুধ অভাবে, অনাহারে ছেলেটি

আমার মারা পড়িয়াছে।”—এই বলিয়া, শোকবিহ্বলা বালা অসঙ্কোচে বুকের বস্ত্র খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। যুবতীর বুকে বাম দিকের স্তনের কোনও চিহ্ন নাই। দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। অপরটি স্বাভাবিক, স্থূল ও সুগঠন। আমার দৃষ্টিতে ও করস্পর্শে কুগ্রহের দৃষ্টি ছুটিয়া যাইবে, মেয়েটিরও এইরূপ ধারণা। উহার প্রাণের দুঃসহ যাতনা ও অন্তরের আগ্রহ আমার চিত্তকে স্পর্শ করিল। আমি স্বচ্ছন্দভাবে ও অসঙ্কোচে উহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পরহইতে সেই নির্জ্জন বাগানে আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মেয়েটি প্রত্যহ আসিতে লাগিল। আমি দূর হইতে উহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম।

কয়েকদিন পরে দেখি, কোন দিন মেয়েটি যথাসময়ে না আসিলে আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে, উহার রূপের স্মৃতিতে আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলে। আমি আর তখন আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, সেই বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই। আবার কখন কখন উহাকে দেখিতে উহাদের বাড়ীর পাশে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। হায়, হায়—এ আমার কি দশা ঘটিল? আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম? আচরণ সম্বন্ধে গোড়ায় সাবধান না হইয়া অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম আকর্ষণে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, যেন নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার সমস্ত যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন নিজেকে অতি জঘন্য বলিয়া অনুভব করিতেছি। নিয়ত হা হুতাশে উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সাধন ভজন সমস্ত ছুটিয়া গিয়াছে।

* * *

আমি তমালতলা ত্যাগ করিয়াছি, নাম প্রাণায়াম ছাড়িয়া দিয়াছি। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছি। গুরুদেব, এ সময়ে তুমি কোথায়?

কে তুমি?

অভাবনীয় ঘটনা জীবনে যাহা ঘটিতেছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। গতরাত্রে কি যে আমি দেখিলাম, বলিতে পারি না। জীবনে কখনও আমি এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। ঘটনাটি গুরুদেবকে শুনাইবার জন্য যথাসাধ্য লিখিয়া রাখিতেছি।

রাত্রি ১২ টা বাজিয়া গেল। বিছানায় পড়িয়া আছি; ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে বিছানার অর্দ্ধেকটা আলোকিত। বেদনার যন্ত্রণায় ও

মনের আগুনে আমি ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। আকুল প্রাণে গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা করিলাম, "ঠাকুর, আমি তো আর পারি না। এবার তুমি দয়া কর। আমি তোমার ঐ মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া চিরকালের মত সমস্ত উৎপাতের শান্তি করিব।" প্রার্থনান্তে গুরুদেবের পবিত্রমূর্ত্তিধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট নাম জপ করিতে লাগিলাম। জানি না কখন অজ্ঞাতসারে, ধীরে ধীরে কামিনীকল্পনা * চিত্তে আসিয়া পড়িল। তাহাতেই আমি অভিভূত হইয়া রহিলাম। জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, জানি না; অকস্মাৎ আমার পায়ের দিকে কামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে, কাতর স্বরে আমাকে বলিল—"ও কি ভাব্‌ছ? এই যে আমি এসেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা।" স্বরেতে খুব আপনার মনে হইল। কিন্তু চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?"

রমণী কহিলেন—"তুমি যে আমায় স্থির হ'তে দিচ্ছ না—টেনে নিয়ে এলে। যথেষ্ট ভুগেছি—আর ক্লেশ দিও না। পায়ে পড়ি, আমায় মুক্ত ক'রে দাও।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কখন আমি তোমাকে ডেকেছি? কে তুমি? এখানে কেন?

কামিনী বলিলেন—"তোমার অদম্য কামভাবে আমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হ'য়েছে, তোমার কামকল্পনা ও উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। তোমার বিকার থাক্‌তে আমার নিস্তার নাই। এখন বাসনার পরিতৃপ্তি কর—ঠাণ্ডা হও। আমিও বাঁচি।"

আমি বলিলাম—কে তুমি? তোমার কথা শুন্‌ছি, অথচ তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি কামিনীকল্পনা করি—তাতে তোমার কি? তুমি আকৃষ্ট হও কেন?

যুবতী অস্পষ্ট ছায়ার মত কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া তক্তপোষের ধারে আমার পায়ের দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বিছানার উপরে অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় পড়িয়া আমার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিলেন। উঁহার অঙ্গস্পর্শে আমার শরীরে আনন্দের ধারা সঞ্চারিত হইতে লাগিল, আমি পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম।

যুবতী তখন আমাকে বলিলেন, "ছি! এই তোমার দশা? কামভাব, কামিনী-কল্পনা—এ তুমি ছাড়্‌তে পার্‌লে না? নিজের যে সর্ব্বনাশ কর্‌লে! আর এতে আমারও কত দুর্গতি, দেখ দেখি। পরমানন্দে সমাধিতে ছিলাম। সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম ক'রে

* এ সম্পর্কে ঠাকুরের কথা পূর্ব্বপ্রকাশিত 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' (১২৯৮ সালের) গ্রন্থখানার ২১ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে।

এত দিনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ কর্‌তাম। শুধু তোমার সঙ্গে অভেদসম্বন্ধহেতু আবদ্ধ র'য়েছি। তোমার বিষম উত্তেজনার টানে আমাকে উঠ্‌তে দিচ্ছে না। আমি নিরুপায় হ'য়ে এসেছি। এবার আমায় মুক্ত ক'রে দাও। তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেও।"

আমি অমনই উঠিয়া বসিলাম– বলিলাম, "তুমি কে, বল না কেন?" রমণী তখন অকস্মাৎ তক্তপোষের ধারে বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মধুর ভাবে, বিনয় সহকারে বলিলেন একবার আমাকে ধ'রে আলিঙ্গন কর না!—পরিচয় পাবে এখন।" আমি উঁহাকে ক্রোড়ে বসাইবার অভিপ্রায়ে যেমন উঁহার কটিদেশে করসংযোগ করিলাম, রমণীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া অমনই বিস্ময়ে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। আমার শিথিল হস্ত খসিয়া পড়িল। উঁহার সেই অনঙ্গমথন কমনীয় অঙ্গের কেবল মাত্র নাভিদেশ পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আমার নিকটে প্রকাশিত হইল। দেখিলাম, নীলদ্যুতিসম্পন্না, সুন্দরী শ্যামা উলঙ্গ বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শুভ্র, অল্পপরিসর, সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে উঁহার স্থূল উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থল আবৃত। ষোড়শীর নাভিদেশহইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত অসংখ্য ঘন নীল বিদ্যুৎ ফুটিয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, উঁহাকে ধরিতে আবার আমি হাত বাড়াইলাম। রমণী তখন পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আমাকে বলিলেন—"আর কেন? যথেষ্ট হ'য়েছে; আর কামকল্পনা ক'রো না, আমাকে টেনো না। এবার ভেবে দেখ আমি কে। এখন যাই।" এই বলিয়া উলঙ্গিনী কামিনী শ্যামাঙ্গের উজ্জ্বল ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইলেন। তখন উঁহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নীল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ অবিরল স্খলিত হইয়া বিশাল নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়ী শ্যামপ্রতিমা অনন্ত নীলাকাশে স্বরূপ মিলাইয়া ধীরে ধীরে বিলীন হইলেন। 'হায়, হায়, কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?' বলিয়া চীৎকার করিয়া, আমি বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

অবশিষ্ট রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়া কিভাবে যে কাটাইলাম, তাহা আর লিখিবার যো নাই।

এই অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখার পর অন্তরে আমার সর্ব্বদা ঐ রূপ উদয় হইতে লাগিল। দিবানিশি আমি উঁহারই ধ্যানে রহিলাম। আবার কখন কিরূপে সেই অনুপমা প্রতিমার দর্শন পাইব—এই চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। অনিষ্টকর যে সকল দূষণীয় কল্পনায় এত কাল সুখ পাইয়াছি, তাহাতে আর রুচি নাই, বরং বিরক্তিই জন্মিতেছে। সাধন ভজন করিলে আবার সেই মনোমোহিনী অপ্রাকৃত রমণীকে দেখিতে পাইব এই ভাবিয়া সাধনে

আমার প্রবৃত্তি জন্মিল। কিন্তু ঝোঁকে পড়িয়া সাধন করিতে উৎসাহী হইলেও চেষ্টা করিবার আর আমার সামর্থ্য নাই। দারুণ পিত্তশূল বেদনার অসহ্য যন্ত্রণায় আমি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যহ দুই তিন বার বমি করি; কণ্ঠনালীতে ক্ষত হইয়াছে অনুমান হইতেছে। গণ্ডূষমাত্র জল পান করিলেও পেট পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। দিন রাত একটানা দুঃসহ বেদনায় আমার আহার নিদ্রা গিয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া আহা উহু, উঠা বসা করিতেছি। মানসিক যন্ত্রণা যতই তীব্র হউক না কেন, কায়িক ক্লেশের তুলনায় উহা কিছুই নয়, এবার ইহা পরিষ্কার বুঝিতেছি। উৎকট দৈহিক যন্ত্রণার উপশমের জন্য মনে হয়, এমন অধর্ম্ম অনাচার বা অকর্ম্ম নাই যাহা করিতে না পারি। এই তো অবস্থা!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৬	চতুঃপার্শ্বে	চতুষ্পার্শ্বে
৪	২২	আগুণ	আগুন
২১	৬	আগুণ	আগুন
২১	২৫	দেবো	দেবঃ
২২	১	স্বাশ্বতায়	শাশ্বতায়
২২	২৩	সাধনে	সাধনের
২৩	৮	ভাবোচ্ছাস	ভাবোচ্ছ্বাস
২৪	২৭	রওয়না	রওনা
২৮	১৭	আসিবার	আসিবার পর
২৯		১২ই মাঘ	১১ই মাঘ
৩০	১৩	মিলিয়া	মেলিয়া
৩৮	২০	আমর	আমার
৩৯	১৬	মুমুর্ষু	মুমুর্ষু
৪৭	২০	পুরান	পুরাণ
৫০	১২	পাড়	পার
৫৪	২৬	পুরান	পুরাণ
৫৬	২৫	সজনি	স্বজনি
৫৮	১৬	কত	কতক
৬১	২৪	নিরাপদ	নিরাপৎ
৬৮	৭	গোঁসাই	গোঁসাইকে
৭০	৮	অন্তর্হিত	অন্তর্নিহিত
৭৯	২৩	মাত্র	মাত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮২	১৮	পাড়ে	পারে
৮৬	২০	থামকে	খামকে
৮৮	২৫	নিশ্চয়	নিশ্চিত
৯৬	১৩	ত্রিস্মৃতি	ত্রিস্মৃতি
১০০	১৩	আয়ত্বাধীন	আয়ত্তাধীন
১০৮	১৯	মুসলমনান	মুসলমান
১১২	২৬	পুরান	পুরাণ
১১৭	২৫, ২৭	নাড়	নাড়ু
১২৫	১০	অন্তরেন্দ্রিয়ের	অন্তরিন্দ্রিয়ের
১২৬	১১	পড়-শুনা	পড়া-শুনা
১২৭	১৫	অপরীসীম	অপরিসীম
১৫২	১৯	পুস্তকে	পুস্তকে
১৫৬	২৪	বর্দ্ধিষ্ট	বর্দ্ধিষ্ণু
১৬৩	২৩, ২৫	সংকীর্ত্তন	সঙ্কীর্ত্তন
১৬৯, ১৭০	২১, ৫	পাড়	পার
১৭৩	২১	পরধর্ম্মোভয়াবহঃ	পরধর্ম্মো ভয়াবহ
১০৫	১৬	পাড়ে	পারে
১৭৫	২৫	অন্তর্ম্মুখী	অন্তর্ম্মুখী
১৯১	৮	অসাধরণ	অসাধারণ
১৯২	২	নিরাপদ	নিরাপৎ
১৯২	২৮	দুধ	দুধের